প্রবেশিকা ভূগোল

প্রথম ভাগ

লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী

Approved by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text-Book on Geography for Class IX, Vide T. B. No. Syll|G|IX|84|22 Dated 23. 12. 83.

প্রবেশিকা ভূগোল

প্রথম ভাগ

[নবম শ্রেণীর পাঠ্য]

লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী এম্. এ., বি. টি.

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ কলেজ অব এডুকেশন,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৭০০০৩২

ও

প্রাক্তন অধ্যাপক, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ
কলিকাতা-৭০০০১৯

প্রাপ্তিস্থান

উমা পাবলিশিং
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

ভারতী বুক স্টল
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
উমা পাবলিশিং
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ—মে, ১৯৮৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৮৪
তৃতীয় সংস্করণ—ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫
চতুর্থ সংস্করণ—নবেম্বর, ১৯৮৬
পঞ্চম সংস্করণ—নবেম্বর, ১৯৮৭

মুদ্রক ঃ
শ্রীতপনকুমার বারিক
অজন্তা প্রিন্টার্স
৭বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মলাট ও রঙীন মানচিত্র মুদ্রণে ঃ
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
নিউ সিটি প্রেস
কলিকাতা-৭০০০০৯

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নূতন পাঠ্যতালিকাতে (সিলেবাস) নবম ও দশম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ পরস্পরের পরিপূরক। বস্তুতঃ দশম শ্রেণীর অন্তর্গত অনেক বিষয় বুঝিবার পক্ষে নবম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কতক বিষয়ের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। সে কথা স্মরণ রাখিয়া পর্ষদের নবম শ্রেণীর নূতন পাঠ্যতালিকা অনুসারে এই পুস্তকখানা রচিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়-সমূহের নিজস্ব গুরুত্ব আছে, আবার আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোলের অন্তর্গত বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য ও তাহা ঠিকমত বুঝিবার পক্ষে ইহাদের গুরুত্ব অশেষ। এসকল বিষয় মনে রাখিয়া ছাত্র-ছাত্রীগণ যাহাতে সমস্ত বিষয় সহজভাবে বুঝিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সহজ ভাষাতে এই পুস্তকখানা রচিত হইয়াছে। তাহা-দিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে পুস্তকের বিভিন্ন অংশে প্রায় ১০০ খানা মানচিত্র, চিত্র ও ছবি দেওয়া হইয়াছে। আশা করি ইহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীগণ ভূগোল শিক্ষা সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহ ও উৎসাহ বোধ করিবে এবং তাহাদের শিক্ষা সার্থক হইবে। তবে তাহাদিগকে সকল সময়ই ভূচিত্রাবলী ব্যবহার করিতে হইবে। প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্গত দেশান্তর ও স্থানীয় সময় সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের বহু উদাহরণ পরিশিষ্ট অংশেও দেওয়া হইয়াছে।

এই পুস্তকের শেষে ভূগোল পঠন-পাঠনের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার পরে প্রত্যেক অধ্যায় অনুসারে প্রচুর অনুশীলনী দেওয়া হইয়াছে। তাহাছাড়া কয়েক শত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও বস্তুধর্মী অভীক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীগণ বিশেষ উপকৃত হইবে।

এই পুস্তকের রচনা সম্পর্কে অনেক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য সুহৃদের সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই সম্পর্কে শ্রীমতী নীনা ঘোষাল এম্. এ. (ভূগোল), বি-এড ও শ্রীগোপীনাথ সাহা এম্. এস্-সির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও অন্যান্য ভাবে উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী বহু সুহৃদের নিকট হইতে অকুণ্ঠ সাহায্য পাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে যুক্তরাজ্যের আইল অব ওয়াইটের মিঃ আর. কে. পিলসবেরি (R. K. Pilsbury, Isle of Wight, U. K.) মেঘের ফটোচিত্র পাঠাইয়াছেন। লণ্ডনের মিসেস এণ্ডরুজ (C. Andrews) ও মিঃ বার্নার্ড (D. C. Bernard, London, U. K), যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির মিঃ ব্লেয়ার (James P. Blair (c) 1986 National Geographic Society, U. S. A.), আইসল্যাণ্ডের মিঃ বোকাফেলা-জিড (A. Bokafelagid, Reykyarik, Iceland) প্রভৃতি বিভিন্ন ফটো ও ছবি ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়াছেন। আর যুক্তরাষ্ট্রের ডঃ স্মিথ (John A. Smith, California, U. S. A.) নানারকম উপদেশ ও পরামর্শ দিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যে-কের নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই পুস্তকের উন্নতি সম্বন্ধে যে কোন প্রকার সাহায্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিব।

বিনীত
গ্রন্থকার

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
SYLLABUS IN GEOGRAPHY

*Part I for CLASS—IX

Topics

A. Physical Georaphy

1. The Earth as a Planet
   i) View of the earth from space. Shape (Oblate spheroid) and size of the earth (Equatorial diameter about 12.757 km and polar diameter about 12,714 km).
   ii) Movements of the earth—Rotation and revolution and their effects—formation and length of days and nights, change of seasons, deflection of planetary winds.
   iii) Determination of the location of a place on the earth's surface —properties of parallels of latitude and meridians of longitude and their relationship. Longitude and time (mathematical calculation needed). International Date line and antipodes.
2. i) Rocks—their board classification bassed on their origin—Igneous, sedimentary and metamorphic rocks.
   ii) Different types of Mountains (Fold, Block, Volcanic and Relict mountains), Plateaus (Dissected, Intermontane and Lava platenus). Plains (Alluvial—Flood plains and Deltaic plains, Coastal plains and Peneplains).
   iii) Earthquaks—causes and effects.
   iv) Weathering of the earth's crust—mechanical and chemical, their causes and effects.
   v) Work of rivers, glaciers and winds as agents of transporation and deposition.

B. Regional, Economic and Human Geography

3. India
   i) Location of India, Political divisions of Indian Union into States and Union Territories—their reorganisation since 1950 to be stated in a broad and general manner. India's neighbouring countries: Nepal, Bhutan, Bangladesh, Burma, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan. China will be dealt with in class X.
   ii) Geographical importance touching upon relief; drainage; climates; natural vegetation; soil; irrigation; major agricultural crops; rice, wheat, millets, jute, tea, coffee, sugarcane, cotton, oilseeds; power resources and minerals—coal, iron ore, petroleum, manganese ore, bauxite, mica; industries—iron and steel and major engineering industries, cotton and jute textiles.

Statistical information are to be quoted form latest offlcial sources of the Government of India.

* Part II of the syllabus is for class X

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

প্রাকৃতিক ভূগোল

Madhyamik Examination, 1986, External

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ১৯৮৬ খ্রীঃ মাধ্যমিক এক্সটার্ণ্যাল পরীক্ষার ভূগোলের বিভিন্ন প্রশ্ন এবং এই গ্রন্থকারের লিখিত প্রবেশিকা ভূগোল বইতে তাহাদের উত্তর।

ক-বিভাগ (নূতন পাঠক্রম)

১। প্রশ্নপত্রের সহিত প্রদত্ত ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিতগুলি প্রতীক ও নামসহ চিহ্নিত কর:

(ক) গোদাবরী ও কাবেরী নদী—প্রথম ভাগ, ৮৯ পৃঃ—ভারতের মানচিত্র

(খ) পশ্চিমঘাট পর্বত ও কাম্বে উপসাগর—ঐ, ৮৩ পৃঃ—দক্ষিণ ভারতের মানচিত্র

(গ) বিশাখাপত্তনম্ ও কোচিন—দ্বিতীয় ভাগ, ৩৩ পৃঃ—ভারতের মানচিত্র

(ঘ) পাট উৎপাদক অঞ্চল—প্রথম ভাগ, ১৩০ পৃঃ—ভারতের মানচিত্র

খ-বিভাগ (নূতন পাঠক্রম)

২। পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলাফল কি কি? বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কিরূপে দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তাহা বর্ণনা কর। মহাবিষুব কি?

আবর্তন গতির ফল—প্রথম ভাগ, ৮ পৃঃ, ১ম প্যারাগ্রাফ

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি—ঐ, ১২ পৃঃ, ২য় প্যারাগ্রাফ ও ১৩ পৃঃ, ১ম হইতে ৩য় প্যারাগ্রাফ।

মহাবিষুব—ঐ, ১২ পৃঃ, ২য় প্যারাগ্রাফ।

৩। ক্ষয়জাত ও সঞ্চয়জাত সমভূমির সৃষ্টি কিরূপে হয় উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক সমভূমিতে বাস করে কেন? কোন্ মহাদেশে সমভূমির আয়তন সর্বাপেক্ষা কম?

সঞ্চয়জাত সমভূমি সৃষ্টি—প্রথম ভাগ, ৩৭ পৃঃ, ২য় হইতে ৪র্থ এবং ৩৮ পৃঃ, ১ম হইতে ৪র্থ প্যারাগ্রাফ।

ক্ষয়জাত সমভূমি—ঐ, ৩৮ পৃঃ, ৬ষ্ঠ প্যারাগ্রাফ ও ৩৯ পৃঃ, ১ম প্যারাগ্রাফ

সমভূমিতে অধিকাংশ লোক বাস করে কেন—ঐ, ৩৯ পৃঃ, ২য় প্যারাগ্রাফ।

কোন্ মহাদেশে সমভূমির আয়তন কম—ওশিয়ানিয়া।

৪। কি কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ু বহন ও সঞ্চয় কার্য করিয়া থাকে? বায়ুর সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলির বর্ণনা দাও। কোন্ অঞ্চলে ঐ ধরনের ভূমিরূপ অধিক দেখা যায়?

বায়ু কিভাবে বহন ও সঞ্চয় করে—প্রথম ভাগ, ৫৮-৬০ পৃঃ

বায়ুর সঞ্চয় কাজের ফলে যে সকল ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়—ঐ, ৫৯-৬০ পৃঃ

এ ধরনের ভূমিরূপ কোথায় দেখা যায়—ঐ, ৫৯-৬০ পৃঃ

৫। আটলান্টিক মহাসাগরের প্রধান স্রোতসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। সমুদ্রস্রোতের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর। গ্রেট ব্যাঙ্কস্ কেন বিখ্যাত?

আটলান্টিক মহাসাগরের সমুদ্রস্রোত ও তাহাদের প্রভাব—দ্বিতীয় ভাগ, ১৮-২১ পৃঃ

গ্রেট ব্যাঙ্কস্—দ্বিতীয় ভাগ, ১৯ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের প্রধান মৎস্যচারণক্ষেত্র।

৬। বৃষ্টিপাত প্রধানতঃ কি কি প্রকারের হয়? বিভিন্ন প্রকার বৃষ্টিপাতের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা কর। কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাপ করা হয়?

বিভিন্ন প্রকার বৃষ্টিপাত ও প্রক্রিয়া—দ্বিতীয় ভাগ, ১১ পৃঃ, ১ম প্যারাগ্রাফ
বায়ুর আর্দ্রতা মাপিবার যন্ত্র—দ্বিতীয় ভাগ, ১০ পৃঃ, ১ম প্যারাগ্রাফ

৭। (ক) ভৌগোলিক কারণ দেখাও (যে কোন দুইটি):

(১) দেশান্তরের পার্থক্য বশতঃ স্থানীয় সময়ের ব্যবধান ঘটে।
(২) নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঋতু-পরিবর্তন অপরিচিত ঘটনা।
(৩) আর্দ্র অঞ্চলে রাসায়নিক আবহবিকার অধিক সংঘটিত হয়।
(৪) জোয়ার-ভাঁটা মানবজীবনকে প্রভাবিত করে।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (যে কোন দুইটি):

(১) গ্রাবরেখা কি?
(২) ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে?
(৩) বায়ুমণ্ডলের উপাদান কি কি?
(৪) সুপেয় ও লবণাক্ত জলের হ্রদ কাহাকে বলে?

(ক) (১) দেশান্তরের পার্থক্য বশতঃ স্থানীয় সময়ের ব্যবধান—প্রথম ভাগ, ২৩ পৃঃ—৪র্থ প্যারাগ্রাফ ও ২৪ পৃঃ ১ম প্যারাগ্রাফ।

(২) নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঋতু পরিবর্তন—প্রথম ভাগ, ১৪ পৃঃ ৩য় ও ১৬ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ।

(৩) আর্দ্র অঞ্চলে রাসায়নিক আবহবিকার—প্রথম ভাগ, ৫১ পৃঃ ২য় ও ৩য় প্যারাগ্রাফ।

(৪) জোয়ার-ভাঁটার প্রভাব—দ্বিতীয় ভাগ, ২২ পৃঃ ১ম প্যারাগ্রাফ।

(খ) (১) গ্রাবরেখা—প্রথম ভাগ, ৫৭ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ।

(২) ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন—প্রথম ভাগ, ৪৬ পৃঃ ১ম প্যারাগ্রাফ।

(৩) বায়ুমণ্ডলের উপাদান—দ্বিতীয় ভাগ, ১ম পৃঃ ৩য় প্যারাগ্রাফ ও ২য় পৃঃ ১ম প্যারাগ্রাফ।

(৪) সুপেয় ও লবণাক্ত জলের হ্রদ—দ্বিতীয় ভাগ, ২৩ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ।

গ-বিভাগ (নূতন পাঠক্রম)

৮। (ক) শ্রীলঙ্কার ভূপ্রকৃতি বর্ণনা কর।

(খ) শ্রীলঙ্কার কৃষি ও খনিজ সম্পদের বিবরণ দাও। এই দেশের প্রধান বন্দর কোন্‌টি?

শ্রীলঙ্কার ভূপ্রকৃতি—প্রথম ভাগ, ৭৭ পৃঃ ৪র্থ প্যারাগ্রাফ
শ্রীলঙ্কার কৃষিজ সম্পদ্—ঐ ৭৮ পৃঃ ৩য় প্যারাগ্রাফ
ঐ দেশের খনিজ সম্পদ্—ঐ ৭৮ পৃঃ ৪র্থ প্যারাগ্রাফ

৯। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির তুলনা কর। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ নদী পূর্ববাহিনী কেন? ভারতের বৃহত্তম নদী-অববাহিকা কোন্‌টি?

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদীর তুলনা—প্রথম ভাগ, ৯৯-১০০ পৃঃ

দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ নদী পূর্ববাহিনী—প্রথম ভাগ, ৯৩ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ ও ৯৭ পৃঃ ৩য় প্যারাগ্রাফ

ভারতের বৃহত্তম নদী-অববাহিকা—প্রথম ভাগ, ৮৯ পৃঃ ৩য় প্যারাগ্রাফ

১০। চা ও কফি উৎপাদনের জন্য কি কি ধরনের জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রয়োজন? ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই দুইটি শস্য অধিক পরিমাণে জন্মায়? চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে ভারতের স্থান কি?

চা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জলবায়ু; মৃত্তিকা—প্রথম ভাগ, ১৩১ পৃঃ ও উৎপাদনের অঞ্চল ২য় প্যারাগ্রাফ

কফি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জলবায়ু, মৃত্তিকা ও উৎপাদনের অঞ্চল—ঐ ১৩২ পৃ, ২য় প্যারাগ্রাফ

ভারত হইতে চা রপ্তানি—ঐ ১৩১ পৃঃ ১ম প্যারাগ্রাফ

১১। 'শিল্পের একদেশতা' বলিতে কি বোঝায়? পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের একদেশীভবন ঘটিয়াছে কেন? কোন্ শহরকে 'ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার' বলা হয়?

শিল্পের একদেশতা বা কেন্দ্রীভবন—প্রথম ভাগ, ১৪০ পৃঃ ৫ম প্যারাগ্রাফ

পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের একদেশতা—ঐ, ১৪৬ পৃঃ ৪র্থ প্যারাগ্রাফ

ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার—গুজরাটের আহমদাবাদকে 'ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার' বলা হইত। কারণ, এখানে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মিলের কাপড় তৈরী হইত। এখন এদেশের মধ্যে বোম্বাই বা মুম্বাইতে তৈরী হয় সবচেয়ে বেশী কাপড়।

১২। (ক) ভারতের জনসংখ্যা বন্টনের উপর কি কি বিষয় প্রভাব বিস্তার করে আলোচনা কর। ভারতে দশ লক্ষের বেশী লোক—অধ্যুষিত নগর কয়টি?

(খ) বোম্বাম বন্দরের পশ্চাৎভূমি কতদূর বিস্তৃত।

(ক) ভারতের জনসংখ্যা বন্টনের উপর প্রভাব বিস্তার করে—দ্বিতীয় ভাগ, ২৪ পৃঃ ৫ম প্যারাগ্রাফ, ২৫ পৃঃ ১ম ও ২য় প্যারাগ্রাফ, ২৭ পৃঃ ১ম প্যারাগ্রাফ

ভারতে ১০ লক্ষের বেশী লোক-অধ্যুষিত নগর—ঐ ৩০ পৃঃ ৩য় প্যারাগ্রাফ

(খ) বোম্বাই বন্দরের পশ্চাৎভূমি—ঐ ৩১ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ

১৩। ছোটনাগপুর মালভূমির খনিজ সম্পদের বিবরণ দাও। এই মালভূমির শিল্পাঞ্চলগুলির নাম কর। কোন্ নদীপ্রকল্প দ্বারা এই অঞ্চল সর্বাধিক উপকৃত হয়?

ছোটনাগপুরের খনিজ সম্পদ্—দ্বিতীয় ভাগ, ৪০ পৃঃ ৭ম প্যারাগ্রাফ, ৪১ পৃঃ ১ম প্যারাগ্রাফ

এখানকার শিল্পাঞ্চল—ঐ ৪১ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ, ৪২ পৃঃ ১ম-৩য় প্যারাগ্রাফ

এখানকার প্রধান নদী প্রকল্প—ঐ ৪০ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ

খ-বিভাগ (নূতন পাঠক্রম)

১৪। ভূপ্রকৃতি অনুসারে এশিয়া মহাদেশকে কয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়? ভাগগুলির নাম কর। যে কোন একটি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির বিবরণ দাও। পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমির নাম কর।

ভূপ্রকৃতি অনুসারে এশিয়া মহাদেশের বিভাগ—দ্বিতীয় ভাগ, ৫১-৫৪ পৃঃ

পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি—ঐ ৫২ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ

১৫। চীনের দীর্ঘতম নদীটির নাম কর। এই নদীর অববাহিকার সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও। এই অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব অত্যধিক কেন?

চীনের দীর্ঘতম নদী—দ্বিতীয় ভাগ, ৬৪ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ

ইয়াংসিকিয়াং অববাহিকার ভৌগোলিক বিবরণ—ঐ ৬২—৬৮ পৃঃ

এই অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব—ঐ ৬৮ পৃঃ ৩য় প্যারাগ্রাফ

ঙ-বিভাগ (নূতন পাঠক্রম)

১৬। পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর উপর মৌসুমী বায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর। গ্রীষ্মকালে দার্জিলিঙে পর্যটকের সমাবেশ হয় কেন? পশ্চিমবঙ্গের কোন্ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সর্বাধিক?

পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর উপর মৌসুমী বায়ুর প্রভাব—দ্বিতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট ১৬৫ পৃঃ ৩নং প্যারাগ্রাফ

গ্রীষ্মকালে দার্জিলিঙে পর্যটকের সমাবেশ—ঐ পরিশিষ্ট ১৬৫ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ

পশ্চিমবঙ্গের কোন্ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সর্বাধিক—ঐ পরিশিষ্ট ১৬৫ পৃঃ ৩নং প্যারাগ্রাফ

১৭। (ক) লণ্ডণ অববাহিকার অবস্থান ও ভূপ্রকৃতির বিবরণ দাও। এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতির কারণ কি কি?

(খ) পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীটির নাম লিখ।

লণ্ডন অববাহিকার অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি—দ্বিতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট, ১৭১ পৃঃ ৩য় ও ৪র্থ প্যারাগ্রাফ

এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতি—ঐ, পরিশিষ্ট, ১৭১ পৃঃ ৫ম প্যারাগ্রাফ

পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী—ঐ, পরিশিষ্ট, ১৬৭ পৃঃ ৪র্থ প্যারাগ্রাফ

Madhyamik Examination, 1987

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ১৯৮৭ মাধ্যমিক পরীক্ষার ভূগোলের বিভিন্ন প্রশ্ন এবং এই গ্রন্থকারের লিখিত প্রবেশিকা ভূগোল বইতে তাহাদের উত্তর

ক-বিভাগ (নূতন পাঠক্রম)

১। প্রশ্নপত্রের সহিত প্রদত্ত ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিতগুলি প্রতীক ও নামসহ চিহ্নিত কর :—

(ক) (i) হলদিয়া, (ii) লুনি নদী, (iii) বিন্ধ্য পর্বত

(খ) (i) সুন্দরবন, (ii) কঙ্কন উপকূল, (iii) সৌরাষ্ট্র

(গ) (i) একটি চা উৎপাদক অঞ্চল, (ii) একটি অভ্র খনি, (iii) দক্ষিণ ভারতের একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

(ক) (i) হলদিয়া—দ্বিতীয় ভাগ, ৩৭ পৃঃ মানচিত্র

(ii) লুনি নদী—প্রথম ভাগ, ১০০ পৃঃ ৩য় প্যারাগ্রাফ

(iii) বিন্ধ্য পর্বত—ঐ, ৯২ পৃঃ মানচিত্র

(খ) (i) সুন্দরবন—ঐ, ১১০ পৃঃ মানচিত্র (পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে বদ্বীপীয় অঞ্চল)

(ii) কঙ্কন উপকূল—ঐ, ৯২ পৃঃ মানচিত্র
(iii) সৌরাষ্ট্র—ঐ, ৮৪ পৃঃ মানচিত্র (ভারতের পশ্চিম অংশে)
(গ) (i) চা—ঐ, ১৩১ পৃঃ মানচিত্র
(ii) অভ্র খনি—ঐ, ১৩৯ পৃঃ মানচিত্র
(iii) দক্ষিণ ভারতের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র—ঐ, ১৩৩ পৃঃ মানচিত্র

২। ভূপৃষ্ঠের উপর কোন স্থানের অবস্থান কিরূপে নির্ণয় করা হয়? গ্রীনিচে যখন দুপুর ১২টা তখন কলকাতা (৮৮°৩০′ পূঃ) স্থানীয় সময় কত? নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ কত?

ভূপৃষ্ঠের উপর কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয়—প্রথম ভাগ, ১৮ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ

গ্রীনিচে (০° দ্রাঃ) যখন দুপুর ১২টা, তখন কলিকাতার (৮৮½° পূঃ) স্থানীয় সময়—গ্রীনিচের সময়ের তুলনায় কলিকাতার স্থানীয় সময় ৮৮½×৪ মিঃ বা ৩৫৪ মিঃ বা ৫ ঘঃ ৫৪ মিঃ বেশী। কাজেই গ্রীনিচের দুপুর ১২টার সময় কলিকাতার স্থানীয় সময় বৈকাল ৫টা ৫৪ মিঃ (5.54 p.m.)।

দ্বিতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট, ১৫০ পৃঃ ৯নং ও ১০নং।

নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ—প্রথম ভাগ, ১৭ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ

৩। উৎপত্তি অনুসারে মালভূমির শ্রেণী বিভাগ কর। সংক্ষেপে উহাদের সৃষ্টির কারণগুলি বর্ণনা কর। পামীর মালভূমিকে 'পৃথিবীর ছাদ' বলা হয় কেন?

উৎপত্তি অনুসারে মালভূমির শ্রেণী বিভাগ—প্রথম ভাগ, ৩৯-৪০ পৃঃ ও উৎপত্তির কারণ

পামির মালভূমি 'পৃথিবীর ছাদ'—ঐ, ৩৯ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ

৪। কার্য অনুসারে নদীর প্রবাহকে কি কি ভাগে বিভক্ত করা হয়? যে কোন একটি অংশে নদীর কার্যের বিবরণ দাও। গঙ্গা নদীর পার্বত্য প্রবাহ কতদূর বিস্তৃত?

কার্য অনুসারে নদীর প্রবাহের বিভাগ—প্রথম ভাগ, ৩২-৩৩ পৃঃ

নদীর যে কোন অংশে কার্যের বিবরণ—ঐ, ৫৩—৫৬ পৃঃ

গঙ্গা নদীর পার্বত্য প্রবাহ—ঐ, ৯৪ পৃঃ ৪র্থ প্যারাগ্রাফ

৫। বায়ুমণ্ডল কিরূপে উত্তপ্ত হয়? ভূপৃষ্ঠে কয়টি চাপবলয় আছে? উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

বায়ুমণ্ডল কিরূপে উত্তপ্ত হয়—দ্বিতীয় ভাগ, ২য় পৃঃ ৪র্থ, ৫ম প্যারাগ্রাফ

ভূপৃষ্ঠে চাপবলয়—ঐ, ৪ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ

উহাদের বিবরণ—ঐ, ৪-৫ পৃঃ

৬। আগ্নেয় পর্বত কাহাকে বলে? ক্ষয়জাত পর্বত হইতে ইহার পার্থক্য কোথায়? যে কোনও একটি আগ্নেয় পর্বতের নাম লিখ।

আগ্নেয় পর্বত—প্রথম ভাগ, ৩৭-৩৮ পৃঃ

ক্ষয়জাত পর্বতের সহিত ইহার পার্থক্য—ঐ, ৩৭-৩৮ পৃঃ

আগ্নেয় পর্বতের অপর নাম সঞ্চয়জাত পর্বত। সঞ্চয়জাত পর্বতের সহিত ক্ষয়জাত পর্বতের পার্থক্য বিস্তর। প্রথমতঃ আগে যেখানে উচ্চভূমি, অর্থাৎ পাহাড় বা মালভূমি ছিল সেখানে ক্ষয়জাত পর্বত দেখা যায়। অপর দিকে আগে যেখানে নিম্নভূমি বা সমভূমি ছিল সেখানেও আগ্নেয় পর্বত সৃষ্টি হয়। তারপর সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে আগেকার উচ্চভূমি অতি দীর্ঘকাল যাবৎ ক্রমাগত ক্ষয় হওয়ার ফলে ক্ষয়জাত পর্বতের

সৃষ্টি হয়। অন্য দিকে ভূপৃষ্ঠের কোন অংশে হঠাৎ প্রবল অগ্ন্যুৎপাত হইলে ভূগর্ভ হইতে যে লাভা, ভস্ম প্রভৃতি উৎক্ষিপ্ত হয় তাহা বারে বারে সঞ্চিত হওয়ার ফলে আগ্নেয় পর্বতের আকার ধারণ করে। তাহাছাড়া ক্ষয়জাত পর্বতের আশপাশের জায়গার কোমল শিলাসমূহ অধিক পরিমাণে ক্ষয় হওয়ার ফলে পাশের যে অংশ কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত তাহা উঁচু অবস্থায় থাকিয়া যায়। তাহাই তখন ক্ষয়জাত পর্বত রূপে পরিচিত হয়। আর আগ্নেয় পর্বতের ক্ষেত্রে প্রবল অগ্ন্যুৎপাতের সময় আগ্নেয় মুখের আশপাশে যেখানে আগ্নেয় পদার্থ অর্থাৎ লাভা, ভস্ম প্রভৃতি অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয় তাহাই কখন কখন পর্বতের আকার ধারণ করে। এবং তাহাকেই আগ্নেয় পর্বত বলে। তাহার চারিদিকের জায়গা আগেকার মত অবস্থাতেই থাকিতে পারে। অথবা তথায় সামান্য পরিমাণে লাভা জমিলে তাহা কিছুটা উঁচুও হইতে পারে।

একটি আগ্নেয় পর্বতের নাম—প্রথম ভাগ, ৩৭ পৃঃ ৩য় প্যারাগ্রাফ

৭। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ—

(ক) পৃথিবীতে দিন-রাত্রি হয় কেন? (খ) 'প্রতিপাদস্থান' কাহাকে বলে? (গ) পাললিক শিলা কিরূপে সৃষ্টি হয়? (ঘ) যান্ত্রিক আবহবিকার বলিতে কি বোঝায়? (ঙ) 'ফেরেল সূত্র' বলিতে কি বুঝ? (চ) সমুদ্র স্রোতের উৎপত্তি হয় কিরূপে? (ছ) 'ভরা কটাল' কাহাকে বলে?

(ক) পৃথিবীতে দির-রাত্রি হয়—প্রথম ভাগ, ৫ পৃঃ ৩য় প্যারাগ্রাফ
(খ) প্রতিপাদস্থান—ঐ, ২৮ পৃঃ ৩য় প্যারাগ্রাফ
(গ) পাললিক শিলা সৃষ্টি—ঐ, ৩২ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ
(ঘ) যান্ত্রিক আবহবিকার—ঐ, ৪৭ পৃঃ ৩য় প্যারাগ্রাফ
(ঙ) ফেরেল সূত্র—দ্বিতীয় ভাগ, ৬ পৃঃ ১ম প্যারাগ্রাফ

ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ার সময় যে কোন পদার্থ পৃথিবীর আবর্তন গতিবশতঃ উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে বাঁকে। আর দক্ষিণ গোলার্ধে তাহা বামদিকে বাঁকে। পদার্থটি যে কোন দিকে প্রবাহিত হয় না কেন, এই নিয়ম অনুসারে তাহা ডান বা বাম দিকে বাঁকে। বায়ুপ্রবাহের ক্ষেত্রে এই নিয়ম বেশী প্রযোজ্য।

(চ) সমুদ্র স্রোতের উৎপত্তি—দ্বিতীয় ভাগ, ১৮ পৃঃ ৩য় প্যারাগ্রাফ
(ছ) ভরা কোটাল—ঐ, ২২ পৃঃ ৪র্থ প্যারাগ্রাফ

গ-বিভাগ (নূতন পাঠক্রম)

৮। (ক) বর্তমান ভারতে কয়টি রাজ্য ও কয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে? ভারতের নবীনতম রাজ্যটির নাম লিখ।

(খ) কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে পাকিস্তানের অগ্রগতির বিবরণ দাও। পাকিস্তানে অবস্থিত পৃথিবীর উচ্চতম স্থানটির নাম লিখ।

(ক) ভারতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল—প্রথম ভাগ, ৬৫ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ

বর্তমানে ভারতে গভর্ণরশাসিত রাজ্য ২৫টি ও কেন্দ্রশাসিত রাজ্য ৭টি। ভারতের নবতম গভর্ণরশাসিত রাজ্য গোয়া।

(খ) পাকিস্তানের কৃষি ও শিল্প—প্রথম ভাগ, ৮০-৮১ পৃঃ

সেদেশে অবস্থিত পৃথিবীর উচ্চতম স্থান—ঐ, ৮০ পৃঃ ৩য় প্যারাগ্রাফ

৯। ভারতের প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগগুলি কি কি? যে কোন একটি বিভাগের ভূপ্রকৃতির বিবরণ দাও। ভারতের প্রাচীনতম পর্বতটির নাম লিখ।

ভারতের প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ—প্রথম ভাগ, ৮৩—৯৪ পৃঃ
ভারতের প্রাচীনতম পর্বত—ঐ, ৯১ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ

১০। ধান্য উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ কি কি? ভারতে ধান্য উৎপাদনে বিভিন্ন রাজ্যের ভূমিকা আলোচনা কর। বিঘা প্রতি ফলন কোন্ রাজ্যে সর্বোচ্চ?

ধান উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ—প্রথম ভাগ, ১২৪-১২৫ পৃঃ
এ বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যের ভূমিকা—ঐ, ১২৫ পৃঃ
বিঘা প্রতি ফলন কোন্ রাজ্যে সর্বোচ্চ—অন্ধ্র প্রদেশ

১১। কয়লা ও খনিজ তৈল কি কি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়? ভারতের তিনটি কয়লাখনি অঞ্চলের নাম কর। 'সাগর সম্রাট' কি?

খনিজ তৈল ও কয়লার ব্যবহার—প্রথম ভাগ, ১৩৩ পৃঃ ৪র্থ প্যারাগ্রাফ, ১৩৪ পৃঃ ৩য় প্যারাগ্রাফ, ১৩৫ পৃঃ ৫ম প্যারাগ্রাফ, ১৩৬ পৃঃ ১ম প্যারাগ্রাফ, ১৩৭ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ

কয়লা খনি অঞ্চলের নাম—ঐ, ১৩৬ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ
সাগর সম্রাট—ঐ, ১৩৭ পৃঃ ৪র্থ প্যারাগ্রাফ

১২। (ক) ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে কেন?
(খ) ভারতের কোন্ রাজ্যে জনসংখ্যা সর্বাধিক?
(গ) হলদিয়ায় নতুন বন্দর গড়িয়া উঠার কারণ কি কি?

(ক) সাধারণতঃ অশিক্ষিত ও দরিদ্র পরিবারে লোকসংখ্যা তাড়াতাড়ি বাড়ে। এদেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত ও দরিদ্র। তার উপর ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে লক্ষ লক্ষ লোক এদেশে আসিয়াছে। ফলে, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে ও দিল্লীর আশপাশে হঠাৎ লোকবৃদ্ধি হইয়াছে। এখনও প্রায়ই বাংলাদেশ হইতে কিছু লোক এদেশে আসে।

(খ) কোন্ রাজ্যে জনসংখ্যা সর্বাধিক—দ্বিতীয় ভাগ, ২৫ পৃঃ তালিকা
(গ) হলদিয়া—ঐ, ৩৯ পৃঃ ১ম প্যারাগ্রাফ

১৩। হুগলী শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিবার কারণগুলি আলোচনা কর। এই অঞ্চলের প্রধান শিল্পটির নাম কর। এই শিল্প বর্তমানে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন?

হুগলি শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিবার কারণ—দ্বিতীয় ভাগ, ৩৫ পৃঃ ১ম ও ২য় প্যারাগ্রাফ ৩৬-৩৭ পৃঃ

এই অঞ্চলের সর্বপ্রধান শিল্প—ঐ, ৩৭ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ
পাটশিল্পের সমস্যা—প্রথম ভাগ, ১৪৮-১৪৯ পৃঃ

ঘ-বিভাগ (নূতন পাঠক্রম)

১৪। এশিয়ায় নদীগুলিকে কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়? ভাগগুলির নাম কর। যে কোন দুই ধরনের নদীর গতিপথের বর্ণনা দাও। কোন্ নদীকে 'স্বর্ণরেণুর নদী' বলে?

এশিয়ার নদীগুলির বিভাগ এবং গতিপথের বর্ণনা—দ্বিতীয় ভাগ, ৫৪—৫৭ পৃঃ
স্বর্ণরেণুর নদী—ঐ, ৫৬ পৃঃ ১ম প্যারাগ্রাফ

১৫। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার কোন্ কোন্ দেশ খনিজ তৈল উৎপাদন করে? আরব উপদ্বীপের বৃহত্তম দেশটির নাম কর। এই দেশের সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার খনিজ তৈল উৎপাদক দেশ—দ্বিতীয় ভাগ, ৭৮ পৃঃ ৫ম প্যারাগ্রাফ ও ৭৯ পৃঃ ১ম প্যারাগ্রাফ

এখানকার বৃহত্তম দেশ—ঐ, ৭৮ পৃঃ ৫ম প্যারাগ্রাফ

এদেশের সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ—ঐ, ৭৮—৮২ পৃঃ
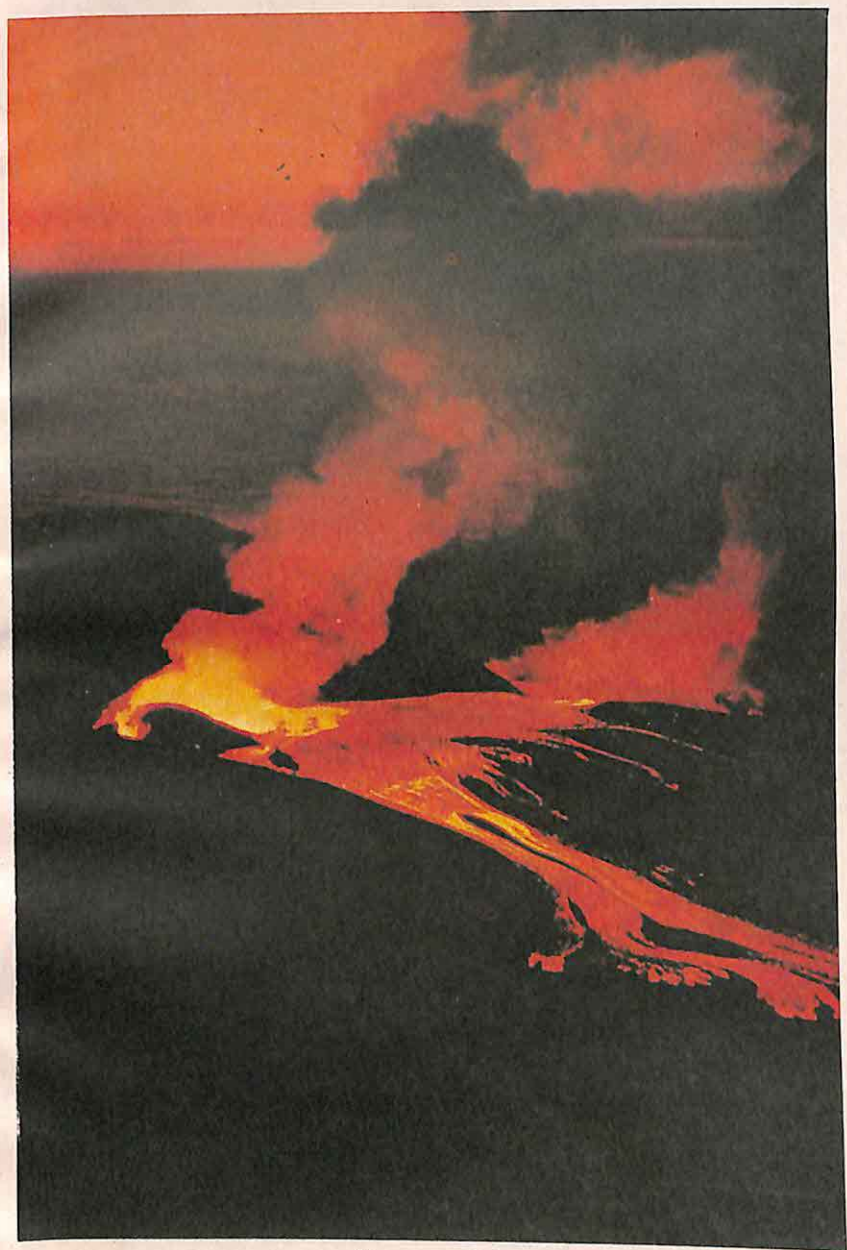
জীবন্ত আগ্নেয়গিরি

1. প্রাথমিক গতি
2. মধ্যগতি
3. অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ
4. পরিণত অবস্থা
5. বদ্বীপ
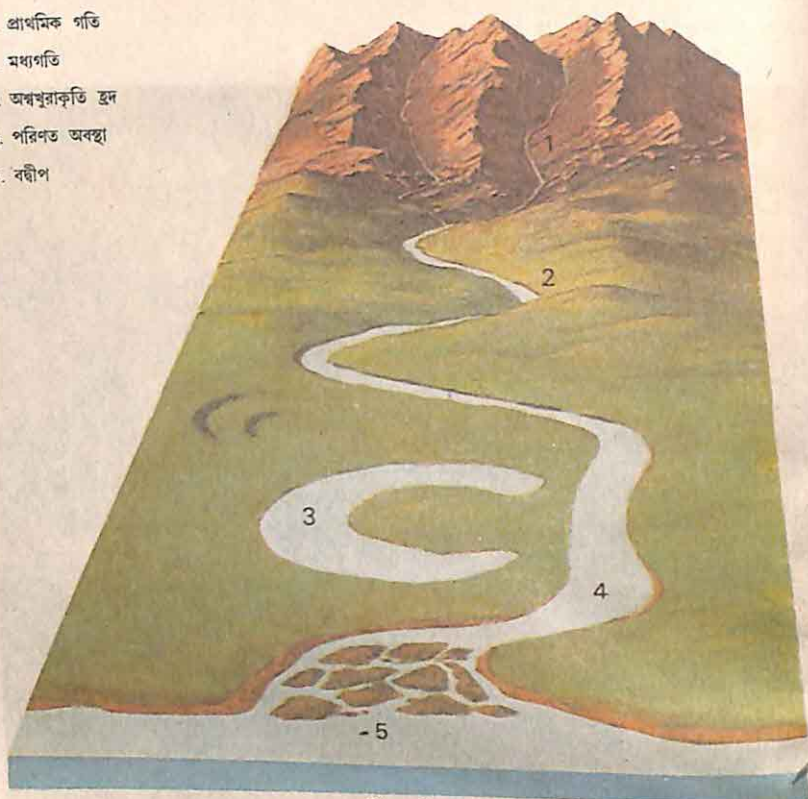
নদীর গতিপথ

ক্ষয়কার্য

হিমবাহ
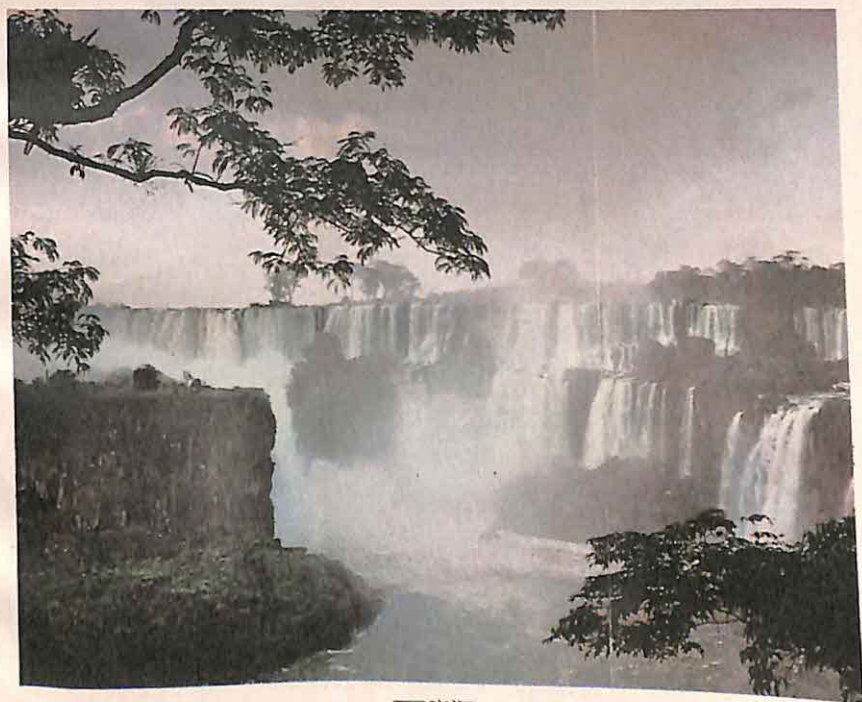
জলপ্রপাত

গোমুখের পাশে গভীর গিরিখাত
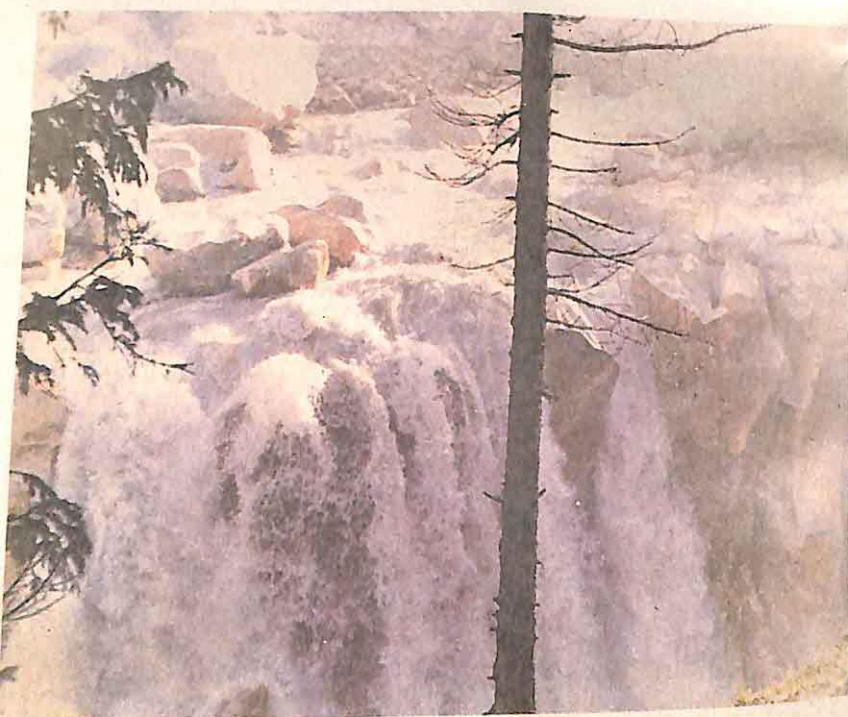
গোমুখের নিকটবর্তী জলপ্রপাত

প্রাকৃতিক ভূগোল
Physical Geography

প্রথম অধ্যায় | পৃথিবী-গ্রহ ; ইহার আকৃতি ও আয়তন
(The Earth as a planet ; Its shape and size)

পৃথিবী-গ্রহ

সমগ্র মানবসমাজ এবং অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও উদ্ভিদের বাসভূমি আমাদের এই পৃথিবী। ইহা একটি বিচ্ছিন্ন পদার্থ নয়। **মহাবিশ্বে** (The universe) বা অসীম আকাশমণ্ডলে যে সৌরজগৎ বা সৌরমণ্ডল বা **সৌর পরিবার** (Solar system) রহিয়াছে ইহা তাহার অন্তর্গত।

সূর্য ও পৃথিবী

রাত্রিতে নির্মেঘ আকাশে মণিমুক্তার অতিবিচিত্র কারুকার্যের মত দেখা যায় অসংখ্য নক্ষত্র। তাহাদের মধ্যে যেটি পৃথিবীর নিকটতম এবং সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রতম তাহাই সূর্য। অথচ দিনের বেলা আকাশে কেবল মাত্র ইহাকেই দেখা যায়। ইহাই **সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র** এবং পৃথিবীর **সমগ্র জীবজগতের প্রাণকেন্দ্র**। ইহার প্রভাবেই পৃথিবীর সমুদয় উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণীর পক্ষে জীবন ধারণ সম্ভবপর। আকাশমণ্ডলে নক্ষত্রপুঞ্জের সংখ্যা কত এবং ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি সূর্যের তুলনায় কত বড়, তাহা আজও অজানা। তাহাছাড়া পৃথিবী হইতে ইহাদের প্রত্যেকের দূরত্ব এত বেশী যে ইহাদিগকে এক একটি উজ্জ্বল আলোক-কণার বা আলোক-বিন্দুর মত দেখায়। ইহাদের আলো স্থির নয়। তাহা অনবরত মিট মিট করে। ইহারা পৃথিবী হইতে এত দূরে যে শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যেও ইহাদিগকে বড় দেখায় না, কেবল অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়।

সূর্য অতিপ্রচণ্ড পরিমাণে **উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ**। ইহার উপরিভাগের উত্তাপের পরিমাণ প্রায় ৬০০০° সেঃ (সেলসিয়াস)। ইহার আকৃতি গোল এবং **আয়তন** পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় ১৩ লক্ষ গুণ বেশী। ইহার **আকর্ষণ শক্তি*** (Gravitational force) অতিশয় প্রবল। তাহার প্রভাবে পৃথিবী এবং সৌরমণ্ডলের অন্যান্য **গ্রহ** প্রত্যেকের নিজস্ব পথে অনবরত **সূর্যের চারিদিকে** (পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে) **ঘুরিতেছে** (১নং চিত্র)। এভাবে ঘুরে বলিয়াই ইহাদিগকে বলা হয় গ্রহ (Planet=wanderer বা ভ্রমণকারী)। ইহাদের নিজ নিজ উপগ্রহও (Satellite) এই গ্রহগণের চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে। এসকল উপগ্রহও এভাবে নিজ নিজ গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। উপগ্রহগুলির মধ্যে চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। ইহা পৃথিবী হইতে গড়ে প্রায় ৩·৮৪ লক্ষ কিঃ

---

* সৌরজগতের অন্তর্গত গ্রহগণ সূর্য হইতে উৎপন্ন, আর উপগ্রহগণ নিকটবর্তী গ্রহ হইতে উৎপন্ন (যেমন, পৃথিবী হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি)—এরূপ মতবাদ প্রচলিত। তবে অন্য মতবাদও আছে।

মিঃ দূরে থাকিয়া প্রতি ২৭⅓ দিনে এক বার পৃথিবীর চারিদিকে সম্পূর্ণ রূপে ঘুরিতেছে (৩নং চিত্র)। ইহা অত্যন্ত শীতল জড়পিণ্ড ও জলহীন। এজন্য চন্দ্রে উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু নাই।

পৃথিবী যে কক্ষে (Ecliptic) বা পথে সূর্যের চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে তাহার আকৃতি উপবৃত্তের (ellipse) মত (গোল নয়)। এই কক্ষে **সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব** গড়ে প্রায় ১৪·৯ কোটি কিঃ মিঃ। তবে জুলাই মাসে এই দূরত্ব
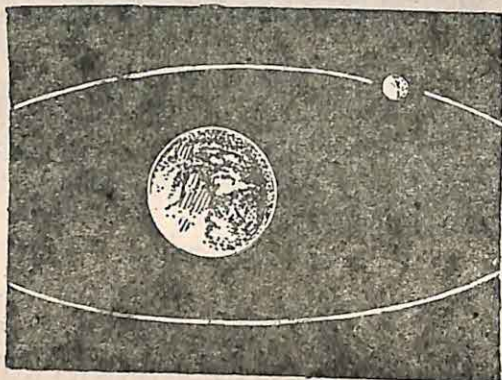
৩নং চিত্র—পৃথিবী ও চন্দ্র।

একটু বেশী ও জানুয়ারীতে একটু কম। পৃথিবী সূর্য হইতে এত দূরে থাকা সত্ত্বেও ইহা সূর্যের প্রচণ্ড তাপের অতি সামান্য অংশ (২০০ কোটি ভাগের প্রায় এক ভাগ মাত্র) লাভ করে। আর তাহাদ্বারাই **ভূপৃষ্ঠ আলোকিত ও উত্তপ্ত** হয়। এই তাপের পরিমাণ এতই প্রচুর যে ইহার প্রভাবেই ভূপৃষ্ঠে আবহাওয়া (weather) ও জলবায়ুর (climate) পরিবর্তন ঘটে এবং উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর জন্ম ‡ হয়।

সৌরমণ্ডল

পৃথিবী সহ নিম্নলিখিত জ্যোতিষ্ক (Luminaries) দ্বারা সৌরমণ্ডল গঠিত। এখানে আছে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি নয়টি * গ্রহ। সৌরমণ্ডলে আর আছে চন্দ্র সহ ৩২টি উপগ্রহ, প্রায় ৪৫,০০০ গ্রহাণু (Asteroids) বা অতি-ক্ষুদ্র আকৃতির গ্রহ। তাহাছাড়া আছে ছায়াপথ (Milky way) নামে একপ্রকার আলোক-

‡ বুধ ও শুক্র পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের অধিকতর নিকটবর্তী গ্রহ। সম্ভবতঃ একারণেই ইহাদের উপরিভাগে তাপের পরিমাণ এত বেশী যে এখানে উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু জন্মিতে পারে না। আবার বৃহস্পতি ও অন্যান্য গ্রহ সূর্য হইতে এত বেশী দূরে যে সে সকল গ্রহে অত্যধিক শীতলতার জন্য জীবজন্তু ও উদ্ভিদ্ জন্মে না। সৌরমণ্ডলের গ্রহগণের মধ্যে মঙ্গল পৃথিবীর নিকটতম। কাজেই এরূপ অনুমান হয় যে এক মাত্র মঙ্গল গ্রহে উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু থাকিতে পারে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান কার্য চলিতেছে।

* কতক বৈজ্ঞানিকের মতে কয়েক বৎসর পূর্বে প্লুটোর চেয়ে দূরে এবং আরও ছোট একটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আপাতত ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে ভল্ক্যান।
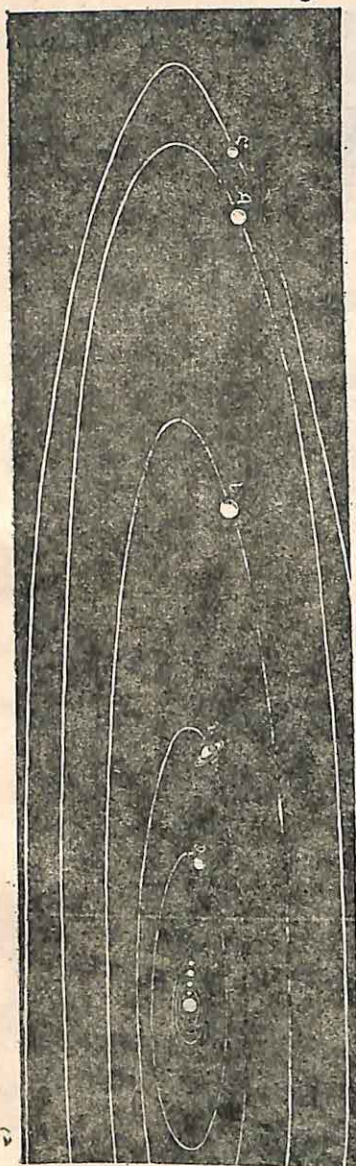
১নং চিত্র—সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত গ্রহগণের নিজ নিজ কক্ষ বা ভ্রমণপথ।
১-বুধ, ২-শুক্র, ৩-পৃথিবী, ৪-মঙ্গল, ৫-বৃহস্পতি, ৬-শনি,
৭-ইউরেনাস, ৮-নেপচুন, ৯-প্লুটো।
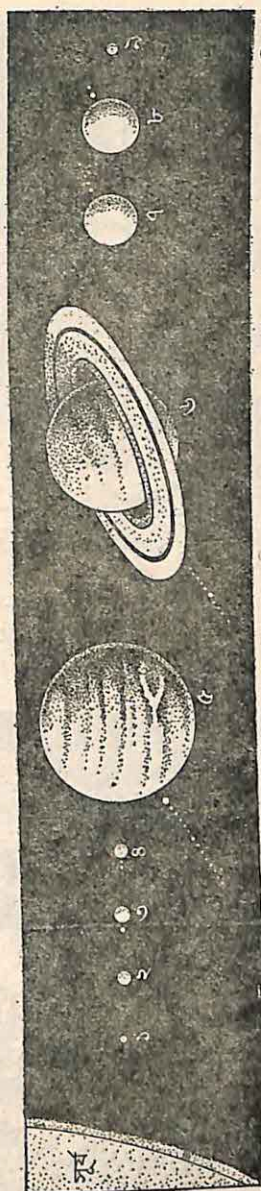
২নং চিত্র—সৌর পরিবারের অন্তর্গত গ্রহগণের আকৃতি ও আয়তন।
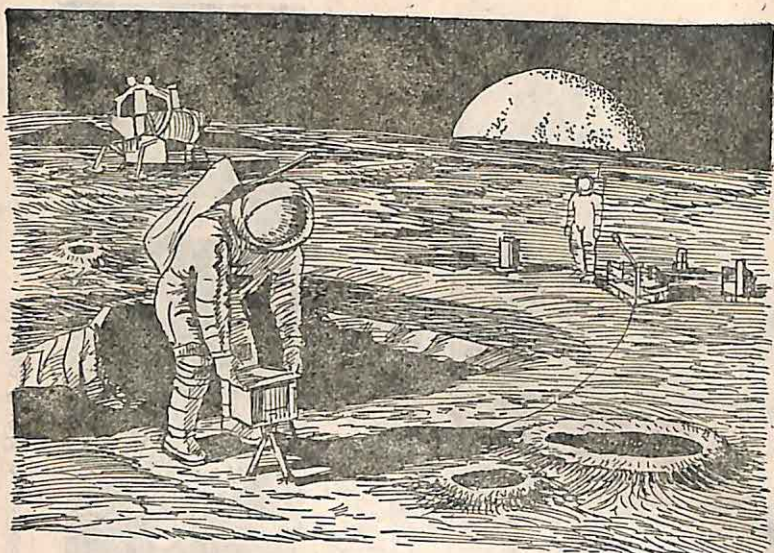
৪নং চিত্র—চন্দ্রে মানুষ—চন্দ্র হইতে নেওয়া পৃথিবীর ফটোচিত্র ;
পৃথিবীর প্রায়-গোল আকৃতির নির্ভুল প্রমাণ।

৫নং চিত্র—মহাকাশযান হইতে নেওয়া পৃথিবীর ফটোচিত্র ;+চিহ্নিত অংশ আরবের দক্ষিণপশ্চিম ভাগ, পাশে আফ্রিকার উত্তরপূর্ব অংশ।

রেখা, নানারকম গ্যাসীয় পদার্থ, প্রচুর ধূলি প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন সময় সময় পৃথিবী হইতে আকাশে দেখা যায় কতক ধূমকেতু (comets) ও উল্কা (meteors)। সৌর-মণ্ডলের অন্তর্গত গ্রহগণের আয়তন (২নং চিত্র), সূর্য হইতে ইহাদের প্রত্যেকের দূরত্ব, প্রত্যেক গ্রহের উপগ্রহ প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

গ্রহ	সূর্য হইতে দূরত্ব হিসাবে পর্যায়	সূর্য হইতে দূরত্ব (কোটি কিমি)	গ্রহগণের আয়তন হিসাবে পর্যায়	গ্রহগণের ব্যাস (হাজার কিমি)	গ্রহগণের উপগ্রহ (সংখ্যা)	গ্রহগণের সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সময়
বুধ	প্রথম	৫·৮	নবম	৪·৬	—	৮৮ দিন
শুক্র	দ্বিতীয়	১০·৭	ষষ্ঠ	১২·১	—	২২৫ "
পৃথিবী	তৃতীয়	১৪·৯	পঞ্চম	১২·৬	১	৩৬৫¼ "
মঙ্গল	চতুর্থ	২২·৬	সপ্তম	৬·৭	২	৬৭৮ "
বৃহস্পতি	পঞ্চম	৭৭·১	প্রথম	১৩৮·৯	১২	১২ বৎসর
শনি	ষষ্ঠ	১৪১·৪	দ্বিতীয়	১১৪·৪	১১	২৯½ "
ইউরেনাস	সপ্তম	২৪৮·৮	তৃতীয়	৪৭·০	৫	৮৪ "
নেপচুন	অষ্টম	৪৪৪·৮	চতুর্থ	৪৪·৮	২	১৬৫ "
প্লুটো	নবম	৬৬৮·৮	অষ্টম	৬·৪	—	২৬৪৭/১২ "

আকাশমণ্ডল হইতে পৃথিবীর দৃশ্য—পৃথিবীর আকৃতি ও আয়তন

নানাপ্রকার যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে জানা গিয়াছে পৃথিবীর আকৃতি **প্রায়-গোল**†। সেজন্য এই আকৃতিকে সাধারণতঃ বলা হয় **অভিগত গোলক** (Oblate spheroid)। অন্য কোন পদার্থেরই আকৃতির সহিত পৃথিবীর আকৃতির মিল নাই। ইহা কেবল ইহারই মত ; অর্থাৎ ইহা **ভূগোলক** (Geoid)।

মানবসমাজের জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা (Science and technology) প্রভৃতির ক্রমশঃ অসামান্য উন্নতি হইতেছে। ফলে, গত কয়েক বৎসরে বিভিন্ন মহাকাশযানের (spaceship) সাহায্যে **আকাশমণ্ডলে চন্দ্রে ও শুক্র** গ্রহে বিভিন্ন **অভিযান** হইয়াছে। আমাদের ভারতও * এরূপ অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছে। এসকল অভিযানের **সময়** পৃথিবীর অসংখ্য **আলোকচিত্র** (photograph) নেওয়া হইয়াছে (৪ ও ৫নং চিত্র)। তাহাদের সাহায্যে **নির্ভুল** রূপে প্রমাণিত হয় যে **পৃথিবীর আকৃতি প্রায়-গোলাকার**। অবশ্য ইহার আগে কুক, ম্যাজেলান প্রভৃতি নাবিক সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করি-

† সম্পূর্ণ গোল নয়। পৃথিবীর উভয় মেরু অঞ্চল কিছু চাপা এবং মধ্য ভাগে নিরক্ষীয় অঞ্চল সামান্য স্ফীত।

* ভারতের প্রথম মহাকাশচারী (cosmonaut) স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা দুই সোভিয়েট মহাকাশচারীর সহিত ১৯৮৪ খৃীঃ মহাকাশ পরিক্রমণ করেন। তাঁহাদের আকাশ-যান প্রতি ৯০ মিনিটে এক বার পৃথিবীকে পরিক্রমণ করিয়াছে। তাহার ফলে তাঁহারা প্রতি ৯০ মিনিট পর পর সূর্যকে নূতন করিয়া দেখেন বা সূর্যোদয় লক্ষ্য করেন। তাঁহারা পৃথিবীর বহু ফটোচিত্রও গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে পৃথিবীর আকৃতি প্রায়-গোল। তাঁহারা পৃথিবীর গতিও স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে চাঁদের তুলনায় পৃথিবী অনেক গুণ বড় এবং অধিক উজ্জ্বল। পৃথিবীর উপরিভাগ সম্পর্কে ইহাও দেখিয়াছেন যে সুমেরু অঞ্চল সমুদ্র-সমতল (sea level) হইতে নীচু।

বার সময় কোথাও পৃথিবীর সীমা খুঁজিয়া পান নাই। কাজেই তখন হইতে পরোক্ষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে পৃথিবীর আকৃতি গোল। পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে আরও কতক পরোক্ষ প্রমাণ আছে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন পূর্ণিমা তিথিতে **চন্দ্রগ্রহণের সময়** চাঁদের উপর পৃথিবীর গোলাকার ছায়াও (৬নং চিত্র) একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। তবে চন্দ্র ও মহাকাশ হইতে পৃথিবীর আলোকচিত্র গ্রহণ করার পর এসকল পরোক্ষ যুক্তি, প্রমাণের উপর নির্ভর করা নিষ্প্রয়োজন।

পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুর (centre) **মধ্য** দিয়া **নিরক্ষরেখা বরাবর** পূর্ব-পশ্চিমে **পৃথিবীর ব্যাস** বা নিরক্ষীয় ব্যাস (Equatorial diameter) প্রায় ১২,৭৫৭ কিঃ মিঃ। আর **সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত** পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুর মধ্য দিয়া **উত্তর-**
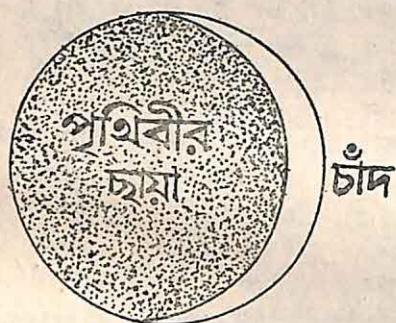
৬নং চিত্র—চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়া।

৭নং চিত্র—ভূগোলকে পৃথিবীর মেরুরেখা এবং নিরক্ষীয় ব্যাসের অবস্থিতি ও দৈর্ঘ্য নির্দেশ

দক্ষিণে ব্যাস বা মেরুদেশীয় ব্যাস (Polar diameter) প্রায় ১২,৭১৪ কিঃ মিঃ (৭নং চিত্র)। কারণ, সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চল সামান্য চাপা। পৃথিবীর উপরিভাগের বা ভূপৃষ্ঠের প্রায় ২৯% স্থল ভাগ এবং প্রায় ৭১% জল ভাগ (সাগর, মহাসাগর)। এজন্য মহাকাশে ভ্রমণ কালে রাকেশ শর্মা ও অন্যান্য আকাশচারীর মনে হইয়াছে যে পৃথিবী একটি নীল গোলক (Blue globe)। পৃথিবীর আকৃতি প্রায় গোল বলিয়া ইহার বিভিন্ন অংশে পরিধির মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। ইহার **বৃহত্তম পরিধি** নিরক্ষীয় অঞ্চলে। এই পরিধি প্রায় ৩৯,৭৬০ কিঃ মিঃ। তবে সাধারণ ভাবে বলা হয় প্রায় ৪০,০০০ কিঃ মিঃ। আর **ভূপৃষ্ঠের** ক্ষেত্রফল বা পৃথিবীর উপরিভাগের মোট **আয়তন** প্রায় ৫৬ কোটি বর্গ কিঃ মিঃ।

পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে ১২", ১৮", ২৪" প্রভৃতি মাপের ব্যাসযুক্ত ভূগোলক * (Globe) ব্যবহৃত হয়। তবে ইহাদের আকৃতি সম্পূর্ণ গোল। কারণ, ভূগোলকে সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চল যে সামান্য চাপা তাহা দেখান সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৃথিবীর গতি ও তাহার প্রভাব
(Movements of the earth and their effects)

পৃথিবীর গতি

আমাদের মনে হয় পৃথিবী স্থির। তাহার কারণ, আমরা পৃথিবীতে বাস করি। তাহাছাড়া পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় আমরা নিতান্ত ক্ষুদ্র জীব মাত্র। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে **পৃথিবী গতিশীল**। মহাকাশ হইতে রাকেশ শর্মা ও অন্যান্য মহাকাশ-চারীরা এই গতি স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহার **গতি** দুইটি—**আবর্তন** (rotation) ও **পরিক্রমণ** (revolution)। ইহাদের প্রভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানের মানুষ অনবরত দেখে দিবার পর রাত্রির, আবার রাত্রির পর দিবার আগমন। আরও লক্ষ্য করে বৎসরের পর বৎসর যেন নির্দিষ্ট নিয়মে দিবারাত্রির দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটিতেছে। তাহাছাড়াও লক্ষ্য করে শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুও যেন নির্দিষ্ট নিয়মেই প্রতি বৎসর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। এ সম্পর্কে পৃথিবীর উভয় গতির প্রভাব সুস্পষ্ট। এবিষয়ে পৃথিবীর প্রায়-গোল আকৃতির প্রভাব এবং পৃথিবীর কক্ষের সহিত মেরুরেখার ৬৬½° কৌণিকভাবে অবস্থিতির প্রভাবও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আবর্তন গতি

পৃথিবী ইহার আবর্তন গতিবশতঃ অনবরত আপন মেরুরেখার চারিদিকে **পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আবর্তন** (rotation) করিতেছে। এই গতির ফলে পৃথিবীর যে অংশ যখন সূর্যের সম্মুখে উপস্থিত হয় ও তাহার আলোক লাভ করে সেখানে তখন **দিবাভাগ**। আর যে অংশ যখন সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে ও তাহার আলোক লাভে বঞ্চিত হয়, সেখানে তখন **রাত্রি** (৮নং চিত্র)। পৃথিবীর এই গতির ফলে কেবল মাত্র সুমেরু ও কুমেরুর আশ-পাশ ভিন্ন পৃথিবীর বাকী সমুদয় স্থানে ক্রমাগত **দিবা-রাত্রির সৃষ্টি** হয়। ভূপৃষ্ঠে অনবরত দিবাভাগের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিবা—এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এজন্য এই
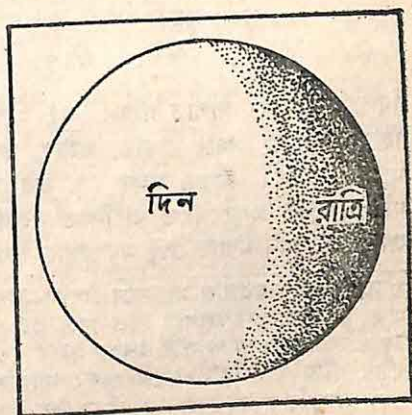
৮নং চিত্র—দিন ও রাত্রি।

* সম্ভবতঃ গ্রীস দেশে সর্বপ্রথম (প্রায় ১৫০ খৃঃ পূঃ) ভূগোলকের প্রচলন হয়।

গতির অন্য নাম **আহ্নিক গতি** (Diurnal motion)। পৃথিবীর এভাবে এক বার সম্পূর্ণ রূপে আপন মেরুরেখার বা কক্ষের চারিদিকে আবর্তন করিবার জন্য প্রয়োজন সূর্যের হিসাবে গড়ে ২৪ ঘন্টা সময়। আর নক্ষত্রের হিসাবে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড সময়। অর্থাৎ এতটা সময় পর পর সূর্যকে বা আকাশের এক একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট স্থানে দেখা যায়। এজন্য এই সময়কে বলা হয় সৌর দিন ও নাক্ষত্র দিন, অথবা এই সময়ই হইল **সৌর দিন ও নাক্ষত্র দিনের মাপ।**

আবর্তন গতির প্রমাণ

পৃথিবীর আবর্তন গতি সম্বন্ধে অনেক যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ † আছে। এবিষয়ে কতক **পরীক্ষাও** ‡ (experiment) করা হইয়াছে। তাহাছাড়া একটি ভূগোলক ও আলোর সাহায্যে যে-কেহই এই বিষয়ে পরীক্ষা করিতে পারে। তবে সম্প্রতি মহাকাশচারীরা শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে পৃথিবীর আবর্তন গতি স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহাই এসম্পর্কে **সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল প্রমাণ।**

পৃথিবীর আবর্তনের প্রভাব

সূর্য স্থির। ইহা জানা সত্ত্বেও পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলেই আমরা আকাশের দিকে তাকাইয়া লক্ষ্য করি সূর্যের পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে (অর্থাৎ পৃথিবীর গতির
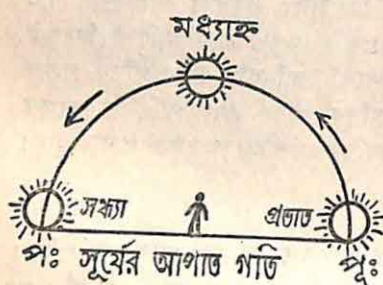
৯নং চিত্র।

১০নং চিত্র—ভূগোলক ও আলোর সাহায্যে দিবা-রাত্রি পরীক্ষা।

বিপরীত দিকে) আপাত গতি। এই আপাত গতির জন্যই ভূপৃষ্ঠের একই জায়গাতে দিনের বিভিন্ন সময়ে **প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা** প্রভৃতি অবস্থা (৯নং চিত্র) পর পর ঘুরিয়া আসে। আরও লক্ষ্য করা যায় যে স্থানে যখন প্রভাত, তাহার উত্তরে ও দক্ষিণে একই মধ্যরেখাতে অবস্থিত সকল জায়গাতেও তখনই প্রভাত। এরূপ এক জায়গাতে যখন মধ্যাহ্ন সেই মধ্যরেখার উপর অবস্থিত অন্য সকল জায়গাতেও তখনই

† সূর্য এবং নক্ষত্রপুঞ্জ মহাকাশে স্থির। তবু পৃথিবীর এই গতির জন্য পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রগণের আপাত গতি লক্ষ্য করা যায়। তাহাছাড়া পৃথিবীর এই গতির জন্যই ইহার আদি রূপ বা গ্যাসীয় অবস্থা হইতে বর্তমান অবস্থায় পরিবর্তনের সময় ইহার আকৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া প্রায়-গোলাকার হইয়াছে। সেজন্য পৃথিবীর নিজস্ব প্রায়-গোল আকৃতিও এই আবর্তন গতির একটি প্রমাণ।

‡ ফ্রান্সের বুলো ও পশ্চিম জার্মানীর হাম্বুর্গ নগরের উঁচু দালান হইতে পাথরের টুকরো সোজাসুজি নীচে ফেলিয়া দিয়া এবিষয়ে পরীক্ষা করা হইয়াছে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি নগরের প্যান্থিয়ন গীর্জার চূড়া হইতে তার ও দোলকের সাহায্যেও পরীক্ষা করা হইয়াছে।

মধ্যাহ্ন। বস্তুতঃ একটি আলোর সামনে একটি ভূগোলককে ধীরে ধীরে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘুরাইলে স্পষ্ট দেখা যায় যে প্রত্যেক মধ্যরেখার উপর অবস্থিত সকল স্থানে একই সময়ে এপ্রকার এক একটি অবস্থা (১০নং চিত্র)। আরও লক্ষ্য করা যায় যে দেশান্তরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসকল অবস্থার ও স্থানীয় সময়ের পরিবর্তন হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে এসকল বিষয় আলোচনা করা হইবে। পৃথিবীতে সূর্যের **আলোক ও উত্তাপ লাভ** সম্বন্ধে এরূপ পরিবর্তনের সহিত ভূপৃষ্ঠে **উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর** (মানুষ সহ) জন্ম, বৃদ্ধি, অভ্যাসাদির সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ। যেমন, সকল প্রাণীই রাত্রিতে বিশ্রাম করে এবং দিবাভাগে কাজ করে।

বায়ু প্রবাহের গতিবিক্ষেপ

পৃথিবীর প্রায়-গোল আকৃতির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আবর্তনের গতি-বেগ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যেমন, **নিরক্ষীয় অঞ্চলে** পৃথিবীর আয়তন সবচেয়ে বেশী, পৃথিবীকে বেষ্টনকারী অক্ষরেখার পরিধিও সবচেয়ে বেশী। এখানে পৃথিবীর আবর্তনের গতিবেগও **সর্বাপেক্ষা অধিক**—প্রতি ঘন্টায় প্রায় ১৬৮০ কিঃ মিঃ। এখান হইতে **উত্তরে ও দক্ষিণে** পৃথিবী-গোলকের আয়তন ক্রমশঃ কম এবং অক্ষ-রেখার দৈর্ঘ্যও কম। ফলে, নিরক্ষরেখা হইতে ক্রমশঃ অধিক উত্তরে ও দক্ষিণে পৃথিবীর **আবর্তনের গতিবেগও ক্রমশঃ কম**। যেমন, ২৩½° উঃ বা দঃ অক্ষরেখার নিকট এই গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় প্রায় ১৫০০ কিঃ মিঃ, ৬০° উঃ বা দঃ অক্ষরেখার নিকট প্রায় ১০৮০ কিঃ মিঃ। ইহার পরে গোলাকার পৃথিবীর আয়তন খুব বেশী পরিমাণে কমিয়া যায়। ফলে, উভয় মেরুর দিকে পৃথিবীর আবর্তনের গতিবেগ এত কমিয়া যায় যে সুমেরুতে ও কুমেরুতে এই আবর্তনের গতি প্রায় লক্ষ্য করা **যায় না।**

এই অবস্থার প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে **বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত** প্রভৃতি সোজাসুজি উত্তরে বা দক্ষিণে চলিতে পারে না, এক পাশে সরিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ ইহাদের **গতিবিক্ষেপ** (deflection) হয়। বায়ুর সাধারণ স্বভাব বা রীতি অনুসারে ভূপৃষ্ঠে উচ্চচাপের (high pressure) অঞ্চল হইতে বায়ু নিম্নচাপের (low pressure) অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে বায়ুর চাপের পার্থক্য অধিক। আবার বিভিন্ন সময়েও বায়ুর চাপের পার্থক্য হয়। এপ্রকার পার্থক্যের ফলে বায়ুর প্রবাহ সম্বন্ধেও পার্থক্য হয় খুব বেশী। এজন্য বায়ুপ্রবাহ চারি ভাগে বিভক্ত ঃ—নিয়ত-বায়ু, সাময়িক বায়ু, আকস্মিক বা অনিয়মিত বায়ু এবং স্থানীয় বায়ু। ইহাদের বিষয় পাঠ্যসূচী অনুসারে দশম শ্রেণীতে আলোচনা করা হইবে। ইহাদের মধ্যে নিয়ত বায়ুর গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী। পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে এই **বায়ু-প্রবাহের** বিস্তর **গতিবিক্ষেপ** হয়। যেমন, উত্তর গোলার্ধে কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় (প্রায় ৩০° উঃ অঃ) হইতে এক প্রকার নিয়ত বায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের (০° অঃ) দিকে আসে। আর এক প্রকার নিয়ত বায়ু তথা হইতে তাহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ সুমেরু দেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের (প্রায় ৬০° উঃ অঃ) দিকে প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর আবর্তন গতি না থাকিলে এসকল বায়ু সোজাসুজি উত্তরে ও দক্ষিণে বহিয়া যাইত। পৃথিবী গোলাকার বলিয়া ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে আবর্তনের গতি-বেগ সম্পর্কে পার্থক্য একটু আগে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পার্থক্যের ফলে কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত **বায়ু**

ফেরেল সূত্র (Ferrel's law) অনুসারে ডানদিকে বাঁকিয়া থাকে। বস্তুতঃ এখানে বায়ু যেরূপ বেগে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে আসে তাহার তুলনায় পৃথিবীর **আবর্তনের গতিবেগ** অধিক। এজন্য এখানে **বায়ুর** এপ্রকার গতি পরিবর্তন বা **গতিবিক্ষেপ** (deflection) হয় (১১নং চিত্র)। ফলে, এখানে বায়ু উত্তরপূর্বদিক্ হইতে নিরক্ষীয় অঞ্চলে আসে। কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে সুমেরু দেশীয়
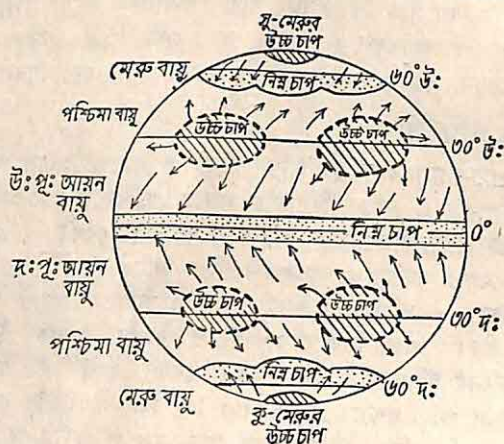
১১নং চিত্র—বায়ুপ্রবাহের গতিবিক্ষেপ।

নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত বায়ুও একই কারণে ফেরেল সূত্র অনুসারে ডান-দিকে বাঁকিয়া যায়। অর্থাৎ তাহা প্রায় পশ্চিমদিক্ হইতে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে মকরীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে যে বায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয় তাহা ফেরেল সূত্র অনুসারে বামদিকে বাঁকিয়া যায়। অর্থাৎ তাহা দক্ষিণপূর্ব দিক্ হইতে আসে। মকরীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে যে বায়ু কুমেরু দেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয় তাহাও ফেরেল সূত্র অনুসারে বামদিকে বাঁকিয়া যায়। অর্থাৎ তাহা প্রায় পশ্চিমদিক্ হইতে আসে। আবার সুমেরুর উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে সুমেরুদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত বায়ু ডানদিকে বাঁকে এবং কুমেরুর উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে কুমেরু দেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত বায়ু বামদিকে বাঁকে। বিভিন্ন সাগর, মহাসাগরের সমুদ্রস্রোতের প্রবাহ সম্বন্ধেও বিভিন্ন প্রকার বায়ুপ্রবাহের এবং পৃথিবীর আবর্তন গতির প্রভাব খুব বেশী।

পরিক্রমণ গতি

পৃথিবীর আবর্তন গতি বশতঃ ইহা অনবরত আপন মেরুরেখার চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘুরে। আর ইহার পরিক্রমণ গতিবশতঃ ইহা (আপন মেরুরেখার চারিদিকে **আবর্তন করিতে করিতে**) আপন কক্ষে * পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অগ্রসর

* পৃথিবী যে কক্ষে বা পথে সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করে এবং প্রতি এক বৎসরে এক বার সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়া আসে সেই কক্ষের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৬·৬ কোটি কিঃ মিঃ। এই কক্ষকে রবিমার্গ (ecliptic) বলা হয়। এই কক্ষে পৃথিবীর পরিক্রমণের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে গড়ে প্রায় ৩০ কিঃ মিঃ। পৃথিবীর কক্ষে জানুয়ারী মাসে সূর্যের অপেক্ষাকৃত নিকট অবস্থায় পৃথিবীর পরিক্রমণের গতিবেগ অধিক এবং জুলাই মাসে সূর্যের অপেক্ষাকৃত দূর অবস্থায় পৃথিবীর পরিক্রমণের গতিবেগ কম।

হয়। এভাবে চলিতে চলিতে প্রায় ৩৬৫¼ দিনে (৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৫ বা ৪৭ সেকেণ্ডে) পৃথিবী **সূর্যের চারিদিকে এক বার সম্পূর্ণরূপে পরিক্রমণ** (revolution) করে। পৃথিবীর পরিক্রমণের সময় অনুসারে **পৃথিবীতে বৎসর গণনা** করা হয়। সেজন্য এই গতিকে পৃথিবীর **বার্ষিক গতিও** (Annual motion) বলা হয়। এই গতির ভিত্তিতে পৃথিবীতে ৩৬৫ দিনে এক বৎসর গণনা করা হয়। আর প্রতি চতুর্থ বৎসরে (যেমন, ১৯৭২, ১৯৭৬, ১৯৮০, ১৯৮৪ খ্রীঃ প্রভৃতি) ৩৬৬ দিনে লিপ ইয়ার (Leap year) গণনা করা হয়।

পরিক্রমণের প্রমাণ

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি না থাকিলে (কেবল আবর্তন গতি থাকিলে) পৃথিবীতে বৎসর গণনা সম্ভবপর হইত না। পৃথিবীর এই গতি না থাকিলে সূর্যের উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন রূপ আপাত গতিও পৃথিবী হইতে দেখা যাইত না। তাহাছাড়া প্রতি বৎসর প্রায় নির্দিষ্ট তারিখে রাত্রিতে আকাশে যে নির্দিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জকে দেখা যায় এই গতি না থাকিলে তাহাও দেখা যাইত না। আর বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে পরিবর্তন হইত না, ঋতু পরিবর্তনও হইত না। আবার পৃথিবীর আবর্তন বা আহ্নিক গতি না থাকিয়া কেবল পরিক্রমণ গতি থাকিলে পৃথিবীর এক অংশে হইত চিরদিবা, অন্য অংশে চিররাত্রি থাকিত। ঐ অবস্থায় ঋতু পরিবর্তন ঘটিলেও তাহা এখনকার মত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ হইত না। কাজেই সূর্যের **আপাত গতি, ঋতুভেদ** প্রভৃতি অবস্থা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে পৃথিবীর **আবর্তন গতি** এবং **পরিক্রমণ গতি** দুই-ই আছে।

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন

পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে প্রতিদিন সূর্যের পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটি আপাত গতি লক্ষ্য করা যায়। তাহার উপর পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে সূর্যের আর একটি আপাত গতি দেখা যায়। এই গতি বশতঃ দেখা যায় সূর্য ছয় মাস একটু একটু করিয়া উত্তরদিকে সরে ও তাহার পর আবার ছয় মাস একটু একটু করিয়া দক্ষিণে সরে। ইহার ফলে প্রতি বৎসর ২১শে জুন সূর্যকে দেখা যায় সব-চেয়ে বেশী উত্তরপূর্ব কোণে এবং সেদিন মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হয় কর্কটক্রান্তির উপর। সেদিনের পর হইতে দেখা যায় সূর্য যেন সেখান হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে সরিতে থাকে। এভাবে সরিতে সরিতে ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্যকে দেখা যায় ঠিক পূর্বদিকে এবং সেদিন মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হয় নিরক্ষরেখার উপর। তারপর দেখা যায় সূর্য যেন আরও দক্ষিণে সরিতে থাকে। এভাবে সরিতে সরিতে ২২শে ডিসেম্বর সূর্যকে দেখা যায় সবচেয়ে বেশী দক্ষিণপূর্ব কোণে। এবং সেদিন মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হয় মকরক্রান্তির উপর। সুতরাং ২১শে জুনের পর হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সূর্যের আপাত গতি উত্তর হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে। অর্থাৎ ইহা দক্ষিণায়ন। ২২শে ডিসেম্বর হইতে দেখা যায় সূর্য যেন ক্রমশঃ উত্তরদিকে সরিতে থাকে। এভাবে সরিতে সরিতে ২১শে মার্চ সূর্যকে দেখা যায় ঠিক পূর্বদিকে (২৩শে সেপ্টেম্বরের মত) এবং সেদিন মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হয় নিরক্ষরেখার উপর। ইহার পর দেখা যায় সূর্য যেন আরও উত্তর-দিকে সরিতে থাকে। এভাবে সরিতে সরিতে ২১শে জুন সূর্যকে দেখা যায় সব-

চেয়ে বেশী উত্তরপূর্বদিকে। কাজেই ২২শে ডিসেম্বরের পর হইতে ২১শে জুন পর্যন্ত সূর্যের আপাত গতি দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ উত্তরদিকে। অর্থাৎ ইহা উত্তরায়ণ।

সূর্যের আপাত গতির প্রভাব

পৃথিবীর উভয় গতির (সূর্যের আপাত গতির) ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে একই সময়ে, আবার একই স্থানে বিভিন্ন সময়ে **দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য, উষ্ণতা** প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তর পরিবর্তন ঘটে। দিবামানের পরিবর্তন সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ (১৩ ও ১৪নং চিত্র) নিম্নে দেওয়া গেল।

স্থান	ডিগ্রি অক্ষাংশ	দীর্ঘতম দিবামান (গ্রীষ্ম কাল)	ক্ষুদ্রতম দিবামান (শীত কাল)
কিটো	$0°$	১২ঘ	১২ঘ
কারাকাস	$১০°$ উঃ	১২ঘ ৩০ মি	১১ঘ ৩০ মি
কলিকাতা	২২½° উঃ	১৩ঘ ৩০ মি	১০ঘ ৩০ মি
কায়রো বা এল কাহিরা	৩০° উঃ	১৩ঘ ৫৬ মি	১০ঘ ৪ মি
মাদ্রিদ	৪০° উঃ	১৪ঘ ৫১ মি	৯ঘ ৯ মি
লণ্ডন	৫১½° উঃ	১৬ঘ ৩০ মি	৭ঘ ৩০ মি
অসলো	৬০° উঃ	১৮ঘ ৩০ মি	৫ঘ ৩০ মি
হ্যামারফেস্ট	৭০° উঃ	৬২ দিন	—
	৮০° উঃ	১৩৪ দিন	—
	৯০° উঃ	১৮৬ দিন (৯০° দঃ ১৭৯ দিন)	

আলোকমণ্ডল ও তাপমণ্ডল

পৃথিবীর আবর্তন ও পরিক্রমণ গতির ফলে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ও ঐ সঙ্গে আলোক ও উত্তাপ সম্পর্কে বিস্তর পার্থক্য ঘটে। তদনুসারে ভূপৃষ্ঠ পাঁচটি আলোকমণ্ডলে (Light zones) বা তাপমণ্ডলে (Heat zones) বিভক্ত ঃ—

(১) ভূপৃষ্ঠের মধ্যভাগে নিরক্ষরেখা হইতে উত্তরে কর্কটক্রান্তি ও দক্ষিণে মকর-ক্রান্তির মাঝখানে দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে পার্থক্য কম। তবে এই অঞ্চলে শীত কালের তুলনায় গ্রীষ্ম কালের দিবামান প্রায় ৩ ঘন্টা বড়। এখানে আলোক ও উত্তাপের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী, অর্থাৎ ইহা **উষ্ণমণ্ডল** বা অঞ্চল (Torrid zone)। (২) উষ্ণমণ্ডলের উত্তরে কর্কটক্রান্তি হইতে সুমেরুবৃত্ত পর্যন্ত এবং দক্ষিণে (৩) মকরক্রান্তি হইতে কুমেরুবৃত্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এই দুই অঞ্চলে ক্রান্তিবৃত্ত হইতে ক্রমশঃ দূরের দিকে অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে সুমেরুর দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরুর দিকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গ্রীষ্ম কালে দিবামানের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ ঘন্টা পর্যন্ত বড় হয়। আর এই দুই অঞ্চলের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে শীত কালের দিবামানের তুলনায় গ্রীষ্মকালের দিবামান কোথাও কোথাও ১২-১৩ ঘন্টা পর্যন্ত বেশী থাকে। ফলে, শীতকালে এখানে দিবামান এত ছোট থাকে যে সন্ধ্যার পরও অফিস ও কার-খানাতে কাজ করিতে হয়। আর গ্রীষ্ম কালে তাহার বিপরীত অবস্থা, অর্থাৎ খুব দেরীতে সন্ধ্যা হয় এবং তাড়াতাড়ি রাত্রি ভোর হয়। তবে এসকল স্থান অতিরিক্ত উষ্ণ বা তীব্র শীতল নয়। অর্থাৎ এই দুইটি **উত্তর ও দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল**

(Temperate zones)। (৪) ভূপৃষ্ঠের উত্তর ভাগে সুমেরুবৃত্ত হইতে সুমেরুর মাঝখানে এবং দক্ষিণ ভাগে (৫) কুমেরুবৃত্ত হইতে কুমেরুর মাঝখানে দুই হইতে ছয় মাস একটানা রাত্রি, আবার দুই হইতে ছয় মাস একটানা দিবামান থাকে। এজন্যই নরওয়ের হ্যামারফেস্ট (৭০° উঃ অঃ) বন্দর ও আশপাশে ঘড়ি হিসাবে গভীর রাত্রি হওয়ার মত সময়েও আকাশে সূর্য দেখা যায়। একারণে ঐ সকল স্থানকে **'নিশীথ সূর্যের দেশ'** (Land of Midnight sun) বলে। তাহাছাড়া সুমেরুতে যে ছয় মাস আঁধার থাকে তখন মাঝে মাঝে উচ্চ আকাশে রামধনুর মত অস্পষ্ট আলো দেখা যায়। তাহাকে বলে **সুমেরুপ্রভা** (Aurora Borealis)। কুমেরু অঞ্চলেও এরূপ আঁধার থাকার সময়ে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট আলো দেখা যায়। তাহাকে বলে **কুমেরুপ্রভা** (Aurora Australis)। এই দুই মণ্ডল তীব্র শীতল। ইহাদের মধ্যে উত্তর-দিকেরটি **উত্তর হিমমণ্ডল** ও দক্ষিণদিকেরটি **দক্ষিণ হিমমণ্ডল** (Frigid zones)।

দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য ও উষ্ণতার পরিবর্তন

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে **২১শে মার্চ** এবং তাহার ছয় মাস পরে ২৩শে সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি **নিরক্ষরেখার উপর লম্ব ভাবে** পতিত হয় (১২নং চিত্র)। এই দুই দিন সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত সূর্যের আলো পাওয়া যায়। তবে নিরক্ষরেখা হইতে ক্রমশঃ অধিক দূরে, উত্তরে বা দক্ষিণে দুই দিকেই আলোকরশ্মি ক্রমশঃ অধিক হেলান ভাবে পতিত হয়। কাজেই নিরক্ষরেখা হইতে ক্রমশঃ অধিক দূরের দিকে উত্তাপের পরিমাণও ক্রমশঃ কম হয়। তাহাছাড়া এই দুই দিন **আলোক-বৃত্ত বা ছায়াবৃত্ত** * (Circle of shadow) সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এবং তাহা নিরক্ষরেখা ও অপর সকল সমাক্ষরেখাকে সমদ্বিখণ্ডিত (bisect)
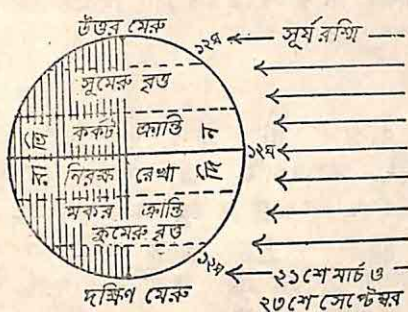
১২নং চিত্র—২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর দিন-রাত্রির অবস্থা।
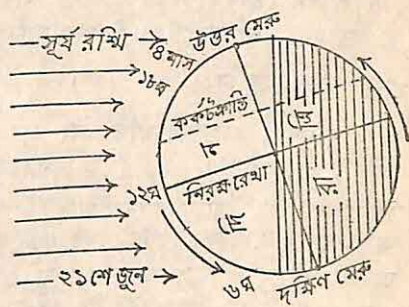
১৩নং চিত্র—২১শে জুন উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে দিবারাত্রির অবস্থা।

করে। কাজেই এই দুই দিন পৃথিবীর সর্বত্র **দিবারাত্রি সমান** (প্রত্যেকটি ১২ ঘন্টা)। উত্তর গোলার্ধের পক্ষে ২১শে মার্চ **মহাবিষুব** (Spring or vernal equinox †) এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর **জলবিষুব** (Autumnal quinox)।

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতিবশতঃ তাহার আপন কক্ষে ক্রমশঃ স্থান পরিবর্তন হয়। তাহার ফলে, **২১শে জুন** মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি কর্কটক্রান্তির উপর লম্ব ভাবে পতিত হয়

* পৃথিবীর আলোকিত ও অন্ধকার অংশ যে সীমারেখাতে মিলিত হয় তাহাকে বলা হয় আলোকবৃত্ত ও ছায়াবৃত্ত।

† Equinox=Equal night (nox=night), অর্থাৎ দিবারাত্রি সমান।

হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে অক্ষাংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা ক্রমশঃ কমে। উত্তর **গোলার্ধের** পক্ষে তখন **বসন্ত কাল,** দক্ষিণ গোলার্ধে তখন **শরৎকাল।**

ইহার পর হইতে নিরক্ষরেখার ক্রমশঃ উত্তরে মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হইতে থাকে। কাজেই উত্তর গোলার্ধে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য এবং উষ্ণতা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এজন্য তথায় মে মাস হইতে গ্রীষ্ম ঋতু আরম্ভ হয়। উত্তরায়ণের শেষ দিনে বা উত্তর অয়নান্ত দিবসে (Northern summer solstice) ২১শে জুন মধ্যাহ্নে কর্কটক্রান্তির উপর সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হয়। সেদিন **উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্ম কালের মধ্য অবস্থা।** সেদিন উত্তর গোলার্ধে দিবামান দীর্ঘতম এবং উষ্ণতাও স্বভাবতঃ অত্যন্ত অধিক। **দক্ষিণ গোলার্ধে** তখন (মে-জুন) বিপরীত অবস্থা, অর্থাৎ সেখানে তখন **শীত কালের** মধ্য অবস্থা (১৫নং চিত্র)।

১৫নং চিত্র—পৃথিবীর উভয় গতির ফলে দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্য ও ঋতু পরিবর্তন।

তারপর সূর্যের আপাত গতি হিসাবে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর গোলার্ধে দিবা ভাগের দৈর্ঘ্য ও উষ্ণতা ক্রমশঃ কমে ও দক্ষিণ গোলার্ধে দুইই ক্রমশঃ বাড়ে। এভাবে চলিতে চলিতে দক্ষিণায়নের মধ্য ভাগে ২৩শে সেপ্টেম্বর বা জলবিষুব দিবসে (Autunmal equinox) আবার ২১শে মার্চের মত অবস্থা। সেদিন মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার উপর লম্ব ভাবে পতিত হয়। সেদিন উত্তর বা দক্ষিণ কোন গোলার্ধেই উষ্ণতা বা শীত বেশী নয়। **উত্তর গোলার্ধের** পক্ষে তখন **শরৎ কাল, দক্ষিণ গোলার্ধে** তখন **বসন্ত কাল।**

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি বশতঃ তাহার কক্ষপথে এভাবে স্থান পরিবর্তন চলিতে থাকে। এভাবে চলিতে চলিতে দক্ষিণায়নের শেষ দিনে বা দক্ষিণ অয়নান্ত দিবসে (Northern winter solstice) ২২শে **ডিসেম্বর** মধ্যাহ্নে মকরক্রান্তির উপর সূর্য-রশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হয়। সেদিন **দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্ম কালের মধ্য ভাগ,** আর **উত্তর গোলার্ধে শীত কালের মধ্য ভাগ।** ইহার পর উত্তরায়ণের আরম্ভ। সঙ্গে সঙ্গে

(১৩নং চিত্র)। তখন উত্তর গোলার্ধে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ও উষ্ণতার পরিমাণ দক্ষিণ গোলার্ধে তখনকার দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ও উষ্ণতার তুলনায় বেশী। এমন কি উত্তর গোলার্ধেও বৎসরের অন্য সকল সময়ের তুলনায় অধিক। তাহাছাড়া কর্কটক্রান্তির উত্তরে কোথাও সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হয় না। তথা হইতেই ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হইতে থাকে। এজন্য এই দিনকে বলে **উত্তর অয়নান্ত দিবস** (Northern summer solstice)।

ইহার পর **২৩শে সেপ্টেম্বর** মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি আবার **নিরক্ষরেখার উপর লম্ব ভাবে** পতিত হয় এবং সে সময়ের অবস্থা হয় **২১শে মার্চের** মত। ক্রমশঃ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থান পরিবর্তনের ফলে ২২শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হয় মকরক্রান্তির উপর (১৪নং চিত্র)। তখন উত্তর গোলার্ধে শীত কাল, আর দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্ম কাল। দক্ষিণ গোলার্ধে তখন দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ও উষ্ণতার পরিমাণ উত্তর গোলার্ধে তখনকার দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ও উষ্ণতার চেয়ে বেশী। এমন কি দক্ষিণ গোলার্ধেও বৎসরের অন্য সকল সময়ের তুলনায় অধিক। তাহাছাড়া মকরক্রান্তির দক্ষিণে কোথাও সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হয় না। তথা হইতেই ক্রমশঃ উত্তরদিকে সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হইতে থাকে। এজন্য ঐ দিনকে বলে **দক্ষিণ অয়নান্ত দিবস** (Northern winter solstice)।

পৃথিবীর আবর্তন ও পরিক্রমণ গতির উপরিলিখিত প্রভাব ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থানে দেখা যায়। তবে এসম্পর্কে দুইটি অংশে **ব্যতিক্রম** ঘটে এবং তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন, **নিরক্ষরেখার** উপর সমস্ত বৎসর দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য সমান (১২ ঘন্টা)। এখানে উষ্ণতার কোন পরিবর্তন ঘটে না। তথায় সারা বৎসর দিবাভাগে উষ্ণতা অধিক, রাত্রিতে মৃদু শীত। অপর দিকে **সুমেরু** ও **কুমেরুতে** ছয় মাস ক্রমাগত দিন ও ছয় মাস ক্রমাগত রাত্রি। তথায় সারা বৎসর তীব্র শীত।

ঋতু পরিবর্তন

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি এবং আবর্তন গতি, দুই গতিই আছে। তারপর ইহার আকৃতি প্রায়-গোল। আর ইহার মেরুরেখা ইহার কক্ষের সহিত ৬৬½° কৌণিক ভাবে অবস্থিত। এসকল বিষয়ের সমষ্টিগত ফল হিসাবে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থানে দিবামানের দৈর্ঘ্য ও সূর্যরশ্মির পরিমাণ সম্বন্ধে প্রচুর পার্থক্য হয়। তাহার প্রভাবে এসকল স্থানে দিনের ও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উষ্ণতা ও আলোর পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তর পার্থক্য ঘটে। পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে এসকল পার্থক্য ও **পরিবর্তন** বৎসরের পর বৎসর প্রায় নির্দিষ্ট নিয়মে ঘুরিয়া আসে, অথবা যেন **চক্রের মতই পরিবর্তন** করে। ইহাই **ঋতু ভেদ বা ঋতু পরিবর্তন** (Change of seasons)। নিরক্ষরেখা ও উভয় মেরু ইহার ব্যতিক্রম। এই দুই অংশে সারা বৎসরই প্রায় এক অবস্থা, বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উষ্ণতা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না।

সূর্যের আপাত গতি হিসাবে উত্তরায়ণের মধ্য ভাগে **২১শে মার্চ** মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার উপর লম্ব ভাবে পতিত হয়। ফলে, ঐ দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিবারাত্রি সমান। এই দিনকে উত্তর গোলার্ধে **মহাবিষুব** (Spring or vernal equinox) বলে। এই দিন ও তাহার আগে পরে কিছু দিন (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল) উত্তর বা দক্ষিণ কোন গোলার্ধেই উষ্ণতা বা শীত বেশী নয়। অবশ্য নিরক্ষরেখা

আবার সূর্যরশ্মি ক্রমশঃ অধিক উত্তরদিকে লম্ব ভাবে পতিত হইতে থাকে। এভাবেই পৃথিবীতে বৎসরের পর বৎসর **ঋতু পরিবর্তন** চলিতেছে।

পৃথিবীর সর্বত্র ঋতু পরিবর্তনের অবস্থা এক রকম নয়। যে কোন স্থানে প্রত্যেক বৎসরও ঠিক এক রকম নয়। বিভিন্ন স্থানে কতক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আছে। এবিষয়ে বিভিন্ন স্থানের অবস্থিতি, বিশেষতঃ অক্ষাংশ, ভূপ্রকৃতি অর্থাৎ পাহাড়, পর্বতের দৈর্ঘ্য, অবস্থিতি, উচ্চতা প্রভৃতি, সমুদ্র হইতে দূরত্ব, বায়ু-প্রবাহের দিক্ ইত্যাদির গুরুত্ব খুব বেশী। যেমন, আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থানসহ **দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার** বিস্তীর্ণ অংশে **গ্রীষ্ম ঋতুর** পরে আসে **বর্ষা** ঋতু। তাহার পরে শরৎ কাল। অপর দিকে **ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকার পশ্চিম অংশে শীত কালেই** অধিক **বৃষ্টি** হয়। অর্থাৎ তথায় একই সময়ে শীত ও বর্ষা ঋতু। বিভিন্ন স্থানের মানুষের জীবনে এরূপ বিভিন্ন সময়ে বর্ষা কালের আগমণের প্রভাব খুব বেশী। অন্য দিকে আফ্রিকার বিস্তীর্ণ উত্তর অংশ হইতে পূর্বদিকে আমাদের দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ পর্যন্ত সাহারা, আরব ও থর মরু এবং ইরানের মরুপ্রায় অঞ্চল। এখানে **শুষ্ক** বা বৃষ্টিহীন **দীর্ঘ গ্রীষ্ম ঋতুর প্রাধান্য ও গুরুত্ব অসামান্য।** সুতরাং এরূপ স্থানের মানুষের জীবন ধারা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের জীবন ধারা হইতে পৃথক্। তারপর **চিরতুষারাবৃত সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলে তীব্র শীত ঋতুর** গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। সেরূপ পৃথিবীর মধ্য ভাগে অবস্থিত **নিরক্ষীয় অঞ্চলে উষ্ণ আর্দ্র** ঋতুর গুরুত্ব ও প্রভাবের কোন তুলনা নাই। ঐ সকল স্থানের মানুষের জীবন ধারার সহিতও অন্য কাহারও জীবন ধারার তুলনা হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়

ভূপৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থিতি নির্ণয় : অক্ষাংশ ও দেশান্তর এবং তাহাদের সম্পর্ক

(Determination of location of a place on the surface of the earth ; Latitude and longitude and their relationship)

অবস্থিতি নির্ণয়ের পদ্ধতি

আমরা সাধারণতঃ কোন পরিচিত **জিনিসের সাহায্যে** অপর কোন জিনিস বা স্থানের অবস্থিতি নির্দেশ করি। এই উদ্দেশ্যে আমরা সচরাচর দিক্ (direction), রৈখিক দূরত্ব (linear distance), কৌণিক দূরত্ব (angular distance) প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করি। যেমন, আমরা বলি, অমুক শহর বা গ্রামের অমুক স্কুল হইতে উত্তরদিকে অত দূর গিয়া তারপর পশ্চিমদিকে অত দূর গেলে অমুক স্থান। অথবা কোন বাড়ির উত্তরের ভিটির ঘরের দক্ষিণপূর্ব কোণে অমুক জিনিস। ছোট জায়গার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভবপর, কিন্তু বিস্তীর্ণ স্থানের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। তবে ছোট জায়গার ক্ষেত্রেও আমরা প্রায় অজ্ঞাতসারে গণিত ও জ্যামিতির সাহায্য গ্রহণ করি।

আমাদের পৃথিবীর আয়তন ছোট নয় এবং ভূপৃষ্ঠ চ্যাপ্টা (flat) বা সমতল নয়। বরং পৃথিবীর আকৃতি প্রায়-গোল এবং আয়তন অতিশয় বৃহৎ। তাহাছাড়া পৃথি-

বীর উপরিভাগের কোন স্থানের অবস্থিতি নির্ণয় করা সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে গণনা আরম্ভ করার (starting point) স্বাভাবিক বিধি ব্যবস্থাও নাই। এজন্য ভূপৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থিতি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে গণিত ও জ্যামিতির অধিকতর সাহায্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে **দুইটি প্রধান** ও **স্থির বা নির্দিষ্ট রেখার** (Lines of Reference) সাহায্য আবশ্যক। এগুলি পরস্পর **সমকোণী** ভাবে অবস্থিত। কেবল মাত্র এই দুইটি রেখার সাহায্যেই সব জায়গার অবস্থিতি ঠিক করা সম্ভবপর নয়। এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সমজাতীয় বা অনুরূপ (similar) অসংখ্য রেখার সাহায্য অত্যাবশ্যক। নির্দিষ্ট রেখা দুইটির মধ্যে একটি **নিরক্ষরেখা,** অপরটি **মূল মধ্যরেখা** বা **প্রধান দ্রাঘিমারেখা**। তবে দুইটিই কাল্পনিক রেখা।

নিরক্ষরেখা

প্রায়-গোলাকার পৃথিবীর উত্তর সীমার **সুমেরু** ও দক্ষিণ সীমার **কুমেরু** দুইটি **স্থির বা নির্দিষ্ট বিন্দু**। ইহারা নিরক্ষরেখার মত কাল্পনিক নয়। এই দুই নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে **সমান দূরে** পৃথিবীর ঠিক **মধ্য অংশের** উপর দিয়া একটি **সরলরেখা** পৃথিবীকে **পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন** করিয়া আছে, এরূপ কল্পনা করা হয়। দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দুর সাহায্যে ইহার অবস্থান কল্পনা করা হয়। এজন্য কাল্পনিক হওয়া সত্ত্বেও ইহা একটি **স্থির** বা **নির্দিষ্ট** রেখা। ভূপৃষ্ঠের ঠিক মধ্য ভাগের উপর দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এই রেখার যে-কোন বিন্দু বা স্থানের অক্ষাংশ 0°। সেজন্য এই রেখাকে বলা হয় **নিরক্ষরেখা** (Equator)। আবার, ইহা একটি **বৃত্ত**। কারণ, ইহা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাই ইহাকে **নিরক্ষবৃত্তও** বলা হয়। এই রেখার সাহায্যে বিষুব (Equinox) নির্ণয় করা হয়। এজন্য ইহাকে **বিষুবরেখাও** বলা হয়।

১৬নং চিত্র—ভূপৃষ্ঠে কাল্পনিক অক্ষরেখার (অক্ষবৃত্তের) অবস্থিতি।
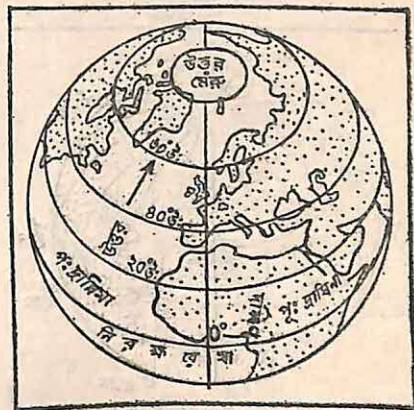
ভূপৃষ্ঠের মধ্য ভাগের উপর দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত **নিরক্ষরেখার সাহায্যে** ভূপৃষ্ঠের যে কোন স্থান এই রেখা হইতে কতটুকু উত্তরে বা দক্ষিণে অবস্থিত তাহা জানা যায়। এই উদ্দেশ্যে ভূপৃষ্ঠের যে কোন স্থানের এই রেখা হইতে **উত্তরে** ও **দক্ষিণে কৌণিক দূরত্ব** বা **অক্ষাংশ** স্থির করা হয়। তবে পৃথিবীর কেন্দ্রে আছে ৩৬০°। এই কৌণিক মাপ ও পৃথিবীর আয়তন এত বৃহৎ যে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব ঠিক ভাবে স্থির করিবার জন্য **নিরক্ষরেখার** অনুরূপ বা ইহার সমান্তরাল (parallel) অসংখ্য রেখা কল্পনা করা হয় (১৬নং চিত্র)। ইহাদিগকে বলা হয় **অক্ষরেখা** বা **সমাক্ষরেখা** (Parallels of latitude)।

এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে নিরক্ষরেখা ও ইহার অনুরূপ অন্যান্য রেখার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠস্থ কোন স্থানের নিরক্ষরেখা হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে কৌণিক দূরত্ব মাত্র জানা যায়। কেবল মাত্র ইহাদের সাহায্যে কোন স্থানের অবস্থিতি নির্ভুল ভাবে স্থির করা সম্ভব নয়। এজন্য ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রেখার সাহায্যও একান্ত আবশ্যক।

প্রধান দ্রাঘিমারেখা

সুমেরু হইতে লণ্ডনের পাশের **গ্রীনিচ মানমন্দিরের** (Observatory) মধ্য দিয়া কুমেরু পর্যন্ত **উত্তর-দক্ষিণে** সোজাসুজি **বিস্তৃত** একটি রেখা কল্পনা করা হয়। ইহা মধ্য ভাগে নিরক্ষরেখার উপর সমকোণী বা **লম্ব ভাবে** অবস্থিত। এই রেখাকে বলা হয় **প্রধান দ্রাঘিমারেখা বা মূল মধ্যরেখা** (Prime meridian)। ভূপৃষ্ঠের কয়েকটি নির্দিষ্ট বিন্দুর সহিত ইহার সম্পর্ক আছে। যেমন, সুমেরু, কুমেরু, গ্রীনিচ মানমন্দিরের মধ্য ভাগ নির্দেশক বিন্দু। তাহাছাড়া আছে বিষুবরেখার একটি নির্দিষ্ট বিন্দু, যে বিন্দুতে ইহা নিরক্ষরেখার উপর লম্ব ভাবে অবস্থিত। কাজেই কাল্পনিক হওয়া সত্ত্বেও ইহা একটি **স্থির** বা **নির্দিষ্ট** রেখা। এই রেখার উপরিস্থিত যে-কোন বিন্দুর দেশান্তর 0°। এই রেখার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে ইহার পূর্বদিকে বা পশ্চিমদিকে অবস্থিত যে-কোন স্থানের এই রেখা হইতে **পূর্ব** বা **পশ্চিমে কৌণিক দূরত্ব বা দেশান্তর** নির্ণয় করা হয়। সেজন্য ইহার নাম **প্রধান দ্রাঘিমারেখা বা মূল মধ্যরেখা**। তবে পৃথিবীর আয়তন অতিশয় বৃহৎ বলিয়া এক্ষেত্রেও **মূল মধ্যরেখার** অনুরূপ অসংখ্য রেখা কল্পনা করা হয়। ইহাদের প্রত্যেকটি ইহার মত সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এবং প্রত্যেকটিই মধ্য ভাগে নিরক্ষরেখার উপর বিভিন্ন বিন্দুতে লম্ব ভাবে অবস্থিত (১৭নং চিত্র)। ইহাদিগকে বলা হয় **মধ্যরেখা** বা **দ্রাঘিমারেখা** (Meridians of longitude)। ভূপৃষ্ঠের যে-কোন স্থানের **সঠিক অবস্থান** স্থির করা হয় যে-কোন একটি অক্ষরেখা ও যে-কোন একটি **মধ্যরেখার মিলনস্থল** বা ছেদবিন্দুর সাহায্যে। ইহাই গ্রিড পদ্ধতি নামে পরিচিত।

১৭নং চিত্র—ভূপৃষ্ঠে কাল্পনিক অক্ষরেখার ও দেশান্তর রেখার অবস্থিতি।

অক্ষাংশ ও অক্ষরেখা

প্রায়-গোলাকার ও অত্যন্ত বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট পৃথিবীর উপরিভাগের যে-কোন স্থানের অবস্থিতি নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমেই ঐ স্থানকে ভূগোলকের উপর **একটি বিন্দু দ্বারা নির্দেশ** করা হয় (১৮নং চিত্র)। তারপর প্রথমে

নিরক্ষরেখা হইতে ঐ স্থানের উত্তর বা দক্ষিণদিকে কৌণিক দূরত্ব বা অক্ষাংশ * নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা হয়। এজন্য ভূগোলকের উপরের ঐ বিন্দুকে একটি কাল্পনিক সরল রেখার সাহায্যে ভূগোলকের কেন্দ্রবিন্দুর সহিত যুক্ত করা হয়। (পৃথিবীর অভ্যন্তরে এরূপ রেখা আঁকা সম্ভব নয়। এজন্যই ভূগোলকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।) তারপর ভূগোলকের উপরিভাগের ঐ নির্দিষ্ট বিন্দুর উপর দিয়া সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত সোজাসুজি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি রেখা কল্পনা করা হয়। ইহা একটি মধ্য রেখা। ইহা যেখানে নিরক্ষরেখার উপর লম্ব ভাবে অবস্থিত, সেই বিন্দুকে লক্ষ্য করা হয়। তারপর একটি কাল্পনিক সরল রেখার সাহায্যে ঐ বিন্দুকে ভূগোলকের কেন্দ্রবিন্দুর সহিত যুক্ত করা হয়। ভূগোলকের কেন্দ্রবিন্দুর সহিত যুক্ত এই দুই কাল্পনিক সরল রেখা প্রকৃত পক্ষে ভূগোলকের দুই ব্যাসার্ধ (radius)। ইহাদের সাহায্যে ভূগোলকের কেন্দ্রে একটি কাল্পনিক কোণ উৎপন্ন হয়। তাহা দ্বারাই ভূপৃষ্ঠস্থ নির্দিষ্ট স্থানটির নিরক্ষরেখা হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে কৌণিক দূরত্ব বা অক্ষাংশ (latitude) স্থির করা হয় (১৯নং চিত্র)।

চাঁদার (Protractor) সাহায্যে জানা যায়, যে-কোন বৃত্তের কেন্দ্রের মত ভূগোলকের কেন্দ্রেও কোণের পরিমাণ ৩৬০°। অতএব, পৃথিবীর কেন্দ্রেও কোণের পরিমাণ ৩৬০°। এরূপ প্রত্যেক ডিগ্রি কোণকে নিরক্ষরেখা (০° অক্ষাংশ) হইতে উত্তরে ১° উত্তর অক্ষাংশ (1°N lat), ২° উত্তর অক্ষাংশ (2°N lat) প্রভৃতি হিসাবে

১৮নং চিত্র—ভূগোলকে কলিকাতার অবস্থান নির্দেশ।

৯০° উত্তর অক্ষাংশ (90°N lat) বা সুমেরু পর্যন্ত গণনা করা হয়। আর নিরক্ষরেখা হইতে দক্ষিণে ১° দক্ষিণ অক্ষাংশ (1°S lat), ২° দক্ষিণ অক্ষাংশ (2°S lat), ইত্যাদি হিসাবে ৯০° দক্ষিণ অক্ষাংশ (90°S lat) বা কুমেরু পর্যন্ত গণনা করা হয়। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশের পরিমাণ সঠিক ভাবে গণনা করা ও এবিষয়ে সূক্ষ্ম হিসাবের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ডিগ্রিকে ৬০ মিনিটে (৬০′) ভাগ করা হয়। আবার

* সেক্সট্যান্ট (Sextant) নামক যন্ত্রের সাহায্যে উত্তর গোলার্ধে ভূপৃষ্ঠের যে-কোন স্থান হইতে রাত্রিতে ধ্রুবনক্ষত্রের (Pole star) দিকে তাকাইলে তাহাকে দেখা যায়। যেখান হইতে তাহাকে ঐ যন্ত্রে যে কোণে দেখা যায় ঐ কোণই ঐ স্থানের অক্ষাংশ। যেমন, কলিকাতা হইতে ধ্রুবতারাকে প্রায় ২২½° উত্তরদিকে দেখা যায়। অথবা কলিকাতা হইতে ধ্রুবতারার উন্নতি (altitude) প্রায় ২২½° উত্তর। এজন্য কলিকাতার অক্ষাংশ ২২½° উত্তর। আর সুমেরু হইতে ধ্রুবতারাকে দেখা যায় ঠিক মাথার উপরে। অর্থাৎ তথা হইতে ধ্রুবতারার উন্নতি ৯০° উঃ। কাজেই সুমেরুর অক্ষাংশ ৯০° উত্তর।

ক্রান্তি হইতে কুমেরুবৃত্তের মাঝখানের স্থানসমূহ **দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে** (South Temperate zone) অবস্থিত। আর সুমেরু বৃত্ত হইতে সুমেরু বিন্দু পর্যন্ত অংশের স্থানসমূহ তীব্র শীতল। এগুলি **উত্তর হিমমণ্ডলের** (North Frigid zone) অন্তর্গত। কুমেরুবৃত্ত হইতে কুমেরু বিন্দু পর্যন্ত অংশের স্থানসমূহও তীব্র শীতল। এগুলি **দক্ষিণ হিমমণ্ডলে** (South Frigid zone) অবস্থিত।

২০নং চিত্র—অক্ষাংশ ও অক্ষরেখা গণনা।

অক্ষাংশ ও অক্ষরেখার সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যে স্থানের **অক্ষাংশ** বা নিরক্ষরেখা হইতে কৌণিক **দূরত্ব যত কম**, তাহার উপর দিয়া বিস্তৃত **অক্ষরেখার দৈর্ঘ্য তত বেশী**। এজন্য **নিরক্ষরেখার** (0° অক্ষাংশ) **দৈর্ঘ্য অক্ষরেখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী**। তথা হইতে ক্রমশঃ উত্তরে ও দক্ষিণে অক্ষাংশ ক্রমশঃ বেশী এবং অক্ষরেখার দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ কম। সর্বশেষ **সুমেরু** ও **কুমেরুর** অক্ষাংশ ৯০° বা সবচেয়ে বেশী। এই দুইটিই **বিন্দু মাত্র**। তথায় কোন অক্ষরেখাই আঁকা সম্ভব নয়।

দেশান্তর ও মধ্যরেখা

ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানের অবস্থিতি শুধু সেখানকার অক্ষাংশ বা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত অক্ষরেখার সাহায্যে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এজন্য ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া **উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত** এবং নিরক্ষরেখার উপর লম্ব ভাবে অবস্থিত **নির্দিষ্ট রেখার সাহায্যও** একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে মূল মধ্যরেখা ও ইহার সমজাতীয় বা অনুরূপ অন্যান্য মধ্যরেখার সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

ভূপৃষ্ঠের কোন স্থান মূল মধ্যরেখা বা প্রধান দ্রাঘিমারেখা হইতে কতটুকু পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থিত তাহা জানিবার জন্য ঐ স্থানের মূল মধ্যরেখা হইতে পূর্ব ও পশ্চিমদিকে কৌণিক দূরত্ব বা দেশান্তর স্থির করা হয়। যে স্থানের বা বিন্দুর অবস্থিতি নির্ণয় করা হইবে তাহা নিরক্ষরেখার উপর অবস্থিত হইলে ঐ বিন্দুকে একটি কাল্পনিক সরলরেখার সাহায্যে ভূগোলকের * কেন্দ্রবিন্দুর সহিত যুক্ত করা হয়। অপর একটি কাল্পনিক সরলরেখার সাহায্যে যে বিন্দুতে নিরক্ষরেখা ও প্রধান দ্রাঘিমারেখা পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে সেই ছেদবিন্দুকে ভূগোলকের

* পৃথিবীর কেন্দ্রে কোন কোণ আঁকা সম্ভবপর নয়। এজন্য ভূগোলকের সাহায্য নেওয়া হয়।

প্রত্যেক মিনিটকে ৬০ সেকেণ্ডে (৬০″) বিভক্ত করা হয়। এজন্য কলিকাতার অক্ষাংশ ২২°৩৪′ উত্তর অক্ষাংশ। তবে সাধারণভাবে বলা হয় প্রায় ২২½° উঃ অঃ।

অক্ষাংশ গণনা সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নিরক্ষরেখার উপর অবস্থিত যে-কোন স্থানের বা বিন্দুর অক্ষাংশ 0°। সেরূপ নিরক্ষরেখার উত্তরে বা দক্ষিণে ঐ রেখার সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত বা অঙ্কিত যে-কোন একটি কাল্পনিক অক্ষরেখা বা সমাক্ষরেখার উপরিস্থিত সকল স্থানের বা সকল বিন্দুরই অক্ষাংশ সমান। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি অক্ষরেখা তাহার উপরিস্থিত যে-কোন বিন্দুর অক্ষাংশ অনুসারে ১°, ২°, ৩° প্রভৃতি উত্তর অক্ষরেখা রূপে অথবা ১°, ২°, ৩° প্রভৃতি দক্ষিণ অক্ষরেখা হিসাবে পরিচিত (২০নং চিত্র)। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি অক্ষরেখা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত। যেমন, উত্তর গোলার্ধে ২৩½° উত্তর অক্ষরেখাকে বলা হয় **কর্কটক্রান্তি** (Tropic of Cancer), আর ৬৬½° উত্তর অক্ষরেখাকে বলা হয় **সুমেরু বৃত্ত** (Arctic circle)। দক্ষিণ গোলার্ধের ২৩½° দক্ষিণ অক্ষরেখাকে বলা হয় **মকরক্রান্তি** (Tropic of Capricorn), আর ৬৬½° দক্ষিণ অক্ষরেখাকে বলা হয় **কুমেরু বৃত্ত** (Antarctic circle)।

১৯নং চিত্র—অক্ষাংশ নির্ণয়।

প্রত্যেকটি অক্ষরেখাই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে। কাজেই ইহাদের প্রত্যেকটিই একটি বৃত্ত। তন্মধ্যে **নিরক্ষ বৃত্তটির কেন্দ্র** পৃথিবীরই কেন্দ্র। সেজন্য ইহাকে বলা হয় **মহাবৃত্ত** (Great Circle)। অক্ষরেখাগুলির মধ্যে কেবল মাত্র ইহাই মহাবৃত্ত। নিরক্ষরেখা (0° অঃ) হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে ৩০-৩৫° অক্ষাংশসমূহকে বলা হয় **নিম্ন অক্ষাংশ** (Low latitude), ৩০-৩৫° হইতে ৫০-৫৫° অক্ষাংশসমূহকে বলা হয় **মধ্য অক্ষাংশ** (Mid latitude), আর ৫০-৫৫° হইতে ৯০° (সুমেরু বা কুমেরু) পর্যন্ত অক্ষাংশসমূহকে বলা হয় **উচ্চ অক্ষাংশ** (High latitude)। এক ডিগ্রি ব্যবধান দুই অক্ষরেখার মধ্যে রৈখিক দূরত্ব (Linear distance) নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় ১০৯.৯ কিঃ মিঃ, কিন্তু মেরু অঞ্চলে প্রায় ১১১.০৪ কিঃ মিঃ। কারণ, মেরু অঞ্চল সামান্য চাপা।

ভূপৃষ্ঠস্থ কোন স্থানের অক্ষাংশের সহিত তথাকার উষ্ণতার সম্পর্ক সুস্পষ্ট। যে সকল স্থানের অক্ষাংশ কম বা নিম্ন অক্ষাংশ তথায় উষ্ণতার পরিমাণ অধিক। এজন্যই মোটামুটি হিসাবে উত্তরে কর্কটক্রান্তি (২৩½° উঃ অঃ) হইতে দক্ষিণে মকরক্রান্তি (২৩½° দঃ অঃ) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অন্তর্গত স্থানসমূহ উষ্ণমণ্ডলে (Torrid zone) অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি হইতে সুমেরুবৃত্তের মাঝখানের স্থানসমূহ উত্তর **নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে** (North Temperate zone) অবস্থিত। মকর-

কেন্দ্রবিন্দুর সহিত যুক্ত করা হয়। এই দুই কাল্পনিক সরলরেখা ভূগোলকের দুইটি ব্যাসার্ধ। ইহাদের সাহায্যে ভূগোলকের কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন হয় তাহা-দ্বারা ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত নির্দিষ্ট স্থানটির বা বিন্দুটির মূল মধ্যরেখা হইতে পূর্ব বা পশ্চিমদিকে কৌণিক দূরত্ব বা দ্রাঘিমান্তর বা দেশান্তর স্থির করা হয়। ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কোন স্থান বা বিন্দু নিরক্ষরেখার উত্তরে বা দক্ষিণে হইলে ঐ বিন্দুকে একটি কাল্পনিক সরলরেখাদ্বারা উহার সমসূত্র বা সোজাসুজি ভূগোলকের মেরুরেখার সহিত যুক্ত করা হয়। অপর একটি কাল্পনিক সরলরেখা দ্বারা ভূগোলকের মেরুরেখার ঐ বিন্দুকে তাহার সোজাসুজি প্রধান দ্রাঘিমারেখার সহিত যুক্ত করা হয় (২১নং চিত্র)। এক্ষেত্রে কাল্পনিক সরলরেখা দুইটি ভূগোলকের কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয় না ; তাহারা মিলিত হয় পৃথিবীর মেরুরেখা বা অক্ষরেখার কেন্দ্র-বিন্দুতে। এভাবে ভূগোলকের উপরিলিখিত দুইটি কাল্পনিক সরলরেখার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠস্থ স্থান বা বিন্দুর দ্রাঘিমান্তর বা দেশান্তর বা তাহার মূল মধ্যরেখা হইতে পূর্ব বা পশ্চিমদিকে কৌণিক দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। মূল মধ্যরেখা হইতে পূর্ব-দিকে ১° পূর্ব দ্রাঘিমান্তর (1°E long), ২° পূর্ব দ্রাঘিমান্তর (2°E long) প্রভৃতি হিসাবে ১৮০° দ্রাঘিমান্তর (180° long) পর্যন্ত দেশান্তর নির্ণয় করা হয়। আর মূল মধ্যরেখা হইতে পশ্চিমদিকে ১° পশ্চিম দ্রাঘিমান্তর (1°W long), ২° পশ্চিম দ্রাঘিমান্তর (2°W long) প্রভৃতি হিসাবে ১৮০° দ্রাঘিমান্তর পর্যন্ত দেশান্তর গণনা করা হয়। ভূগোলকের বা পৃথিবীর কেন্দ্রে মোট ৩৬০° কোণ বলিয়া মূল মধ্যরেখা হইতে পূর্ব ও পশ্চিমদিকে ১৮০° পর্যন্ত দেশান্তর গণনা করা হয়। আর পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক্ হইতে ১৮০° দ্রাঘিমারেখা যেখানে পৌঁছে তাহা একই স্থান। এজন্য ১৮০° দ্রাঘিমারেখার ক্ষেত্রে পূঃ বা পঃ লেখা হয় না।
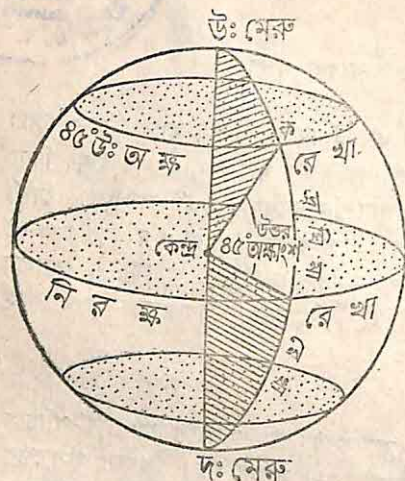
২১নং চিত্র—দেশান্তর নির্ণয়।

অক্ষাংশের মত দেশান্তর বা দ্রাঘিমান্তরের পরিমাণ সঠিক ভাবে গণনা করা ও এবিষয়ে সূক্ষ্ম হিসাব করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ডিগ্রিকে ৬০ মিনিটে (৬০′) ভাগ করা হয়। আবার প্রত্যেক মিনিটকে ৬০ সেকেন্ডে (৬০″) বিভক্ত করা হয়। এজন্য কলিকাতার দেশান্তর ৮৮° ২৪′ পূঃ দ্রাঃ। তবে সাধারণভাবে বলা হয় প্রায় ৮৮½° পূঃ দ্রাঃ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মূল মধ্যরেখার উপর অবস্থিত যে-কোন স্থান বা বিন্দুর দেশান্তর 0°। সেরূপ ঐ রেখার পূর্ব বা পশ্চিমদিকে অবস্থিত যে-কোন দ্রাঘিমারেখার উপর অবস্থিত সকল স্থানের বা বিন্দুরই দেশান্তর সমান। বস্তুতঃ

প্রত্যেকটি দ্রাঘিমারেখা বা মধ্যরেখা তাহার উপরিস্থিত যে-কোন বিন্দুর দেশান্তর অনুসারে ১°, ২°, ৩° প্রভৃতি পূর্ব দ্রাঘিমারেখা রূপে বা ১°, ২°, ৩° প্রভৃতি পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা রূপে পরিচিত।

প্রত্যেকটি দ্রাঘিমারেখাই একটি অর্ধবৃত্ত। আর পরস্পর বিপরীতদিকে অবস্থিত দুইটি দ্রাঘিমারেখা মিলিয়া একটি পূর্ণ বৃত্ত। যেমন, 0° দ্রাঃ রেখা (মূল মধ্যরেখা) ও ১৮০° দ্রাঃ রেখা মিলিয়া একটি পূর্ণ বৃত্ত। তাহাছাড়া এরূপ প্রত্যেকটি বৃত্তেরই কেন্দ্র পৃথিবীর কেন্দ্র। সেজন্য এপ্রকার প্রত্যেক বৃত্তই একটি মহাবৃত্ত (Great Circle)। প্রত্যেক মধ্যরেখার দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু পৃথিবী প্রায়-গোলাকার বলিয়া মধ্যরেখাগুলি নিরক্ষরেখার মত সমান্তরাল নয়। বরং নিরক্ষরেখাতে যে কোন দুইটি মধ্যরেখার মধ্যে দূরত্ব সবচেয়ে বেশী। নিরক্ষরেখা হইতে ক্রমশঃ অধিক উত্তরে বা দক্ষিণে দুইটি মধ্যরেখার মধ্যে রৈখিক দূরত্ব ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়। অবশেষে সুমেরুতে ও কুমেরুতে মধ্যরেখাগুলি পরস্পর মিলিত হয়। এপ্রকার অবস্থার ফলে এক ডিগ্রি ব্যবধান দুই মধ্যরেখার মধ্যে রৈখিক দূরত্ব নিরক্ষরেখাতে প্রায় ১১১ কিঃ মিঃ, ৩০° উঃ বা দঃ অক্ষরেখাতে এই দূরত্ব প্রায় ৬৯ কিঃ মিঃ, ৬০° উঃ বা দঃ অক্ষরেখাতে এই দূরত্ব প্রায় ৫৫ কিঃ মিঃ, ৮০° উঃ বা দঃ অক্ষরেখাতে এই দূরত্ব প্রায় ১৯ কিঃ মিঃ।

দেশান্তর ও স্থানীয় সময়

পৃথিবীর আহ্নিক বা আবর্তন গতি বশতঃ ইহা অনবরত আপন অক্ষরেখার চারিদিকে **পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আবর্তন** করিতেছে। পৃথিবীর এভাবে একবার সম্পূর্ণ রূপে আবর্তন করিবার জন্য প্রয়োজন ২৪ **ঘন্টা সময়**। ইহার ফলে ভূপৃষ্ঠের যে স্থান যত অধিক পূর্বদিকে অবস্থিত, তাহা তত আগে সূর্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাহাছাড়া আহ্নিক বা আবর্তন গতির জন্যই ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক স্থানে প্রতি দিন প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, মধ্য রাত্রি প্রভৃতি অবস্থা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপস্থিত হয় (২২নং চিত্র)। ইহাদের মধ্যে যে সময় সূর্য কোন স্থানে মাথার উপর থাকে, সেই সয়মই তথাকার পক্ষে মধ্যাহ্ন। আর সেই সময়ের বা **মধ্যাহ্নের** (noon) সাহায্যে প্রত্যেক স্থানের **স্থানীয় সময়** (Local time) নির্ণয় করা হয়। আবার যে স্থান যত অধিক পূর্বদিকে অবস্থিত তথাকার দেশান্তর তত বেশী পূর্ব এবং তথায় তত বেশী আগে মধ্যাহ্ন হয়। এজন্য সেখানকার স্থানীয় সময়ও তত বেশী বা অগ্রবর্তী। কাজেই প্রত্যেক স্থানের দেশান্তরের সহিত স্থানীয় সময়ের সম্পর্ক সুস্পষ্ট। একারণে যে কোন স্থানের দেশান্তরের সাহায্যে তথাকার স্থানীয় সময় সহজেই জানা যায়। আবার যে-কোন স্থানের স্থানীয় সময়ের সাহায্যে তথাকার দেশান্তর বা **দ্রাঘিমান্তরও** নির্ণয় করা যায়। তবে এজন্য মধ্যাহ্নে তথা হইতে **সূর্যের সর্বোচ্চ*** **উন্নতি লক্ষ্য করা হয়।**

যেহেতু পৃথিবীর নিজের মেরুরেখার চারিদিকে এক বার সম্পূর্ণ রূপে (৩৬০°) আবর্তন করিবার জন্য প্রয়োজন ২৪ ঘন্টা সময়, ভূপৃষ্ঠে **প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমাতে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য** ২৪ ঘন্টা÷৩৬০, অর্থাৎ ২৪×৬০ মিঃ÷৩৬০ বা ৪ **মিনিট সময়।** সুতরাং ভূপৃষ্ঠের যে-কোন দুইটি স্থানের মধ্যে যেটি অপরটি অপেক্ষা অধিক **পূর্ব**-দিকে অবস্থিত, তাহা পৃথিবীর আবর্তন গতি বশতঃ পশ্চিমদিকের স্থানের তুলনায়

* সাধারণতঃ সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে সূর্যের সর্বোচ্চ উন্নতি লক্ষ্য করা হয়। আর ক্রনোমিটার ঘড়ির সাহায্যে জানা যায় লণ্ডনের নিকটবর্তী গ্রীনিচ মানমন্দিরের বা 0° দ্রাঃ স্থানীয় সময় বা গ্রীনিচ প্রমাণ কাল।

প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমাতে ৪ মিনিট সময় হিসাবে আগে সূর্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কাজেই তথাকার স্থানীয় সময় প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমাতে ৪ মিনিট হিসাবে বেশী বা অগ্রগামী। অথবা পূর্বদিকের স্থানের তুলনায় পশ্চিমদিকের স্থানে প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমাতে ৪ মিনিট হিসাবে স্থানীয় সময় কম বা পশ্চাৎবর্তী। যেমন, কলিকাতাতে (৮৮½° পূঃ দ্রাঃ) যখন কোন দিন স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৩০ মিঃ (8 hr 30 m a.m. or 8.30 a.m.) তখন কলিকাতার ৬° দ্রাঃ পশ্চিমে অবস্থিত এলাহাবাদের (৮২½° পূঃ দ্রাঃ) স্থানীয় সময় কলিকাতার স্থানীয় সময়ের তুলনায় (৬×৪=২৪) ২৪ মিনিট কম, অর্থাৎ ঐ দিনই সকাল (৮ ঘঃ ৩০ মিঃ—২৪ মিঃ) ৮টা ৬ মিঃ (8 hr 6 m a.m. or 8.6 a.m.)।
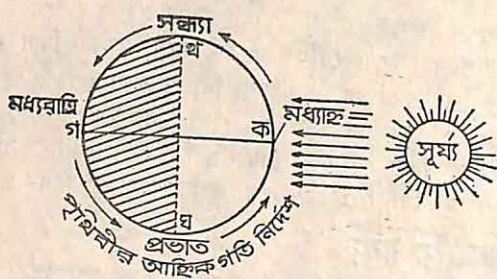
২২নং চিত্র।

এ-সম্পর্কে আরও ২/১টি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন, লণ্ডনে (0° দ্রাঃ) যখন কোন দিন তথাকার স্থানীয় সময় অনুসারে ভোর ৬টা (6 a.m.), তখন লণ্ডনের ৮৮½° দ্রাঃ পূর্বদিকে অবস্থিত কলিকাতার (৮৮½° পূঃ দ্রাঃ) স্থানীয় সময় লণ্ডনের স্থানীয় সময়ের তুলনায় ৮৮½×৪ মিনিট বা ৩৫৪ মিঃ বা ৫ ঘঃ ৫৪ মিঃ বেশী। অর্থাৎ লণ্ডনে যখন স্থানীয় কাল ভোর ৬টা তখন কলিকাতার স্থানীয় সময় সেদিনেরই দিবা ৬ঘ+৫ঘ ৫৪ মিঃ বা ১১ ঘঃ ৫৪ মিঃ (11hr 54m a.m. or 11.54 a.m.) (২৩নং চিত্র)। এজন্যই লণ্ডনে কোন দিন গ্রীনিচ সময় অনুসারে বেলা ১০টার সময় ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হইলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে দূর-দর্শনে দেখা যাইতে পারে বা রেডিও মারফত সেই খেলার ধারাবিবরণী সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতাতে পাওয়া যায়। তবে তখনকার কলিকাতার স্থানীয় সময় সেদিন বেলা ১০ঘ+৫ঘ ৫৪ মিঃ অর্থাৎ অপরাহ্ন ৩টা ৫৪ মিনিট (3hr 54m p.m. or 3.54 p.m.)। একই কারণে স্পেন দেশের রাজধানী মাদ্রিদে (প্রায় ৪° পঃ দ্রাঃ) যখন বৈকাল ৫টায় (5p.m.) **১৯৮২-বিশ্বকাপ ফুটবল** খেলা হইতেছিল, দূরদর্শন মারফত কলিকাতাতে (৮৮½° পূঃ দ্রাঃ) সেই খেলা সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাইতেছিল। তবে তখন কলিকাতার স্থানীয় সময় রাত্রি ৫ঘ+৬ঘ ১০ মিঃ বা ১১ ঘঃ ১০ মিঃ (11hr 10m p.m. or 11.10 p.m.)। [ইহার কারণ, মাদ্রিদের তুলনায় কলি-কাতা ৪+৮৮½=৯২½° পূর্বদিকে অবস্থিত। এজন্য কলিকাতার স্থানীয় সময় মাদ্রিদের স্থানীয় সময়ের তুলনায় ৯২½×৪ মিঃ বা ৩৭০ মিঃ বা ৬ ঘঃ ১০ মিঃ বেশী।] দেশান্তর ও স্থানীয় সময়ের মধ্যে এপ্রকার সম্পর্কের ফলে ১৯৮৬ খ্রীঃ জুন মাসে যখন **মেক্সিকোতে** (প্রায় ৯৯° পঃ দ্রাঃ) **বিশ্বকাপ ফুটবল** প্রতিযোগিতা

হইতেছিল, তাহার বিবরণ দূরদর্শনের মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতাতে (৮৮ই° পূঃ দ্রাঃ) ও ভারতের অন্য বহু স্থানে দেখা যাইতেছিল। তবে মেক্সিকোর দেশান্তরের তুলনায় কলিকাতার দেশান্তর (৯৯+৮৮ই)=১৮৭ই° পূর্বদিকে। এজন্য কলিকাতার স্থানীয় সময় মেক্সিকোর স্থানীয় সময়ের চেয়ে ১৮৭ই×৪=৭৫০ মিঃ বা ১২ঘ ৩০ মিঃ অগ্রগামী বা বেশী। এজন্য যে অনুষ্ঠান কোন দিন বৈকাল ৫ টায় (5p.m.) মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কলিকাতায় তাহা দেখা গিয়াছে সেদিন শেষ রাত্রি (5+12.30) ৫টা ৩০ মিঃ (5.30a.m.)। অর্থাৎ তারিখ হিসাবে এক দিন পরে।
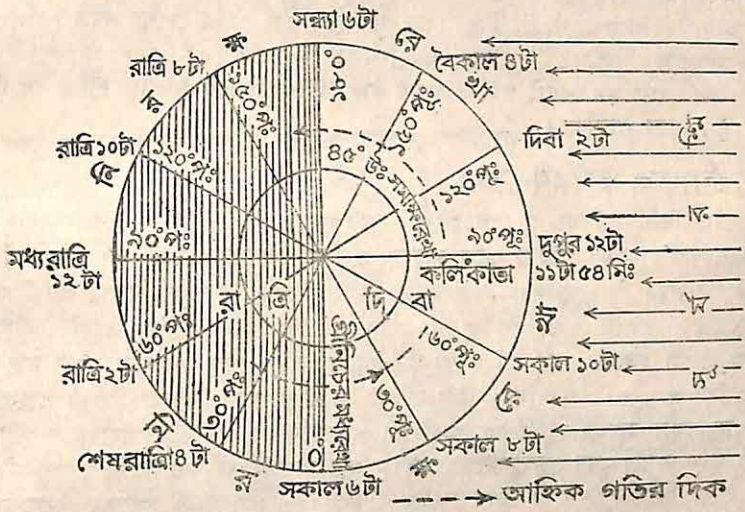
২৩নং চিত্র—পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে বিভিন্ন দেশান্তর রেখাতে স্থানীয় সময়ের পরিবর্তন।

অপর দিকে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে (১৫১° পূঃ দ্রাঃ) যখন কোন দিন ভোর ৬টা (6a.m.), তখন কলিকাতার (৮৮ই° পূঃ দ্রাঃ) স্থানীয় সময় সিডনির স্থানীয় সময়ের তুলনায় ৬২ই°×৪ মিঃ বা ২৫০ মিঃ বা ৪ ঘঃ ১০ মিঃ কম, অর্থাৎ পূর্বরাত্রি ১টা ৫০ মিঃ (1hr 50m a.m. or 1.50 a.m.). [কারণ, সিডনির তুলনায় কলিকাতা ১৫১°— ৮৮ই=৬২ই° পশ্চিমে অবস্থিত।] একারণেই সিডনিতে কোন দিন বেলা ১০টার সময় ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হইলে রেডিও মারফত সেই খেলার ধারাবিবরণী সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় কলিকাতাতে সেদিনই ভোর (১০ঘঃ–৪ঘঃ ১০মিঃ=৫ঘঃ ৫০মিঃ) ৫টা ৫০মিঃ (5hr 50m a.m. or 5.50 a.m.) সময়ে। প্রায়-গোলাকার পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্যই স্থানীয় সময় সম্বন্ধে এরূপ আশ্চর্যজনক অবস্থা ঘটিতেছে।

দেশান্তর ও স্থানীয় সময় সম্পর্কে আরও বহু উদাহরণ পরিশিষ্ট অংশে দেওয়া হইয়াছে।

দেশান্তরের সহিত স্থানীয় সময়ের উপরিলিখিত রূপ সম্বন্ধের ফলে যে সকল দেশ পূর্ব-পশ্চিমে অধিক বিস্তৃত, তাহাদের বিভিন্ন অংশে স্থানীয় সময় পৃথক্ পৃথক্। ইহার ফলে কতক অসুবিধারও সৃষ্টি হয়। এজন্য সাধারণতঃ দেশের মধ্য ভাগের কোন স্থানের দেশান্তর অনুসারে সমগ্র দেশের জন্য একটি প্রমাণ কাল (Standard time) স্থির করা হয়। যেমন, আমাদের দেশের পূর্ব সীমা প্রায় ৯৭° পূঃ দ্রাঃ এবং পশ্চিম সীমা প্রায় ৬৮° পূঃ দ্রাঃ। এই দুই সীমার মধ্যে প্রায় ২৯° দেশান্তরের পার্থক্য। ফলে, এদেশের পূর্ব ও পশ্চিম সীমার মধ্যে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য (২৯×৪) ১১৬ মিঃ বা প্রায় ২ ঘন্টা। এজন্য ভারতের মধ্য ভাগের (এলাহাবাদের) দেশান্তর ৮২½° পূঃ দ্রাঃ অনুসারে **ভারতের প্রমাণ কাল** (Indian Standard Time or I. S. T.) নির্ণয় করা হয়। এবং তহাই দেশের সর্বত্র প্রচলিত। আর লণ্ডনের নিকটবর্তী গ্রীনিচ মানমন্দিরের দেশান্তর (০° দ্রাঃ) অনুসারে যে সময় নির্ণয় করা হয় তাহাই **গ্রীনিচ প্রমাণ কাল** (Greenwich Mean Time or G. M. T.) নামে পরিচিত।

আন্তর্জাতক তারিখ রেখা

প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমা বা দেশান্তরের পার্থক্যের ফলে ৪ মিনিট হিসাবে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য হয়। ইহার ফলে জাহাজ ও বিমানপোতের ১৮০° দ্রাঃ রেখা অতিক্রম করার সময় বা ভূপ্রদক্ষিণ করার কালে সময়ের হিসাব সম্পর্কে বিস্তর অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যেমন, ধরা যাক দুইখানা বিমানপোত কোন রবিবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে লণ্ডন হইতে একই গতিবেগে রওয়ানা হইল। পথে একখানা যখন যতটুকু সময় বিশ্রাম করে, অপরখানাও ঠিক তখনই ততটুকু সময় বিশ্রাম করে। তাহাদের একখানা গেল বরাবর পূর্বদিকে, অন্যখানা পশ্চিমদিকে। উভয় বিমানপোতে গ্রীনিচ সময় লক্ষ্য করার জন্য ক্রনোমিটার আছে। আর সূর্যের সর্বোচ্চ উন্নতি লক্ষ্য করিয়া মধ্যাহ্ন ও স্থানীয় অন্যান্য সময় নির্ণয় করিবার জন্য সেক্সট্যান্ট আছে। মনে করা যাক, গ্রীনিচ সময় অনুসারে বৃহস্পতিবার বেলা ১০টার সময় উভয় বিমানপোত ১৮০° দ্রাঃ রেখাতে পৌঁছিল। যে বিমানপোত পূর্বদিকে যাইতেছে তাহার যাত্রীদের হিসাবে তখন তথাকার স্থানীয় সময় গ্রীনিচ প্রমাণ সময়ের তুলনায় ১৮০×৪মি বা ৭২০মি বা ১২ঘ বেশী। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০টা। আর যে বিমানপোত পশ্চিমদিকে যাইতেছে তাহার যাত্রীদের হিসাবে তখন তথাকার স্থানীয় সময় গ্রীনিচ প্রমাণ সময়ের তুলনায় ১৮০×৪মি বা ৭২০মি বা ১২ঘ কম। অর্থাৎ বুধবার রাত্রি ১০টা। অথচ ১৮০° দ্রাঃ একই রেখা এবং উভয় বিমানপোত একই সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু স্থানীয় সময় গণনাতে দেখা যায় দুই বিমানপোতের যাত্রীদের হিসাবে ২৪ ঘন্টার পার্থক্য (বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০টা ও বুধবার রাত্রি ১০টা)।

মনে করা যাক দুইখানা বিমানপোতই ১৮০° দ্রাঃ হইতে পূর্বের গতি অনুসারে চলিতে লাগিল। অর্থাৎ যেখানা পূর্বদিকে যাইতেছিল তাহা পূর্ব দিকেই গেল। আর যেখানা পশ্চিমদিকে যাইতেছিল তাহা পশ্চিমদিকেই গেল। পরের রবিবার ক্রনোমিটার ঘড়ি অনুসারে সকাল ৮টার সময় দুইখানা বিমানপোতই এক সঙ্গে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিল। যে বিমানপোত বরাবর পূর্বদিকে চলিয়াছে তাহার যাত্রীদের হিসাব অনুসারে ৩৬০° অতিক্রম করার ফলে তখনকার স্থানীয় সময় ৩৬০×৪মি বা ১৪৪০

মি বা ২৪ ঘন্টা বেশী। অর্থাৎ সোমবার সকাল ৮টা। আর যে বিমানপোত বরাবর পশ্চিমদিকে গিয়াছে তাহার যাত্রীদের হিসাব অনুসারে ৩৬০° অতিক্রম করার ফলে তখনকার স্থানীয় সময় ৩৬০×৪মি বা ১৪৪০মি বা ২৪ ঘন্টা কম। অর্থাৎ শনিবার সকাল ৮টা।

ক্রনোমিটার ঘড়ি অনুসারে নির্ণয় করা সময়ের (G. M. T.) সহিত স্থানীয় সময়ের এপ্রকার পার্থক্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে এখন হইতে প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে (১৮৮৪ খ্রীঃ) যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে স্থির **হইয়াছে যে ১৮০° দ্রাঃ রেখা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে যে বিমানপোত বা জাহাজ পূর্বদিকে যাইতেছে তাহা এক দিন কমাইয়া বা বাদ দিয়া স্থানীয় সময়ের হিসাব করিবে। আর যে বিমানপোত বা জাহাজ পশ্চিমদিকে যাইতেছে তাহা ১৮০° দ্রাঃ অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে এক দিন যোগ করিয়া স্থানীয় সময়ের হিসাব করিবে।** তাহার
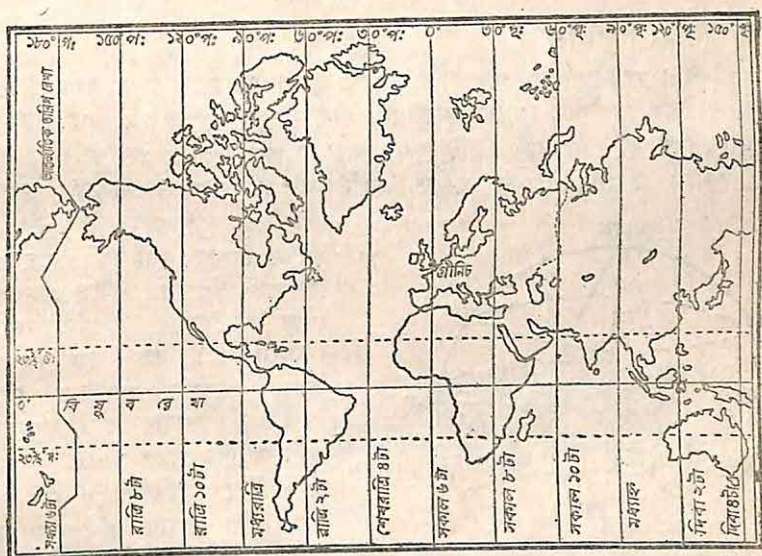
২৪নং চিত্র—আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ও কয়েকটি দ্রাঘিমারেখা।

ফলে উপরিলিখিত উদাহরণ অনুসারে যে বিমানপোত পূর্বদিকে গিয়াছে তাহার যাত্রীরা ১৮০° দ্রাঃ রেখা অতিক্রম করিয়া ১৭৯° পঃ দ্রাঃতে বৃহস্পতিবার রাত্রির পরিবর্তে এক দিন কমাইয়া বুধবার রাত্রি মনে করিবে। আর যে বিমানপোত পশ্চিমদিকে গিয়াছে তাহার যাত্রীরা ১৮০° দ্রাঃ রেখা অতিক্রম করিয়া ১৭৯° পূঃ দ্রাঃতে বুধবার রাত্রির পরিবর্তে এক দিন যোগ করিয়া বৃহস্পতিবার রাত্রি মনে করিবে। ফলে, উভয় ক্ষেত্রেই ক্রনোমিটারের সময়ের সহিত দিন হিসাবে মিল দেখা যাইবে। আর লণ্ডনে পৌঁছিয়াও যে বিমানপোত পূর্বদিকে গিয়াছে তাহার যাত্রীরা তাহাদের হিসাব অনুসারে সোমবারের পরিবর্তে এক দিন কমাইয়া রবিবার মনে করিবে। তথায় পৌঁছিয়া যে বিমানপোত পশ্চিমদিকে গিয়াছে তাহার যাত্রীরা তাহা-

দের হিসাব অনুসারে শনিবারের পরিবর্তে এক দিন যোগ করিয়া রবিবার মনে করিবে। ইহার ফলে **উভয় ক্ষেত্রেই ক্রনোমিটারের সময়ের ও বারের সহিত মিল দেখা যাইবে।**

তবে এবিষয়ে একটু অসুবিধা আছে। যেমন ১৮০° দ্রাঃ রেখা প্রধানতঃ প্রশান্ত মহাসাগর এবং উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগরের জলরাশির উপর দিয়া বিস্তৃত। তবু ইহা কিছু কিছু স্থলভাগের, বিশেষতঃ উত্তর অংশে সাইবেরিয়ার উত্তরপূর্ব অংশ ও এলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, প্রায় মধ্যভাগে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ অংশে চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়া বিস্তৃত। এসকল ক্ষেত্রে রেখাটির পূর্ব ও পশ্চিমদিকে **সময়ের হিসাব করার বেলা অসুবিধা হওয়ার ভয় আছে।** তাহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে রেখাটিকে ঐ সকল স্থানের পাশ দিয়া প্রয়োজনমত **সামান্য আঁকাবাঁকা করিয়া কেবল মাত্র** জলরাশির উপর দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি রেখা কল্পনা করা হইয়াছে (২৪নং চিত্র)। ইহাই **আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা** (International date line)।

প্রতিপাদস্থান নির্ণয়

পৃথিবীর আকৃতি প্রায়-গোলাকার। ইহার ফলে ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত স্থানের অবস্থিতি নির্ণয় করা সম্ভবপর। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে ভূগোলকের উপরিভাগে একটি বিন্দু দ্বারা ঐ প্রথম স্থানের অবস্থিতি নির্দেশ করা দরকার। তারপর ঐ বিন্দু হইতে একটি কল্পিত ব্যাস ভূগোলকের কেন্দ্রের মধ্য দিয়া ভূগোলকের বিপরীতদিক পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। তাহা যে বিন্দুতে ভূপৃষ্ঠে পোঁছে তাহাকেই প্রথম বিন্দুর **প্রতিপাদস্থান** (Antipode) বলা হয় (২৫নং চিত্র)। কাজেই **ভূপৃষ্ঠস্থ কোন বিন্দুর ও তাহার প্রতিপাদস্থানের মধ্যে কৌণিক দূরত্ব ১৮০°।** ফলে, কোন বিন্দুর অক্ষাংশ ও দেশান্তর যত ডিগ্রি তাহার প্রতিপাদস্থানের অক্ষাংশ ও দেশান্তর তাহা হইতে ১৮০° ব্যবধান। যেমন, লণ্ডনের (০° দ্রাঃ, ৫১½° উঃ অঃ) প্রতিপাদস্থান নিউ জীল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব-দিকে (১৮০° দ্রাঃ, ৫১½° দঃ অঃ) এণ্টিপোডস দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে। বস্তুতঃ এই দ্বীপপুঞ্জ লণ্ডনের প্রতিপাদস্থানে অবস্থিত বলিয়াই ইহার এরূপ নাম রাখা হইয়াছে। ০° দ্রাঃ রেখাতে অবস্থিত কোন স্থানের প্রতিপাদস্থান ১৮০° দ্রাঃ রেখাতে, আর নিরক্ষরেখাতে অবস্থিত কোন স্থানের প্রতিপাদস্থান তাহার বিপরীত দিকে নিরক্ষরেখাতে।
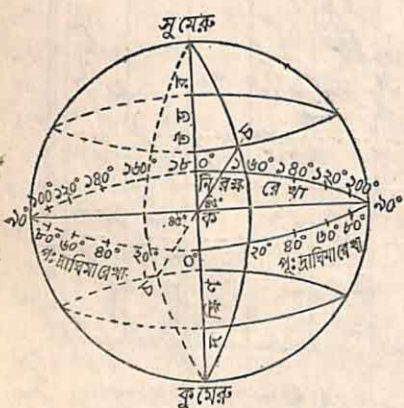
২৫নং চিত্র—প্রতিপাদস্থান

অন্যান্য স্থানের প্রতিপাদস্থান নিম্নলিখিত ভাবে নির্ণয় করা হয়। যেমন, কলিকাতার উদাহরণ ধরা যাক। কলিকাতার অক্ষাংশ ২২° ৩৪′ উঃ এবং দেশান্তর ৮৮° ২৪′ পূঃ। কাজেই কলিকাতার প্রতিপাদস্থানের অক্ষাংশ এভাবে হিসাব করা হইবে ঃ—

২২° ৩৪′ উঃ অঃ হইতে ৬৭° ২৬′ উত্তরে সুমেরু। তথা হইতে ৯০° দক্ষিণে নিরক্ষরেখা। আর তথা হইতে ২২° ৩৪′ দক্ষিণে কলিকাতার প্রতিপাদস্থানের অবস্থিতি। অর্থাৎ এই স্থানের অক্ষাংশ ২২° ৩৪′ দঃ অঃ। কারণ, কলিকাতা ও এই স্থানের মধ্যে অক্ষাংশের দূরত্ব (৬৭°২৬′+৯০°+২২°৩৪′=)১৮০°। এবার কলিকাতার প্রতিপাদস্থানের দেশান্তর এরূপ ভাবে হিসাব করা হইবেঃ—৮৮° ২৪′ পূঃ দ্রাঃ হইতে ৮৮° ২৪′ পশ্চিমে ০° দ্রাঃ ; তথা হইতে ৯১° ৩৬′ পশ্চিমে কলিকাতার প্রতিপাদস্থানের অবস্থিতি। অর্থাৎ এই স্থানের দেশান্তর ৯১° ৩৬′ পঃ দ্রাঃ। কারণ, কলিকাতা ও তাহার প্রতিপাদস্থানের মধ্যে দেশান্তরের পার্থক্য (৮৮°২৪′+৯১°৩৬′=) ১৮০°। অতএব কলিকাতার প্রতিপাদস্থানের অবস্থিতি এপ্রকারঃ—২২° ৩৪′ দঃ অঃ ও ৯১°৩৬′ পঃ দ্রাঃ। মানচিত্রে দেখা যায়, ঐ স্থান চিলি দেশের উত্তর অংশের য়্যান্টোফাগাস্টা বন্দরের উত্তরপশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরে।

কোন স্থানের ও তাহার প্রতিপাদস্থানের মধ্যে এরূপ ১৮০° অক্ষাংশের পার্থক্যের ফলে উভয়ের জলবায়ু প্রায় এক প্রকার, তবে সময় হিসাবে পার্থক্য ছয় মাস। প্রথমোক্ত স্থানে যখন গ্রীষ্ম কাল, তাহার প্রতিপাদস্থানে তখন শীত কাল। আর প্রথমোক্ত স্থানে যখন শীত কাল, তাহার প্রতিপাদস্থানে তখন গ্রীষ্ম কাল। আর ইহাদের মধ্যে ১৮০° দেশান্তরের পার্থক্য হওয়ার ফলে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য ১২ ঘণ্টা। ইহাদের মধ্যে এক জায়গাতে যখন প্রভাত, অন্য জায়গাতে তখন সন্ধ্যা। অথবা ইহাদের মধ্যে এক জায়গাতে যখন দুপুর, অন্য জায়গাতে তখন মধ্যরাত্রি।

চতুর্থ অধ্যায়

শিলা ও তাহাদের সাধারণ শ্রেণীবিভাগ
(Rocks and their broad classification)

ভূগর্ভ ও ভূত্বক্

আমাদের পৃথিবীর আকৃতি প্রায়-গোল এবং ইহার ব্যাস (diameter) ১২,৭০০ কিঃ মিঃর অধিক। আর ভূত্বক্ মাত্র ১২-৩৫ কিঃ মিঃ পুরু। অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরের তুলনায় ভূত্বক্ বা বাহির দিকের আবরণ (crust) অত্যন্ত হাল্কা। কেহ কেহ ইহাকে ডিমের খোসার সহিত তুলনা করেন। এই ভূত্বক্ সকল প্রকার উদ্ভিদ্ ও **জীবজন্তুর বাসস্থান**। ভূত্বকের যে বৃহৎ অংশ (প্রায় ৭১%) জল দ্বারা আবৃত তথায়ও বাস করে অসংখ্য প্রকার জলচর প্রাণী ও কতক জলজ উদ্ভিদ্। ভূত্বকের স্থলভাগ এবং সাগরাদির তলদেশ পাথর, নুড়ি, কাঁকর, অতিসূক্ষ্ম বালুকা, কর্দম প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। ইহাদের সাধারণ নাম **শিলা** (Rocks)। তবে ভূত্বকের শিলাসমূহ তাহাদের উপর সঞ্চিত মৃত্তিকার দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে ঢাকা রহিয়াছে। তাহাছাড়া তথাকার তৃণ ও অন্যান্য উদ্ভিদের জন্যও শিলাসমূহকে স্পষ্ট দেখা যায় না।
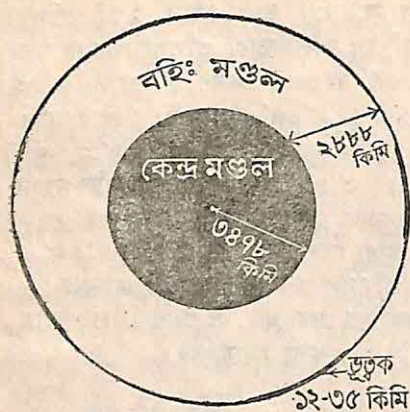
২৬নং চিত্র—ভূগর্ভস্থ (পৃথিবীর অভ্যন্তরের) মণ্ডলসমূহ।

ভূত্বকের নীচে পৃথিবীর অভ্যন্তরে আছে প্রায় এক জাতীয় পদার্থের কয়েকটি মণ্ডল (zones) (২৬নং চিত্র)। ঠিক কেন্দ্রের চারিদিকে বহু দূর (প্রায় ৩৪৭৮ কিঃ মিঃ গভীর) পর্যন্ত আছে অত্যন্ত ভারী উপাদান দ্বারা গঠিত **কেন্দ্রমণ্ডল** (core)। এই মণ্ডলকে সম্পূর্ণ রূপে ঘিরিয়া আছে কিছুটা হাল্কা উপাদানের একটি (প্রায় ২৮৮৮ কিঃ মিঃ গভীর) **বহির্মণ্ডল** (mantle)। ইহাকে **শিলামণ্ডলও** (lithosphere) বলা হয়।

শিলাসমূহের গঠন ও বিভাগ

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের প্রত্যেক প্রকার **শিলাই** নানারকম **খনিজ পদার্থ** (rock forming minerals) দ্বারা গঠিত। এসকল খনিজ পদার্থ আবার **রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ** (chemical compounds) দ্বারা গঠিত। ফলে, শিলাসমূহের মধ্যে তাহাদের উৎপত্তি, গঠন, উপাদান ও ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কে পার্থক্য বিস্তর। তদনুসারে শিলা নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে শিলাকে এভাবে ভাগ করার কাজ খুব কঠিন। কারণ, অনেক শিলার গঠনের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাহাছাড়া যে সকল চিহ্ন বা লক্ষণ দেখিয়া শিলাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, সে সকল চিহ্নও সকল সময় সুস্পষ্ট নয়।

(ক) আগ্নেয় শিলা

আমাদের পৃথিবী আদি অবস্থায় ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ। ক্রমশঃ
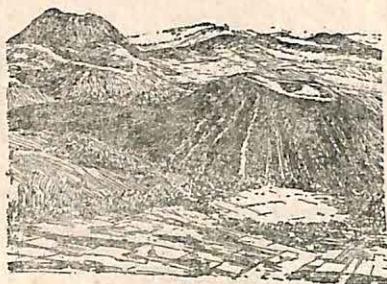
২৭নং চিত্র—আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ হইতে লাভা প্রবাহ।

তাপ বিকিরণ করিয়া ও শীতল হইয়া এসকল উপাদান তরল হয়। ক্রমে ক্রমে আরও

তাপ বিকিরণ করিয়া ও শীতল হইয়া এসকল তরল পদার্থ জমিয়া গিয়াছে বা জমাট বাঁধিয়াছে। এভাবে সৃষ্টি হইয়াছে আদি শিলা বা প্রাথমিক শিলা (Primary rocks)। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই এখন রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic rocks)। এখন আমরা দেখি ভূপৃষ্ঠ শীতল। কিন্তু ভূত্বক্ হইতে পৃথিবীর অভ্যন্তরের দিকে উত্তাপ ক্রমশঃ এত বেশী* যে ভূগর্ভস্থ উপাদানের অবস্থা প্রায় গলন্ত। কিন্তু চারি পাশের উপাদানগুলির প্রবল চাপে এসকল উপাদান বা জিনিস স্থির বা স্থিতিস্থাপক (static)। তবে কখন কখন অভ্যন্তরের গঠনিক সংক্ষোভের (tectonic movement)
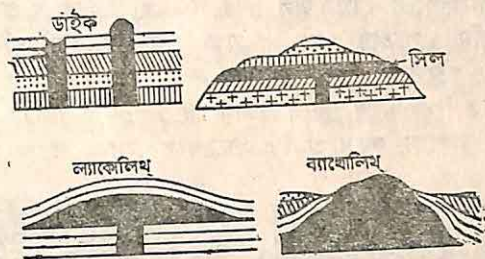
২৮নং চিত্র—ভূপৃষ্ঠের নীচে পাতালিক শিলার সৃষ্টি।

ফলে অথবা বিভিন্ন কারণের সমষ্টিগত ফলে ভূগর্ভের কতক অংশে **চাপের পার্থক্য** হয়। এমন কি কোথাও কোথাও চাপ অধিক পরিমাণে **হ্রাস** পায়। তখন তথাকার উত্তপ্ত উপাদানসমূহের স্থির অবস্থার বা **স্থিতিস্থাপকতার পরিবর্তন** ঘটে। এসময় তাতল উপাদান গলন্ত অবস্থায় (magma) ভূগর্ভের দুর্বল অংশের অর্থাৎ চির, ফাটল প্রভৃতির মধ্য দিয়া **লাভা** (lava) রূপে প্রবাহিত হয়। এভাবে প্রবাহের সময় কিছু কিছু লাভা সাধারণতঃ ধূম, ভস্ম প্রভৃতির সহিত ভূপৃষ্ঠে পোঁছে। তবে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়ই ভূপৃষ্ঠে লাভা প্রবাহ হয় খুব বেশী (২৭নং চিত্র)। উত্তপ্ত লাভা ভূপৃষ্ঠে পোঁছিয়া কালক্রমে **শীতল** ও **কঠিন** হইয়া **নিঃসারী শিলাতে** (extrusive rocks) পরিণত হয়। ইহাদের মধ্যে **ব্যাসল্ট** সর্বপ্রধান। আগ্নেয় অবস্থা হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য এই জাতীয় শিলাকে বলা হয় **আগ্নেয় শিলা** (Igneous rocks)। তবে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি বা অগ্ন্যুৎপাতই এপ্রকার শিলার সৃষ্টির প্রধান কারণ। সেজন্য এগুলি আগ্নেয় (Igneous) শিলার অন্তর্ভুক্ত ভলক্যানিক (Volcanic) শিলা। গলন্ত পদার্থদ্বারা সৃষ্টি হয় বলিয়া এই জাতীয় শিলা **স্তরহীন**। আর ভূপৃষ্ঠে তাড়াতাড়ি শীতল হয় বলিয়া ইহাদের স্ফটিকের মত দানাগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম (fine grained crystals)।

ভূগর্ভস্থ উত্তপ্ত গলন্ত পদার্থের বা ম্যাগমার এক বৃহৎ অংশ চির, ফাটল প্রভৃতির মধ্যদিয়া প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ভূপৃষ্ঠে পোঁছিতে পারে না। তাহার কতক অংশ ভূত্বকের নীচে **ব্যাথোলিথ** (batholith), **সিল** (sill), **ডাইক** (dyke), **ল্যাকোলিথ** (laccolith) প্রভৃতি রূপে সঞ্চিত হয় (২৮নং চিত্রে)। এগুলি কালক্রমে শীতল ও কঠিন হইয়া **উদ্বেধী শিলাতে** (intrusive rocks) পরিণত হয়। ইহাদের মধ্যে **গ্র্যানাইট** সর্বপ্রধান। এসকল শিলা যথেষ্ট দেরীতে শীতল হয় বলিয়া

* ভূপৃষ্ঠ হইতে সামান্য নীচে কয়লার খনির মধ্যে গেলেই প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করা যায়।

ইহাদের দানাগুলি একটু বড়। এই জাতীয় শিলা ভূগর্ভে উৎপন্ন হয়। সেজন্য ইহাদিগকে বলে **পাতালিক** (plutonic) শিলা। ইহাদের তুলনায় উপরে যে শিলা উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে বলে **অর্ধপাতালিক হাইপাব্যাসাল** (hypabyssal) শিলা। এগুলি আগ্নেয় শিলার অন্তর্ভুক্ত।

(খ) **পাললিক শিলা**

সৌরতাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে আদিকাল হইতে ভূত্বকের প্রাথমিক বা আগ্নেয় **শিলাসমূহের ক্ষয়কার্য** হইতেছে। আর **ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানগুলি** বৃষ্টির জল, নদী, হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি দ্বারা প্রবাহিত হইয়া নিম্নভূমিতে পাতলা, পুরু নানারকম **স্তরে** (strata) **পলিরূপে** (silt or alluvium) সঞ্চিত হইতেছে। উপাদানগুলির মধ্যে স্থূল, বড় ও ভারী অংশ যেমন, কাঁকর, নুড়ি প্রভৃতি স্থির জলে প্রথমে তলানি পড়ে (৩৮নং চিত্র)। আর সূক্ষ্ম ও হাল্কা অংশ যেমন, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি সমুদ্রজলের স্রোত, তরঙ্গ প্রভৃতির প্রভাবে
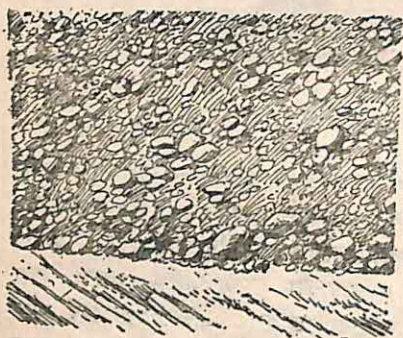
২৯নং চিত্র—পাললিক শিলা কংগ্লোমারেট।
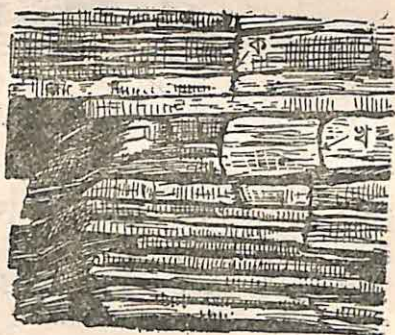
৩০নং চিত্র—পাললিক শিলাতে বিভিন্ন স্তর ও ফাটল।

উপকূল হইতে কিছু দূরে গিয়া অগভীর সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়। উপাদানগুলি ক্রমাগত এক স্তরের উপর অন্য স্তর—এভাবে অসংখ্য স্তরে সঞ্চিত হয়। অন্যদিকে ভূগর্ভের উত্তাপ, উপরের ও পাশের জিনিসের চাপ ও জলের প্রভাবে উপাদানগুলি আংশিকভাবে গলিয়া কালক্রমে পরস্পরের সহিত জুড়িয়া যায় ও কঠিন হয়। এভাবে সৃষ্টি হয় **পাললিক শিলা** (Sedimentary rocks) (২৯নং চিত্র)। স্তরে স্তরে (৩০নং চিত্র) পলি সঞ্চিত হইয়া এই জাতীয় শিলা গঠিত হয়। এজন্য এগুলি **স্তরীভূত** (stratified) **শিলা**। ভূত্বকের উপরিভাগের প্রায় ৭৫% শিলা পাললিক জাতীয়।

এপ্রকার শিলার কতক উপাদান যেমন, পাথর, নুড়ি, কাঁকর প্রভৃতি **যান্ত্রিক উপায়ে** (mechanically) পরস্পরের সহিত যুক্ত হয়। কংগ্লোমারেট (conglomerate), বেলেপাথর (sandstone), কাদাপাথর (mudstane), শেল (shale) প্রভৃতি এই জাতীয় শিলার উদাহরণ। কতক পাললিক শিলার মধ্যে উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর লক্ষ লক্ষ বৎসর আগেকার দেহাবশেষ পাথরের মত বা প্রস্তরীভূত অবস্থায়

দেখা যায়। ইহাদিগকে বলে **জীবাশ্ম** (fossil)। কয়লা এই জাতীয় পাললিক শিলা। ইহাদিগকে **জৈব শিলাও** (organic rock) বলা হয়। অপর কতক পাললিক শিলার উপাদান প্রধানতঃ জলের প্রভাবে **রাসায়নিক উপায়ে** (chemically or bio-chemically) পরস্পরের সহিত যুক্ত হয়। চুনাপাথর (limestone), জিপসাম (gypsum), ডলোমাইট (dolomite), সৈন্ধব লবণ (rock salt) প্রভৃতি এই জাতীয় শিলা।

(গ) রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত শিলা

কতক আগ্নেয় ও পাললিক শিলা যখন ভূপৃষ্ঠের নীচে ছিল সেই অবস্থায় অতি দীর্ঘকাল যাবৎ তাহাদের **রাসায়নিক পরিবর্তন** হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। প্রবল ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা ভূগর্ভে প্রবল ভূ-আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে এরূপ পরিবর্তন হয়। আশপাশের নানা জিনিসের প্রবল

৩১নং চিত্র—কোয়ার্ৎজ-এর বিভিন্ন অংশ।

৩২নং চিত্র—রূপান্তরিত শিলা নীস।

চাপ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলেও এসকল শিলার আগেকার রূপ, অবস্থা প্রভৃতির পরিবর্তন হইতেছে। ফলে, এসকল শিলা ধীরে ধীরে অন্য রূপ ধারণ করিতেছে। এভাবে পরিবর্তিত শিলাকে বলা হয় **পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত শিলা** (metamorphic rocks)। যেমন, পাললিক শিলা বেলেপাথর হইতে সৃষ্টি হয় **কোয়ার্ৎজাইট** (৩১নং চিত্র), চুনাপাথর হইতে সৃষ্টি হয় **মর্মর পাথর** (marble), কর্দম ও কাদাপাথর হইতে সৃষ্টি হয় **শ্লেট** (slate)। আর আগ্নেয়শিলা গ্র্যানাইট হইতে সৃষ্টি হয় **নীস** (gneiss) (৩২নং চিত্র)।

বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ
(Different types of landform or terrain)

আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি হয় জ্বলন্ত গ্যাসীয় পদার্থ রূপে। তখন হইতে কোটি কোটি বৎসর যাবৎ ইহা তাপ বিকিরণ করিয়া ধীরে ধীরে শীতল হইয়াছে। এখন ইহার উপরিভাগ শীতল, কিন্তু মধ্যভাগ প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত। স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রাচীনকালে পৃথিবীর যে রূপ ছিল ক্রমশঃ তাহার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং এখনও ঘটিতেছে। তবে প্রাচীন আঙ্গারাল্যাণ্ড, গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড প্রভৃতি অতি বৃহৎ ভূভাগের কতক অংশকে স্পষ্ট চিনা যায়। ঐ সকল প্রাচীন ভূখণ্ডসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে **ভূমিরূপের** (terrain) নানা বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভূপৃষ্ঠের এসকল বৈচিত্র্য সাধারণভাবে **তিন ভাগে** বিভক্ত ঃ—(ক) **পাহাড়, পর্বত** প্রভৃতি উচ্চভূমি, (খ) সামান্য উচ্চভূমি (সিল্ড) ও **মালভূমি** এবং (গ) **সমভূমি**। ইহাদের মধ্যে পাহাড়, পর্বত ও উচ্চ মালভূমির মোট আয়তন ভূপৃষ্ঠের প্রায় ২৮%, নিম্ন মালভূমি ও সিল্ডের আয়তন প্রায় ১৮% এবং সমভূমির আয়তন ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৫৪%। এই সমভূমিতেই বাস করে পৃথিবীর ৮৫-৯০% মানুষ।

(ক) পাহাড়, পর্বত

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছোট, বড় বহু পাহাড়, পর্বত আছে। ভূপৃষ্ঠের যে সকল অংশ ৯০০ মিঃ-র অধিক উচ্চ ও বহুদূর বিস্তৃত তাহাদিগকে বলে **পর্বত**।
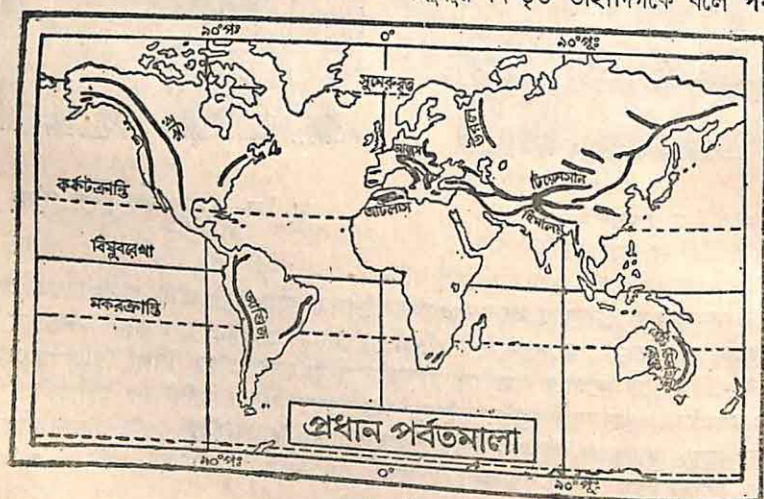
৩৪নং চিত্র।

যেমন, হিমালয়, আন্দিজ, রকি, আল্পস প্রভৃতি। তাহাদের তুলনায় নীচু এবং অল্প-দূর বিস্তৃত অংশগুলিকে বলে পাহাড়। যেমন, এই রাজ্যের বিহারীনাথ, শুশুনিয়া প্রভৃতি। বিভিন্ন পাহাড়, পর্বতের মধ্যে উৎপত্তি (origin) ও গঠন (structure) সম্পর্কে পার্থক্য বিস্তর। তদনুসারে পাহাড়, পর্বত নিম্নলিখিত **চারিভাগে** বিভক্ত।

(১) ভঙ্গিল পর্বত

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের **হিমালয়, আল্পস, আন্দিজ, রকি** প্রভৃতি পর্বত বর্তমানে উচ্চতা, দৈর্ঘ্য ও আয়তন হিসাবে সর্বপ্রধান। অথচ তাহাদের **সৃষ্টির** পূর্বে ঐ সকল স্থানে ছিল **অগভীর সমুদ্র** বা মহীখাত বা অতিগভীর ও দীর্ঘ খাত (geosyncline)। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া তথায় **স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়াছে পলি** (silt or alluvium)। স্তরগুলির গভীরতা বহু হাজার মিটার। এগুলি ক্রমশঃ কঠিন হইয়া **পাললিক শিলাতে** পরিণত হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল ভূগর্ভেও মাঝে মাঝে গঠনিক সংক্ষোভ বা প্রবল ভূআন্দোলন (tectonic movements) হইয়াছে। ঐ সময় প্রচণ্ড অনুভূমিক চাপের (horizontal pressure) সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের প্রভাবে এসকল পাললিক শিলা অঞ্চলে ক্রমাগত সংনমন (compression) ও টানের (tension) সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের প্রভাবে পৃথিবীর উত্তপ্ত মধ্যভাগের উপাদানসমূহ যে হারে সঙ্কুচিত হইয়াছে ও হইতেছে, শীতল ভূপৃষ্ঠ তাহার তুলনায় অনেক কম হারে সঙ্কুচিত হয়। এজন্য **ভূপৃষ্ঠস্থ শিলাতে চাপের** পরিমাণ অধিক। প্রবল পার্শ্বচাপের ফলে এখানকার কোমল পাললিক শিলা স্তরে অসংখ্য **ভাঁজের** (fold) **সৃষ্টি** হইয়াছে। একারণে এসকল অঞ্চলের ক্রমাগত উচ্চতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং পরিশেষে **ভঙ্গিল পর্বতের** (Fold mountain) সৃষ্টি হইয়াছে (৩৩নং চিত্র)। ইহাদের **সৃষ্টি** বা গঠন সম্পর্কে **মহাদেশসমূহের** বা বিরাট ভূভাগের **স্থান পরিবর্তনের** (continental drift) প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। এসকল অঞ্চলের উপরিলিখিত যাবতীয় ভূ-আন্দোলনকে বলা হয় **গিরিজনি আন্দোলন** (diastrophic, specially orogenic movement) বা পর্বত সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক ভূ-আন্দোলন। উপরিলিখিত অবস্থার ফলে এসকল অঞ্চলই (orogenic belts) **ভঙ্গিল পর্বত** সৃষ্টির পক্ষে **সর্বাপেক্ষা** অধিক **সুবিধাজনক**। এজন্যই ইওরোপের দক্ষিণপশ্চিম অংশ ও ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্বদিকে মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণপূর্ব অংশ পর্যন্ত যেখানে অতীতকালে বিস্তৃত ছিল বৃহৎ টেথিস সাগর, তথায় এখন বিস্তৃত রহিয়াছে পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বত অঞ্চল। ইহা **আল্পস-হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল** (Alpine-Himalayan system) নামে পরিচিত (৩৪নং চিত্র)। ভঙ্গিল পর্বতের অপর প্রধান
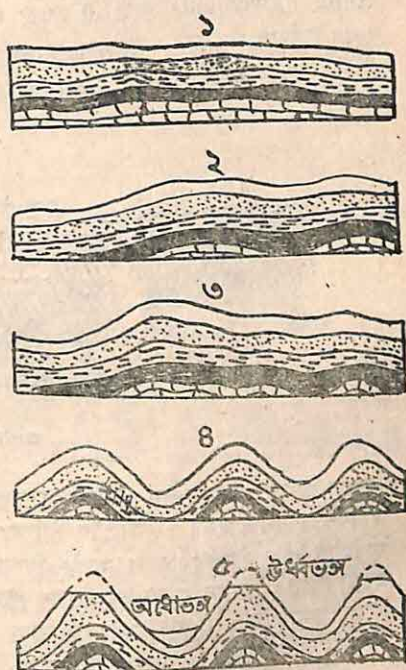
৩৩নং চিত্র—ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থা।

শ্রেণী **প্রশান্ত মহাসাগরকে বেষ্টন** করিয়া আছে (Circum-Pacific system)। উত্তর আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ, অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ প্রভৃতি ভঙ্গিল পর্বত এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

যে-কোন ভঙ্গিল পর্বতে স্পষ্ট দেখা যায় সমুদ্রের তরঙ্গের মত উঁচু-নীচু ভাঁজ। এসকল ভাঁজের **উত্তল** (convex) বা উঁচু অংশকে বলে **ঊর্ধ্বভঙ্গ** (anticline or upfold)। এগুলিই সাধারণতঃ **পর্বতশৃঙ্গ** বা **শিখর** (peak)। আর ভাঁজের **অবতল** (concave) বা নীচু অংশকে বলে **অধঃভঙ্গ** বা **অবতলভঙ্গ** (syncline or down-fold)। এগুলিই সাধারণতঃ **উপত্যকা** (valley)। হিমালয় পর্বত অঞ্চলের কাশ্মীর উপত্যকার জলবায়ু চমৎকার ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। এজন্য ইহা ভূস্বর্গ নামে পরিচিত। এপ্রকার বিভিন্ন পর্বতশৃঙ্গ ও উপত্যকার গায়ে আছে অসংখ্য স্বাস্থ্যনিবাস (hill station)।

(২) স্তূপ পর্বত

ভূত্বকের ও তাহার নীচের কতক অংশ কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত। এসকল স্থানে **গঠনিক সংক্ষোভ** বা প্রবল ভূআন্দোলনের প্রভাবে খাড়া ও হেলান বহু **চ্যুতি** বা **স্রংস** (fault) সৃষ্টি হয়। বারে বারে গঠনিক সংক্ষোভ বা প্রবল ভূআন্দোলনের (tec-tonic movement) ফলে ঐ সকল স্থানে চির বা ফাটলের সৃষ্টি হয়। কখন কখন বিভিন্ন ফাটলের মাঝখানের অংশগুলি ভাঙ্গিয়া ছোট-বড় টুকরাতেও (blocks) বিভক্ত হয়। ফলে, এসকল অঞ্চল ক্রমশঃ অধিক দুর্বল হইয়া পড়ে। এরূপ দুর্বল

৩৫নং চিত্র।

অঞ্চলে প্রবল ভূআন্দোলন ও ভূমিকম্পের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের আরও অধিক পরিবর্তন ও বিস্তর ক্ষতি হয়। এজাতীয় বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফলে ভূত্বকের ঐ সকল চ্যুতির ও ফাটলের এক দিকের অংশ অপর দিকের অংশ হইতে প্রায়ই বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ হইয়া পড়ে। কখন কখন এক পাশে **খাড়া** চালের মত অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহাকে বলে ভৃগুচ্যুতি (fault escarpment or scarp)। হিমালয়ের দক্ষিণ অংশে শিবালিক পাহাড়ে ও মেঘালয়ের গারো পাহাড়ে এরূপ অবস্থা দেখা যায়। কখন কখন এরূপ চ্যুতি ডান বা বাম, যে-কোন এক দিকে হেলিয়া বা বাঁকিয়া যাইতে পারে (inclination)। এপ্রকার কতক অংশ নীচের দিকে **ধসিয়া** বা নামিয়াও যাইতে পারে। তাহাকে **স্বাভাবিক** বা **অনুলোম চ্যুতি** (normal fault) বলে।

অত্যধিক সংনমনের (compression) ফলে চ্যুতির ডান বা বামদিকের শিলা **বিপরীত দিকেও** ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে। এরূপ অবস্থা **বিপরীত** বা **বিলোম** চ্যুতি (reverse fault) নামে পরিচিত। কখন কখন পাশাপাশি অংশ অসমানভাবে কাৎ বা হেলান ও উঁচু-নীচু (warping or tilting) হইতে পারে। এভাবে প্রবল ভূ-আন্দোলনের বা গঠনিক সংক্ষোভের ফলে ভূত্বকের কতক অংশ আশপাশের জায়গার তুলনায় যথেষ্ট উঁচু হইয়া **পাহাড়, পর্বতের** আকারও ধারণ করিতে পারে। ইহাদিগকে বলে **স্তূপ পর্বত** বা **চ্যুতি পর্বত** (Block or Fault mountain or horst) (৩৫নং চিত্র)। দক্ষিণাত্যের **নীলগিরি, আন্নামালাই,** পঞ্জাবের **সল্ট রেঞ্জ** প্রভৃতি এই জাতীয় পর্বত।

অপরদিকে গঠনিক সংক্ষোভের ফলে ভূত্বকের কতক অংশ **নীচের দিকে বসিয়া** বা ধসিয়া যাইতে পারে। তখন আশপাশের জায়গার তুলনায় এসকল স্থান নিম্ন-ভূমিতে পরিণত হইতে পারে। এভাবে কতক **উপত্যকারও সৃষ্টি** হইতে পারে। ইহাদিগকে বলে **গ্রস্ত উপত্যকা** (Rift valley)। ইহাদের মধ্য দিয়া নদীও বহিয়া যাইতে পারে। নর্মদা ও তাপী সম্ভবতঃ এরূপ উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। তবে **আফ্রিকার** মধ্য ভাগ হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত **গ্রস্ত উপত্যকা** অঞ্চল, পশ্চিম এশিয়ার **জর্ডন উপত্যকা** প্রভৃতি অধিক বিখ্যাত।

(৩) সঞ্চয়জাত পর্বত

ভূপৃষ্ঠ শীতল। তাহার তুলনায় পৃথিবীর **মধ্য ভাগে** অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে উত্তাপ ক্রমশঃ অত্যন্ত বেশী। তাহার ফলে পৃথিবীর মধ্যভাগের অনেক উপাদান অত্যন্ত উত্তপ্ত ও **প্রায় গলন্ত** অবস্থায় আছে। ভূগর্ভস্থ তীব্র উত্তপ্ত ও গলন্ত উপাদানের (magma) কতক অংশ পৃথিবীর অভ্যন্তরের ছিদ্র, চির, ফাটল (hole or vent, fault, crack) প্রভৃতি দুর্বল অংশের মধ্য দিয়া লাভা রূপে ভূত্বকের দিকে প্রবাহিত হয়। এই লাভা কখন কখন ভূগর্ভস্থ ধূম, ভস্ম প্রভৃতির সহিত **ভূপৃষ্ঠে** উৎক্ষিপ্ত হয়। ভূপৃষ্ঠের উপর এই লাভা প্রবাহ বহু দূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। তবে তাহা যে স্থান দিয়া নির্গত হয় তাহার চারি পাশেই
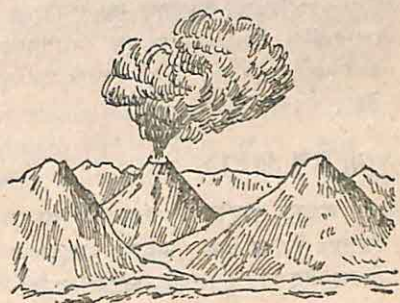
৩৬নং চিত্র—জীবন্ত ও সুপ্ত আগ্নেয়গিরি।

ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়। ক্রমে ক্রমে অধিক সঞ্চয়ের ফলে ঐ **সঞ্চিত** পদার্থ অধিক উঁচু হয় ও কালক্রমে শীতল হয়। তখন তাহার **আকৃতি** হয় **পাহাড়, পর্বতের মত**। এগুলিই **সঞ্চয়জাত পর্বত** (Mountain of accemulation) বা **আগ্নেয় পর্বত** (volcano or volcanic mountain) নামে পরিচিত। জাপানের **ফুজিয়ামা** বা ফুজিসান, ইটালির **বিসুভিয়াস** প্রভৃতি এই জাতীয় পর্বত। ইহাদের মধ্য হইতে যে অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহার অবস্থা এক রকম নয়। এসম্বন্ধে পার্থক্য প্রচুর। তদনুসারে এসকল পর্বত জীবন্ত, সুপ্ত ও মৃত—এরূপ ভাগে বিভক্ত (৩৬নং

চিত্র)। জীবন্ত আগ্নেয়গিরি হইতে যে কোন সময়ে অগ্ন্যুৎপাত হইতে পারে। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি হইতে বহুদিন অগ্ন্যুৎপাত হয় নাই। আর মৃত আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাতের কোন ভয় নাই। তবে সুপ্ত আগ্নেয় পর্বত কবে জীবন্ত হইবে সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া দেশের নেভাদো দেল রুইজ আগ্নেয় পর্বত প্রায় ৪০০ বৎসর সুপ্ত থাকার পর ১৯৮৫ খ্রীঃ জীবন্ত হইয়াছে। ঐ বৎসরের অগ্ন্যুৎপাতে ২২,০০০-এর বেশী মানুষের মৃত্যু হইয়াছে। আগ্নেয় পর্বতের সর্বপ্রধান অঞ্চল প্রশান্ত মহাসাগরকে যেন ঘিরিয়া আছে। তাহাকে বলা হয় **প্রশান্ত মহাসাগরের আগ্নেয় মেখলা** (Fiery ring of the Pacific)।

(৪) নগ্নীভূত বা ক্ষয়জাত পর্বত

বৃষ্টিপাত, নদী, হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে **ভূপৃষ্ঠের ক্রমাগত ক্ষয়কার্য বা ক্ষয়ীভবন** (erosion) চলিতেছে। কঠিন শিলার তুলনায় কোমল শিলার ক্ষয়ীভবন স্বভাবতঃ অধিক। এজন্য কোথাও দেখা যায় অতি দীর্ঘকাল পরে বা ক্ষয়ীভবনের বার্ধক্য বা পরিণত অবস্থায় কঠিন শিলা-দ্বারা গঠিত কতক স্থান আশ-পাশের ক্ষয়প্রাপ্ত স্থানসমূহের তুলনায় বেশ উঁচু অবস্থায় অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। এপ্রকার যে সকল অংশ পাহাড়, পর্বতের মত উঁচু তাহাদিগকে **ক্ষয়জাত বা নগ্নীভূত পাহাড়, পর্বত** (Erosional or residual or relict mountain or Mountain of erosion) বলে (৩৭নং চিত্র)। আরাবল্লী, পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বত, পরেশনাথ পাহাড় প্রভৃতি ক্ষয়জাত পর্বতের উদাহরণ।
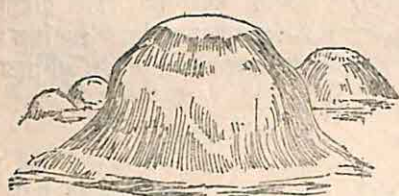
৩৭নং চিত্র—নগ্নীভূত বা ক্ষয়জাত পর্বত।

পর্বতের প্রভাব

পাহাড়, পর্বতের পাদদেশ হইতে ক্রমশঃ উপর দিকে উষ্ণতা হ্রাস পায়। আবার ইহাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি সম্পর্কে পার্থক্য বিস্তর। যেমন, ইহাদের প্রতিবাত পার্শ্বে বৃষ্টি অধিক, অনুবাত পার্শ্বে বৃষ্টি কম ইত্যাদি। এজন্য পাহাড়, পর্বতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে স্বাভাবিক উদ্ভিদ্, কৃষিকার্য, পশু-পালন প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্য খুব বেশী। তারপর উচ্চ পর্বতের বৃষ্টির জল ও বরফগলা জল বহু নদীর উৎস। পাহাড়, পর্বতের নদীর, বিশেষতঃ জলপ্রপাতের, প্রবল জলস্রোতের সাহায্যে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। তারপর ঐ জলের সাহায্যে পর্বতের নিম্ন অংশে উপত্যকাতে ও পর্বতের পাদদেশে কিছু কিছু সেচকার্য হয়। কতক স্থানে নদীতে বাঁধ দিয়া জলাধারে জল সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। তারপর ঐ জলকে খালের মধ্য দিয়া নিয়া সমভূমিতে সেচকার্য ও মালপত্র পরিবহনের ব্যবস্থা হয়। পার্বত্য অঞ্চল বৃহৎ শিল্প ও কৃষিদ্বারা জীবিকা অর্জন, যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়ে অসুবিধাজনক। এজন্য তথায় লোকবসতি কম। তবে এসকল স্থানে পশু-পালন, ক্ষুদ্র শিল্প প্রভৃতির সুযোগ প্রচুর। তাহাছাড়া তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

অতি মনোরম এবং জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। ফলে, তথাকার কতক সুবিধাজনক স্থানে আছে সুন্দর শৈলনিবাস।

(খ) সমোচ্চ ভূমি বা মালভূমি

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আছে অনেক মালভূমি। ইহাদের ঢাল সাধারণতঃ বেশ খাড়া, কিন্তু উপরিভাগের বন্ধুরতা বা অসমতা বেশী নয়। কতক মালভূমির উচ্চতা কম অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬০০ মিঃ-এর মধ্যে। ইহাদিগকে বলা হয় নিম্ন মালভূমি। কতক মালভূমি মধ্যম উঁচু, আবার কতক যথেষ্ট উঁচু (১০০০ মিঃ-র অধিক উচ্চ)। পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমিসমূহের মধ্যে তিব্বত আয়তনে বৃহত্তম। ইহার পশ্চিমে অর্থাৎ জম্মু ও কাশ্মীরের ঠিক উত্তরে অবস্থিত **পামির পৃথিবীর** উচ্চতম মালভূমি। তাহা **'পৃথিবীর ছাদ'** (Roof of the world) নামে পরিচিত।

উৎপত্তি ও অবস্থিতি সম্পর্কে পার্থক্য বশতঃ মালভূমি নানাভাগে বিভক্তঃ

(১) পর্বতবেষ্টিত মালভূমি

গঠনিক সংক্ষোভ বা প্রবল ভূ-আন্দোলনের ফলে পাহাড়, **পর্বত সৃষ্টির সময়** তাহাদের মাঝখানের বা পাশের কতক স্থান যথেষ্ট উঁচু হইয়া কতক **মালভূমির সৃষ্টি** হয়। **মধ্য-এশিয়াতে** এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম অংশের উচ্চ পর্বত অঞ্চলে এপ্রকার মালভূমি (Intermontane or Intermont plateau) বেশী। ইহাদের মধ্যে কতক **পর্বতদ্বারা বেষ্টিত** ও কতক **পর্বতের পাদদেশে** অবস্থিত। তাহাছাড়া গঠনিক সংক্ষোভের ফলে ভূপৃষ্ঠে যে সকল **চ্যুতি, ফাটল** সৃষ্টি হয়,, তাহাদের **মাঝখানের** কতক অংশও পরবর্তী প্রবল ভূ-আন্দোলনে বা গঠনিক সংক্ষোভের ফলে উঁচু **হইয়া মালভূমি** সৃষ্টি হইতে পারে। এশিয়ার তিব্বত ও ইরান মালভূমি, ফ্রান্সের সেন্ট্রাল মাসিফ প্রভৃতি এপ্রকার পর্বতবেষ্টিত মালভূমি।

(২) লাভা মালভূমি

ভূগর্ভের উত্তপ্ত **লাভাপ্রবাহ** চির, ফাটল প্রভৃতির মধ্য দিয়া উপর দিকে আসিবার সময় কখন কখন **ভূত্বকের নীচে** প্রচুর পরিমাণে **সঞ্চিত** হইতে পারে। ফলে, ঐ অঞ্চলের উচ্চতা বৃদ্ধি হইয়া **মালভূমি সৃষ্টি** হইতে পারে। আবার অগ্ন্যুৎপাতের সময়, কখনও বা অগ্ন্যুৎপাত ছাড়াই ভূগর্ভস্থ লাভা বিভিন্ন চির, ফাটল প্রভৃতির মধ্য দিয়া **ভূপৃষ্ঠে** পৌঁছিয়া আশপাশের **নিম্ন অংশে** প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইতে পারে। এভাবেও মালভূমি সৃষ্টি হয়। ইহাদিগকে বলে **লাভা মালভূমি** (Lava plateau)। দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর-পশ্চিম অংশ **লাভা মালভূমির** বিখ্যাত উদাহরণ। এপ্রকার মালভূমির উপরিভাগ লাভা হইতে উৎপন্ন কৃষ্ণ মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত। ফলে, এই মালভূমি **কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল** (Black soil region) নামেও পরিচিত।

(৩) ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি

পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূখন্ড আঙ্গারাল্যান্ড ও গন্ডোয়ানাল্যান্ডের বিভিন্ন অংশ কোটি কোটি বৎসর ক্ষয়ীভবনের পরেও বিস্তীর্ণ মালভূমিরূপে বিরাজ করিতেছে। ইহাদিগকে মহাদেশীয় মালভূমি বলে। আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অংশ, **আরব, দাক্ষিণাত্য** প্রভৃতি নিম্ন মালভূমি এপ্রকার **মহাদেশীয় মালভূমির** (Continental plateau)

উদাহরণ। ইহাদের তুলনায় অ্যান্টার্কটিকা উচ্চ মালভূমি, ব্রেজিলের পূর্ব অংশও উচ্চভূমি (Brazilian highland)। আরও দীর্ঘকাল ক্ষয়কার্যের ফলে বিভিন্ন মালভূমির অপেক্ষাকৃত **কোমল অংশের অধিক** ক্ষয় বা ক্ষয়ীভবন হয়। ফলে, **কঠিন অংশগুলি** কখন কখন প্রায় **বিচ্ছিন্ন** বা পৃথক্ হইয়া পড়ে। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক রাজ্যের অন্তর্গত মলনাদ ও বিহারের ছোটনাগপুরের কতক অংশ **ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমির** (dissected plateau) উদাহরণ। ছোটনাগপুরের পরেশনাথ পাহাড় তথাকার অন্যান্য অংশ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন। অত্যধিক ক্ষয়ীভবনের ফলে এরূপ কতক উচ্চ অংশের বা পাহাড়ের আকৃতি হয় **প্রায় গোল**। ইহাদিগকে বলা হয় **মোনাডনক** (monadnock)। ছোটনাগপুর মালভূমিতে ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বিভিন্ন মালভূমির কতক অংশ আরও ক্ষয়কার্যের ফলে **সমপ্রায় ভূমিতে বা প্রায় সমভূমিতে** (Peneplane) পরিণত হয়। মধ্যভারত, ছোটনাগপুর, মেঘালয় প্রভৃতি মালভূমিতে এরূপ অবস্থা দেখা যায়।

মালভূমির প্রভাব

উচ্চ মালভূমির জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। তবে তাহার প্রতিবাত পার্শ্বে বৃষ্টি প্রচুর, কিন্তু অনুবাত পার্শ্ব (leeward side) প্রায় বৃষ্টিহীন। যে সকল মালভূমি পর্বত দ্বারা বেষ্টিত সেগুলিও প্রায় বৃষ্টিহীন বা মরুপ্রায়। জীবিকা অর্জন এবং যাতায়াত সম্পর্কেও মালভূমি অসুবিধাজনক। এজন্য মালভূমিতে লোকবসতি কম। তবে কতক মালভূমিতে বা তাহাদের কতক অংশে সেচের সাহায্যে কৃষিকার্য উন্নত। দাক্ষিণাত্য মালভূমির কতক অংশে সেচের সাহায্যে প্রচুর গম, কার্পাস, আখ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। আবার কতক মালভূমিতে প্রচুর খনিজ সম্পদ্ পাওয়া যায়। এরূপ কতক স্থানে ঐ সকল খনিজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল শিল্প উন্নত। এজন্য এসকল স্থানে লোকবসতিও অধিক। ছোটনাগপুর মালভূমি ইহার উদাহরণ।

(গ) সমভূমি

ভূপৃষ্ঠের অর্ধেকের অধিক সমভূমি। তাহার প্রায় অর্ধেক প্রকৃত সমভূমি (true plain)। এখানকার উচ্চতা ০-২০০ মিঃ। বিভিন্ন সমভূমির মধ্যে উৎপত্তি ও অবস্থিতি সম্বন্ধে পার্থক্য প্রচুর। তদনুসারে সমভূমি নানা ভাগে বিভক্ত। তবে অনেক সমভূমিই একাধিক কারণে সৃষ্টি হইয়াছে। এজন্য একই সমভূমি বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

(১) মহাদেশীয় বা গঠনিক সমভূমি

পৃথিবীর অতিপ্রাচীন ভূখণ্ড আঙ্গারাল্যান্ড ও গণ্ডোয়ানাল্যান্ডের বিভিন্ন অংশ বিস্তীর্ণ প্রায়-সমভূমিরূপে বিরাজমান। ইহাদের কতক অংশ আদি কাল হইতে প্রায় অপরিবর্তিত ভাবে বিভিন্ন মহাদেশের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়িয়া অবস্থিত। ইহাদিগকে **মহাদেশীয় সমভূমি** (continental block or shield) বা **অনড় ভূভাগ** (rigid mass or ancient nuclei or major block) অথবা **গঠনিক সমভূমি** (structural plain) বলা হয়। **ক্যানাডিয়ান শিল্ড, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগের সমভূমি, সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ সমভূমি** (Siberian shield or platform) ইহার উদাহরণ। এগুলি দীর্ঘদিনের ক্ষয়প্রাপ্ত অঞ্চল। এসকল স্থানে ক্ষয়ীভবনের বহু চিহ্ন সুস্পষ্ট।

(২) সঞ্চয়জাত বা অবক্ষিপ্ত সমভূমি

মহাদেশসমূহের বিভিন্ন অংশ হইতে ক্ষয়প্রাপ্ত নানা জিনিস কাঁকর, বালুকা, কর্দম, মৃত্তিকা প্রভৃতি রূপে বৃষ্টিপাত, হিমবাহ, নদী, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি দ্বারা প্রবাহিত হয়। এই সময় তাহাদের কতক অংশ ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের নিম্নভূমিতে ও হ্রদ, জলাভূমি প্রভৃতিতে সঞ্চিত হয়। আর কতক অংশ সমুদ্রে পৌঁছিয়া তথায় ক্রমাগত সঞ্চিত হয়। এসকল উপাদান যেখানেই **দীর্ঘকাল যাবৎ সঞ্চিত** হইতেছে সেখানেই ক্রমশঃ উঁচু হইতেছে। তার উপর **গঠনিক সংক্ষোভ** বা প্রবল ভূ-আন্দোলনের ফলে ইহাদের **উচ্চতা** আরও বৃদ্ধি হইতেছে। এভাবে বিভিন্ন স্থানে অনেক **সমভূমি সৃষ্টি** হইতেছে। এরূপ সমভূমির মধ্যে তাহাদের সৃষ্টির স্থান, সৃষ্টি বা গঠনের পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে পার্থক্য খুব বেশী। তদনুসারে এরূপ সমভূমি নানা ভাগে বিভক্ত। প্রধানতঃ **সৃষ্টির অঞ্চল** হিসাবে সমভূমির নামকরণ হয়। যেমন, **উপকূল সমভূমি, হ্রদ সমভূমি** প্রভৃতি।

৩৮নং চিত্র—সমুদ্রের তলদেশে উপকূল হইতে ক্রমশঃ দূরে সঞ্চয়ের অবস্থা।

উপকূল সমভূমি (Coastal plains)—মহাদেশসমূহের ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানগুলি নদী, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি দ্বারা প্রবাহিত হইয়া **উপকূলের পাশে অগভীর সমুদ্রে** দীর্ঘকাল যাবৎ **সঞ্চিত** হয়। এভাবে ক্রমাগত সঞ্চয়ের ফলে (৩৮নং চিত্র) এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে গঠনিক সংক্ষোভ বা প্রবল ভূ-আন্দোলনের ফলে এগুলি ক্রমশঃ উঁচু হয়। কালক্রমে এসকল স্থানে সমভূমি সৃষ্টি হয়। এসকল স্থান **প্রথমে বিচ্ছিন্ন** বা আলাদা ভাবে থাকে। তখন ইহাদিগকে চর, দ্বীপ প্রভৃতি বলা হয়। কালক্রমে এগুলি মহাদেশসমূহের নিকটবর্তী অংশের সহিত যুক্ত হইয়া **মহাদেশের অংশরূপে** পরিণত হয়। ভারতের পূর্ব উপকূলের নিকট এভাবে সমভূমির সৃষ্টির সুযোগ বেশী। ফলে, তথাকার সমভূমি পশ্চিম উপকূলের সমভূমির চেয়ে অধিক প্রশস্ত। উত্তর আমেরিকা, ইওরোপ ও এশিয়ার উত্তর উপকূলের সমভূমি আরও বেশী প্রশস্ত। উপকূল সমভূমি সৃষ্টি সম্পর্কে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তথায় ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানের প্রচুর পরিমাণে অগভীর সমুদ্রে অনবরত সঞ্চিত হওয়ার সুযোগ আবশ্যক। তাহাছাড়া ভূগর্ভে প্রবল ভূআন্দোলনের ফলে ঐ সকল সঞ্চিত পদার্থের উচ্চতা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। কাজেই এই জাতীয় উপকূলকে **উন্নত উপকূল** (emerged coast) বলে। অপর দিকে প্রবল ভূ-আন্দোলনের ফলে উপকূলের কতক অংশ ধ্বসিয়া বা নীচু হইয়া গেলে যে অবস্থা হয় তাহাকে **নিমজ্জিত উপকূল** (submerged coast) বলে। গুজরাট ও কেরালার উপকূলের কতক অংশ এপ্রকার নিমজ্জিত উপকূল। (গঠন ও আকৃতির পার্থক্য অনুসারে উপকূল অন্য প্রকার ভাগেও বিভক্ত হইতে পারে। যেমন, রিয়া উপকূল, ডালমেসিয়ান উপকূল, ফিয়র্ড উপকূল ইত্যাদি।)

মহাদেশসমূহের ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদান নদী, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা প্রবাহিত হওয়ার সময় সমুদ্রে পৌঁছিবার পূর্বে কখন কখন মহাদেশের মধ্যে কোন হ্রদে দীর্ঘকাল ধরিয়া সঞ্চিত হইতে পারে। গঠনিক সংক্ষোভের প্রভাবে তাহা আরও

উঁচু হইয়াও কতক সমভূমির সৃষ্টি হয়। তাহাকে **হ্রদ সমভূমি** (Lacustrine or lake plain) বলে। জম্মু ও কাশ্মীরের বিতস্তা নদীর উপত্যকার হ্রদ অঞ্চলে ও মণিপুরের ইম্ফল অববাহিকাতে এরূপ কতক হ্রদ সমভূমি আছে।

তাহাছাড়া পাহাড়, পর্বতের ক্ষয়ীভূত উপাদান অনেক ক্ষেত্রে ঐ সকল পাহাড়, পর্বতের পাদদেশে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়। ইহার ফলে তথাকার উচ্চতা বৃদ্ধি হয় ও তথায় **উন্নত সমভূমি** (Piedmont plain) সৃষ্টি হয়। হিমালয়ের পাদদেশে এরূপ সমভূমি সুস্পষ্ট।

যে সকল শক্তি দ্বারা বা কারণ বশতঃ সমভূমি গঠিত হয় তাহাদের প্রাধান্য অনুসারে কতক সমভূমির নামকরণ হয়। যেমন, **নদীগঠিত সমভূমি**—নদীর জলস্রোতের সহিত কাঁকর, বালুকা, পলি প্রভৃতি প্রচুর উপাদান প্রবাহিত হয়। তাহাদের বৃহৎ অংশ **নদীর মধ্য ও নিম্ন গতিতে উপত্যকার** বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিম্নভূমিতে ক্রমাগত সঞ্চিত হয়। **বন্যার সময়** এরূপ সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। প্রবল ভূ-আন্দোলনের প্রভাবে ইহারও উচ্চতা বৃদ্ধি হয়। ঐ নিম্ন অঞ্চলে এভাবে যে সমভূমি সৃষ্টি হয় তাহাকে **বন্যাগঠিত সমভূমি** বা **প্লাবন ভূমি** (flood plain) বলে। **পলি সঞ্চয়ের** ফলে গঠিত বলিয়া এপ্রকার সমভূমিকে **পাললিক সমভূমিও** (alluvial plain) বলা হয়। উত্তর ভারতে গঙ্গার উপত্যকা অঞ্চলের সমভূমি **গঙ্গা-সমভূমি** বা **গাঙ্গেয় সমভূমি** নামে বিখ্যাত। নদীর জলের সহিত যে সকল উপাদান প্রবাহিত হয় তাহাদের কতক অংশ নদীর উপত্যকার আরও নিম্ন অংশে অর্থাৎ মোহনাতে শান্ত সমুদ্রে ক্রমাগত সঞ্চিত হয়। এভাবে ক্রমাগত **সঞ্চয়ের** ফলে এবং প্রবল ভূ-আন্দোলনের দরুন উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে তথায় **ব-দ্বীপ** (delta) **সৃষ্টি** হয়। ঐ অঞ্চলে উপরিলিখিত ভাবে পলি ক্রমাগত সঞ্চয়ের ও তাহার উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বিস্তীর্ণ **ব-দ্বীপ সমভূমি** (deltaic plain) গঠিত হয়। **গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ** সমভূমি পৃথিবী-বিখ্যাত। তবে নদীর মোহনা অত্যন্ত গভীর হইলে বা তথায় নদীর স্রোত খুব প্রবল হইলে অথবা তথায় সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটার প্রভাব খুব বেশী হইলে বা সমুদ্রস্রোত প্রবল হইলে ব-দ্বীপ সৃষ্টি হইতে পারে না। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন, আফ্রিকার কঙ্গো বা জায়রে নদীর মোহনাতে এজন্যই বড় ব-দ্বীপ নাই।

অপরদিকে অতি উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল, মেরু অঞ্চল ও তাহার আশপাশের ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদান প্রধানতঃ **হিমবাহের** সহিত প্রবাহিত হয়। ঐ সকল জিনিস পার্বত্য অঞ্চলে উপত্যকার নিম্নভূমিতে **সঞ্চিত** হয়। তথায় প্রবল ভূ-আন্দোলনের প্রভাবে এগুলি উঁচু হয়। এভাবে সমভূমি সৃষ্টি হয়। তাহাকে **হিমবাহ-সমভূমি** (glacial plain) বলে। অবশ্য হিমবাহের সহিত প্রবাহিত উপাদানসমূহের তাহাদের প্রবাহের অঞ্চলের আশপাশের সহিত অনবরত ঘর্ষণ হয়। এপ্রকার ঘর্ষণের প্রভাবে প্রচুর ক্ষয়ীভবনও হয়। এই অবস্থাও হিমবাহ-সমভূমি সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক। কাশ্মীরের লাডাকে এরূপ সমভূমি দেখা যায়। তবে এশিয়া, ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকার উত্তর অংশে হিমবাহ-সমভূমি অধিক বিস্তৃত।

ভূপৃষ্ঠের কতক দুর্বল অংশে চির, ফাটল প্রভৃতির মধ্য দিয়া ভূগর্ভের **লাভা-প্রবাহ** কখন কখন **ঊর্ধ্বদিকে উৎক্ষিপ্ত** হয়। এসকল উৎক্ষিপ্ত পদার্থ আশপাশে **ভূপৃষ্ঠের নিম্ন অংশে** প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়। এভাবে কালক্রমে সৃষ্টি হয়

লাভা-সমভূমি (Lava plain)। গুজরাটের কঙ্কন উপকূলের কতক অংশ লাভা-সমভূমি।

বায়ুপ্রবাহ দ্বারাও সমভূমি সৃষ্টির পক্ষে সহায়তা হয়। যেমন, মধ্য-এশিয়ার গোবি মরুভূমির সূক্ষ্ম বালুকা বা 'লোয়েস' প্রধানতঃ পশ্চিমা বায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইয়া পূর্বদিকে চীনের হোয়াং হো নদীর উপত্যকাতে ক্রমাগত সঞ্চিত হইয়াছে। এভাবে ক্রমাগত সঞ্চয়ের ফলে তথায় উন্নত সমভূমি বা নিম্ন মালভূমি সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাই **লোয়েস (Loess) সমভূমি** নামে বিখ্যাত।

সৃষ্টির পদ্ধতি অনুসারেও সমভূমির নামকরণ হয়। যেমন, **ক্ষয়ীভূত সমভূমি** বা **প্রায়-সমভূমি** বা **সমপ্রায় ভূমি**—ভূপৃষ্ঠের কতক উঁচু জায়গাতে যে সকল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদ্বারা বুঝা যায় তথায় **বারে বারে ক্ষয়ীভবন** হইয়াছে। তাহাদের মাঝখানে কখন কখন সামান্য **উন্নয়ন** বা উচ্চতা বৃদ্ধিও হইয়াছে। তাহার ফলে পরে আরও **বেশী পরিমাণে ক্ষয়ীভবন** হইয়াছে। এই অবস্থাকে **ক্ষয়চক্র** (normal cycle of erosion) বলে। তাহার ফলে ঐসকল স্থান কালক্রমে **প্রায়-সমভূমিতে** বা **সমপ্রায় ভূমিতে** (Peneplane or peneplain) পরিণত হয়। নীলগিরি পর্বতের উপরিভাগে ও মেঘালয়ের কতক অংশে (শিলং) এপ্রকার সমভূমি আছে। তবে ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ বিভিন্ন প্রকার শিলাদ্বারা গঠিত হইলে এবং তথায় **অসমানভাবে ক্ষয়ীভবন** হইলে সমভূমির উপরিভাগও **অসমান হয়**। কখন কখন তথাকার অবস্থা হয় সমুদ্রের মৃদু **তরঙ্গের মত** উঁচুনীচু। উত্তরবঙ্গে স্থানে স্থানে এরূপ **তরঙ্গায়িত সমভূমি** (rolling or undulating plain) দেখা যায়। আবার ক্ষয়ীভবনের সময় গঠনিক সংক্ষোভ বা প্রবল ভূ-আন্দোলনের ফলে ভূপৃষ্ঠের কতক অংশ ধ্বসিয়া যাইতে পারে। এভাবে **অবনত সমভূমি** বা **নিম্নভূমি** (depressed plain or basin) সৃষ্টি হইতে পারে। মধ্য-এশিয়ার তুরান অববাহিকা (Turan basin) এরূপ নিম্নভূমির উদাহরণ। অপর দিকে ভূপৃষ্ঠের কতক নিম্ন অংশ, এমন কি সমুদ্রের অগভীর অংশ গঠনিক সংক্ষোভের ফলে যথেষ্ট উঁচু হইতে পারে। এভাবে **উন্নত সমভূমি** (raised or uplifted plain) সৃষ্টি হইতে পারে। ইউরেশিয়ার স্টেপ অঞ্চল এরূপ উন্নত সমভূমির উদাহরণ।

সমভূমির প্রভাব

মানবসমাজের বসবাস, কৃষি, নানাপ্রকার শিল্প ও অন্যান্য উপায়ে জীবিকা অর্জন, স্থলপথ, রেলপথ, নৌপথ প্রভৃতির মাধ্যমে যাতায়াত ও পরিবহন প্রভৃতি সকল কাজের পক্ষে সবচেয়ে বেশী সুবিধা সমভূমিতে। এজন্য পৃথিবীর ৮৫-৯০% মানুষ বাস করে সমভূমিতে। আর একারণেই সমগ্র পৃথিবীর মোট গ্রাম, শহর, নগর, বন্দর, শিল্পকেন্দ্র, বাণিজ্যকেন্দ্র, শাসনকেন্দ্র প্রভৃতিরও ৯০-৯৫% গড়িয়া উঠিয়াছে সমভূমিতে। অতিপ্রাচীন কালেও মানবসভ্যতার কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল গ্রীস, রোম, চীন, ভারত ও মিশরের প্রধানতঃ নদী-উপত্যকা, বদ্বীপ ও উপকূলের সমভূমিতে।

ভূমিকম্প
(Earthquake)

ভূপৃষ্ঠের কতক অংশ কখন কখন হঠাৎ ভীষণ ভাবে কাঁপিয়া উঠে। ঐ সময় তথাকার ঘর-বাড়ি, গাছপালা, পুকুরের জল সবই কাঁপে। কোথাও এই অবস্থা প্রবল এবং একটু (এমন কি আধ বা এক মিনিট) স্থায়ী হইলেই ভয়ঙ্কর বিপদ বা প্রলয় কান্ড ঘটিয়া থাকে। এপ্রকার কম্পনের অবস্থাকেই বলা হয় ভূমিকম্প (Earthquake)। তবে অত্যন্ত মৃদু ভূমিকম্প সাধারণ মানুষ বুঝিতেও পারে না।

ভূমিকম্পের কারণ

খালি চোখে ভূমিকম্পের কারণ দেখা যায় না, সোজাসুজি (directly) জানাও সম্ভবপর নয়। আধুনিক কালে ভূকম্পলেখ যন্ত্রের (Seismograph) (৩৯নং চিত্র) সাহায্যে **পৃথিবীর মধ্যভাগ** কিভাবে গঠিত (internal constitution) ও **ভূমিকম্পের প্রকৃত কারণ** কি, তাহা জানা যায়। তাহাছাড়া ভূত্বকের নীচে **ভূমিকম্পের** কেন্দ্র বা **উৎপত্তিস্থল** (focus) কোথায় তাহা জানা যায়। আরও জানা যায় যে ঐ কেন্দ্র হইতে ভূমিকম্পের **স্পন্দন** (vibrations) কিভাবে তরঙ্গের মত চারিদিকে **বিস্তৃত** হয়। ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা ক্রমশঃ অধিক নীচে ভূমিকম্পের কেন্দ্রের দিকে তরঙ্গের বেগ ক্রমশঃ অধিক, অর্থাৎ ভূমিকম্পের কেন্দ্র হইতে ক্রমশঃ দূরের দিকে তরঙ্গের বেগ কম। কিন্তু কেন্দ্রের **সোজাসুজি** (vertically) **উপরে** ভূপৃষ্ঠে **কম্পনের বেগ সবচেয়ে বেশী।**
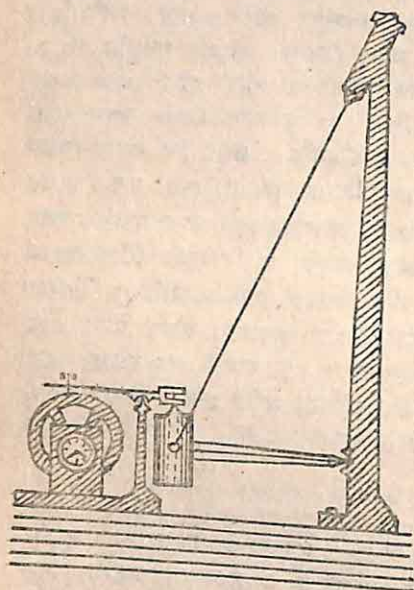
৩৯নং চিত্র—ভূকম্পলেখ যন্ত্র।

পৃথিবীর অভ্যন্তরের উপাদানসমূহ সাধারণভাবে স্থিতিশীল। তবে কখনও কোন কারণে বা একাধিক কারণে **গঠনিক সংক্ষোভ** হইলে বা ভূগর্ভে প্রবল ভূ-আন্দোলন হইলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে **চ্যুতি** (fault) **সৃষ্টি** হয়। কখন কখন তথায় প্রবল ঘর্ষণেরও (friction) সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থায় কোন চ্যুতিরেখা (line of fault) অনুসারে ভূগর্ভের **শিলা স্থানভ্রষ্ট** (slipping) হইতে পারে। তখনই ভূমিকম্প হয়। অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যভাগের উপাদানের **স্থানভ্রষ্ট** হওয়াই **ভূমিকম্পের মূল কারণ।** ইহা ভিন্ন ভূপৃষ্ঠের নীচে প্রবল ভূ-আন্দোলন হইলে **ভূগর্ভে** কোন স্থান

ধ্বসিয়া যাইতে পারে (land slide) বা **সমুদ্রের তলদেশে** কোন স্থান ধ্বসিয়া যাইতে পারে (submarine slide)। ইহা ভিন্ন ভূ-আন্দোলনের ফলে ভূগর্ভস্থ কোন গহ্বরের কতক অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। এরূপ কোন-না-কোন কারণে অথবা পৃথিবীর মধ্যভাগের অন্য কোন কারণে **মৃদু ভূমিকম্প** হইতে পারে।

ভূগর্ভের যে স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাহাকে **ভূমিকম্পের কেন্দ্র** বলে। তথা হইতে **মুখ্য তরঙ্গ** (Primary waves or P waves) বিভিন্ন সরলরেখা অনুসারে **অনুভূমিক** (longitudinal) ভাবে চারিদিকে **বিস্তৃত** হয়। ইহাদিগকে অনুসরণ করে **গৌণ তরঙ্গ** (Secondary waves or S waves)। ইহাদের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু ধ্বংস করিবার শক্তি মুখ্য তরঙ্গের চেয়ে বেশী। এই দুই প্রকার তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠে পৌঁছিবার পর তথায় এক জাতীয় নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি হইতে পারে। ইহাদের গতিবেগ কম, কিন্তু ধ্বংস করিবার শক্তি যথেষ্ট প্রবল।

ভূমিকম্পের প্রধান অঞ্চল

ভূপৃষ্ঠের দুইটি দুর্বল অংশে অধিক ভূমিকম্প হয়। ইহাদিগকে বলা যায় ভূমিকম্পপ্রবণ অংশ (seismic belt)। তাহাদের মধ্যে প্রধান অংশটি প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরিয়া আছে। তাহাকে বলে **প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেখলা** (Circum-Pacific belt) (৪০নং চিত্র)। প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বদিকের রকি ও আন্দিজ
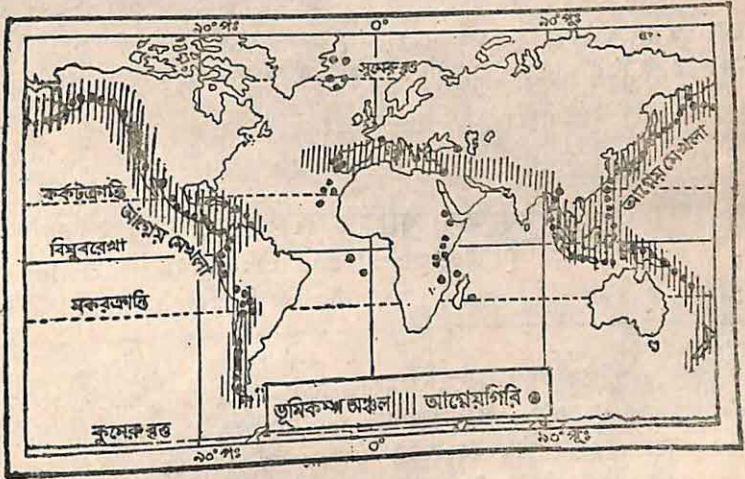
৪০নং চিত্র।

পর্বত এবং পশ্চিমদিকের জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতিকে লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। ফলে, পৃথিবীর প্রায় ৭০% ভূমিকম্প হয় এই অঞ্চলে। তাহাদের মধ্যে জাপানের স্থান **প্রথম**। তথায় দৈনিক গড়ে ২০ বার বা প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৭৫০০ বার ভূমিকম্প হয়। তবে সৌভাগ্য বশতঃ ইহাদের ৮০% অত্যন্ত দুর্বল বা মৃদু। ভূমিকম্পের দ্বিতীয় অঞ্চল **আল্পস, হিমালয়** প্রভৃতি ভঙ্গিল পর্বতের (Mid-world mountain belt) **পাদদেশে** ও পূর্বদিকে **মেঘালয়ের পাহাড়সমূহের** ভূমিকম্প-প্রবণভূমি (escarpment)।

ভূমিকম্পের প্রভাব

প্রবল ভূমিকম্পের ফলে ভূত্বকের অতি ভয়ঙ্কর ক্ষতি বা ধ্বংস সাধন হয়। পাহাড়, পর্বত, তৃণভূমি, বন, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি কিছুই বাদ যায় না। তবে ইহাদের তুলনায় গ্রাম, শহর, নগর, শিল্পকেন্দ্র প্রভৃতির ক্ষতি হয় অধিক মারাত্মক (৪১নং চিত্র)। কতক ক্ষেত্রে হাজার হাজার লোকের ও জীবজন্তুর মৃত্যু ঘটে। আর তাহাদের ঘরবাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার ফলে বহু কোটি টাকার ক্ষতি হয়। প্রবল ভূমিকম্পের ফলে কখনবা সমগ্র অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এমন কি পাহাড়, পর্বতে ধ্বস, আগ্নেয়গিরির নতুন জ্বালামুখ (crater) সৃষ্টি, নদীর গতি পরিবর্তন, সমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ, দ্বীপ অঞ্চলে ও উপকূলে প্রবল বন্যা প্রভৃতিও ঘটে। বিহারের উত্তর অংশে মজঃফরপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে (১৯৩৪ খ্রীঃ), আসামের কাছাড় (১৯৮৫ খ্রীঃ) ও অন্যান্য বহু স্থানে (১৯৫০ খ্রীঃ), গুজরাটের কচ্ছে (১৯৫৬ খ্রীঃ) ও মহারাষ্ট্রের কয়নাতে (১৯৬৭ খ্রীঃ) ভূমিকম্পের ধ্বংসের কথা ভুলিবার নয়। ভারতের বাহিরের বহু স্থানের মারাত্মক ভূমিকম্পের স্মৃতিও মানুষের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

৪১নং চিত্র—ভূমিকম্পের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকালয়ের দৃশ্য।

সপ্তম অধ্যায়

ভূত্বকের (যান্ত্রিক ও রাসায়নিক) আবহবিকার

[(Mechanical and chemical) weathering of the earth crust]

পৃথিবীর সৃষ্টির সময় হইতে অনবরত নানাভাবে ইহার পরিবর্তন হইতেছে। প্রথম অবস্থায় ইহা ছিল প্রচণ্ড উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ। ক্রমশঃ তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হওয়ার ফলে ইহা তরল অবস্থায় পরিণত হয়। তারপর আরও শীতল হওয়ার ফলে ইহার উপরিভাগে সৃষ্টি হইয়াছে শীতল ও কঠিন পদার্থের আবরণ। ভূপৃষ্ঠ হইতে পৃথিবীর মধ্যভাগের দিকে এখনও উত্তাপ অতি ভয়ঙ্কর। অন্য দিকে ভূপৃষ্ঠের ক্রমাগত ক্ষয় হওয়ার ফলে অনেক প্রাচীন ও উচ্চ পর্বত এখন আগেকার তুলনায় অনেক নীচু। আরাবল্লী, বিন্ধ্য প্রভৃতি প্রাচীন পর্বত ইহার উদাহরণ। আবার আগেকার কতক বিস্তীর্ণ নিম্নাঞ্চলে সৃষ্টি হইয়াছে পাহাড়, পর্বত। যেমন, মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ অংশে বহু পূর্বে যেখানে ছিল টেথিস সমুদ্র সেখানে কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া অসংখ্য পলিস্তর সঞ্চিত হইয়াছে। তাহাদের উচ্চতা প্রবল ভূ-আন্দোলনের ফলে আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। এভাবে তথায় সৃষ্টি হইয়াছে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত হিমালয় ও অন্য বহু উচ্চ পর্বত।

পরিবর্তনকারী শক্তি

ভূপৃষ্ঠের এসকল পরিবর্তন সম্পর্কে আমরা সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি নদীর প্রবাহ, সমুদ্রস্রোত, তরঙ্গ, হিমবাহ প্রভৃতির সুস্পষ্ট প্রভাব। তাহাছাড়া জলবায়ুর, বিশেষভাবে বায়ুর উষ্ণতা ও প্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির প্রভাবও স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভূগর্ভস্থ জলের প্রবাহ ও ভূগর্ভে প্রবল আন্দোলনের বা গঠনিক সংক্ষোভের (tectonic movement) প্রভাবও খুব বেশী। তবে **একাধিক কারণ** অথবা **বিভিন্ন শক্তির প্রভাবের সমষ্টিগত ফলে** ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন হয় সবচেয়ে বেশী।

পরিবর্তনের পদ্ধতি

উপরিলিখিত বিভিন্ন শক্তি দ্বারা ভূপৃষ্ঠে যে ক্ষয়কার্য হইতেছে তাহার সমষ্টিগত ফলে ভূত্বকের অনবরত পরিবর্তন হইতেছে। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে **তিনটি পদ্ধতি** সুস্পষ্টঃ (১) আবহবিকার বা বিচূর্ণীভবন (weathering) ও ক্ষয়ীভবন (erosion), (২) অপসারণ বা পরিবহন (transportation) এবং (৩) সঞ্চয় বা অবক্ষেপণ (deposition)। ইহাদের মধ্যে প্রথম অংশ অর্থাৎ **আবহবিকার** বা **বিচূর্ণীভবন** ও **ক্ষয়ীভবনের** বিষয় (সিলেবাস অনুসারে) নিম্নে আলোচিত হইল। যে সকল শক্তি দ্বারা ভূত্বকের পরিবর্তন হয় তাহাদের প্রভাব ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে পার্থক্য খুব বেশী। তাহার ফলে আবহবিকার **তিন ভাগে বিভক্ত**ঃ—(ক) যান্ত্রিক বা সাধারণ আবহবিকার, (খ) রাসায়নিক আবহবিকার ও (গ) জৈব আবহবিকার।

(ক) যান্ত্রিক বা সাধারণ আবহবিকার বা বিচূর্ণীভবন

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে সৌরতাপ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, হিমবাহ ও নদীদ্বারা শিলাসমূহ অর্থাৎ যে সকল উপাদান দ্বারা ভূপৃষ্ঠ গঠিত, সেগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে। ইহাকেই শিলাসমূহের **যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন** বলা হয়। উষ্ণ মরু অঞ্চলে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় প্রধানতঃ বায়ুর প্রবাহ দ্বারা এবং শীতল অঞ্চলে এই কাজ হয় তুষার, হিমবাহ প্রভৃতি দ্বারা। এভাবে শিলা **চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে** ঐ সকল চূর্ণবিচূর্ণ উপাদান বৃষ্টির জলের প্রবাহ, নদী, হিমবাহ, বায়ু-প্রবাহ প্রভৃতি দ্বারা পূর্বের স্থান হইতে অন্যত্র প্রবাহিত হয়। ফলে, পূর্বের স্থানের **ক্ষয়ীভবন** (erosion) হয়। একারণে ভূত্বকের পরিবর্তন সম্পর্কে **বিচূর্ণীভবন** ও **ক্ষয়ীভবনের** কাজ **একসঙ্গে** (simultaneously) চলে। স্পষ্টই বুঝা যায়, এভাবে শিলা **চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে** শিলাচূর্ণ অন্যত্র প্রবাহিত না হইলে তাহাদের আগেকার জায়গাতে স্তূপের আকারে পড়িয়া থাকিত। কয়েকটি পরিবর্তনকারী শক্তি কিভাবে পরিবর্তন সাধন করে তাহা পর পৃষ্ঠায় আলোচিত হইল।
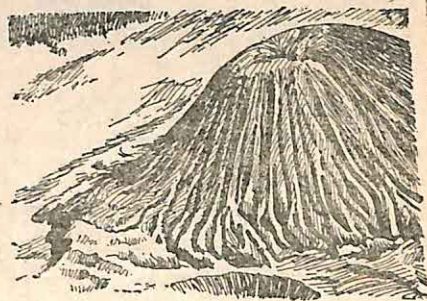
৪২নং চিত্র—বৃষ্টিদ্বারা মৃত্তিকা-স্তূপের ক্ষয়ীভবনের দৃশ্য।

বৃষ্টিপাতের প্রভাব

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে মোট যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তাহার বেশীর ভাগ (৭৫-৮০%) (১) সৌরতাপের প্রভাবে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় ও (২) ভূত্বকের চির, ফাটল প্রভৃতির মধ্যদিয়া সরাসরি নীচে নামিয়া যায়। বাকী মাত্র প্রায় ২০-২৫% বৃষ্টির জল ভূপৃষ্ঠের ঢাল (slope) অনুসারে ভূত্বকের উপর দিয়া নীচের দিকে বহিয়া যায় (surface run off)। ইহাদ্বারা ভূত্বকের পরিবর্তন হয় কতকটা প্রত্যক্ষভাবে। অর্থাৎ এরূপ পরিবর্তনের কিছু অংশ আমরা দেখিতে পাই। তবে ভূত্বকের অধিকাংশ পরিবর্তন হয় নদ-নদীর (running water) মাধ্যমে। ভূপৃষ্ঠের জলের প্রবাহ ও নদী, এই দুই পদ্ধতিতেই ভূত্বকের পরিবর্তন হয় সবচেয়ে বেশী। যে-কোন স্থানে মাটির ঢিবির উপরিভাগে বর্ষাকালে বৃষ্টির ফলে কিভাবে ক্ষয়কার্য হয় তাহা লক্ষ্য করা যায়। স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত দ্বারা আবহবিকার ও ক্ষয়ীভবনের (sheet erosion) ইহাই প্রকৃষ্ট উদাহরণ (৪২নং চিত্র)।

নদ-নদীর প্রভাব

পাহাড়, পর্বতের বৃষ্টির জল, প্রস্রবণের জল, বরফগলা জল অসংখ্য সরু ধারাতে ভূমির খাড়া ঢাল অনুসারে নীচে নামিয়া আসে। ক্রমশঃ তাহাদের পরস্পরের মিলন ঘটে। এই মিলনের ফলে সৃষ্টি হয় নদী। জলের প্রবাহের এই সূত্রগুলির মধ্যে যেখান হইতে নিয়মিতভাবে সবচেয়ে বেশী জল পাওয়া যায় তাহাকে বলে নদীর উৎস (source)। তথা হইতে নদীর মোহনা বা সমুদ্রের সহিত নদীর মিলনস্থল পর্যন্ত নদীর কাজ ও গতিপথের অবস্থা সম্পর্কে পার্থক্য বিস্তর। নদীর প্রবাহ বা জলস্রোত দ্বারা ভূত্বকের কোন অংশ চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তথায় ক্ষয়ীভবন (river erosion or fluvial erosion) হয়। যেমন, নদীর জলপ্রবাহের শুধুমাত্র বেগে ও আঘাতে (sheer impact) নদীর প্রবাহের অঞ্চলের শিলার যথেষ্ট ক্ষয়ীভবন হয়। ইহা জলের ঔদক কার্য (hydraulic action) নামে পরিচিত।
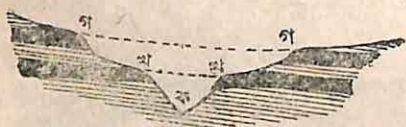
৪৩নং চিত্র—নদীর উপত্যকার আকৃতি ও আয়তনের পরিবর্তন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও ইহাদের বিভিন্ন উপনদী ও শাখাপ্রশাখার প্রবল জলস্রোতের প্রভাবে বর্ষাকালে ইহাদের তীরের বিস্তীর্ণ অংশ ভাঙ্গিয়া নদীবক্ষে বিলীন হয়। বাংলাদেশে পদ্মার (গঙ্গার প্রধান শাখা) এই জাতীয় ক্ষয়কার্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সেজন্য এই নদীর কতক অংশের নাম কীর্তিনাশা। জলের ঔদক কার্য বা জলস্রোতের আঘাত ছাড়া নদীর জলস্রোতের সহিত যে সকল পাথর, নুড়ি প্রভৃতি প্রবাহিত হয় তাহাদের ঘর্ষণেও নদীর উপত্যকার প্রচুর ক্ষয়কার্য (attrition) হয়।

নদীর ক্ষয়কার্য সম্পর্কে অন্য কতক বিষয়েরও প্রভাব খুব বেশী। যেমন, নদীর প্রবাহের অঞ্চলে বা উপত্যকাতে জলস্রোতের পরিমাণ ও স্রোতের বেগ (volume and velocity), ঐ স্রোতের সহিত প্রবাহিত উপাদানের পরিমাণ (load), নদীর প্রবাহের অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির অবস্থা, তথাকার ভূমির ঢাল, শিলার গঠন ও উপাদান প্রভৃতির

প্রভাব অধিক। ইহাদের প্রভাবে **উচ্চ পার্বত্য** অংশে যখন নদী **কঠিন শিলার** উপর দিয়া প্রবল বেগে নিম্নদিকে প্রবাহিত হয় তখন স্রোতের বেগে শিলাসমূহ ভাঙ্গিয়া খন্ডবিখন্ড হয়। তথায় **নদীর উপত্যকার মধ্যেই ক্ষয়কার্য অধিক**। এজন্য তথায় নদীর উপত্যকার (river valley) দুই পাশের ঢাল থাকে খাড়া, কখন কখন পরস্পর প্রায় সমান্তরালভাবে খাড়া। এরূপ উপত্যকার আকৃতি প্রায় I-র মত। ইহাদিগকে বলে **গিরিখাত** (gorge or canyon)। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পশ্চিম অংশে নাঙ্গা পর্বতের নিকট সিন্ধু নদের গিরিখাত এবং অরুণাচল প্রদেশের উত্তরপূর্ব সীমার নিকট ব্রহ্মপুত্রের গিরিখাত অত্যন্ত গভীর। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপশ্চিম অংশে **কলোরেডো নদীর গিরিখাত** (Grand Canyon of the Colorado) পৃথিবীর গভীরতম ও সবচেয়ে বিখ্যাত গিরিখাত। ইহার গভীরতা স্থানে স্থানে ১৮০০ মিঃ-র অধিক ও প্রস্থ ৭ হইতে ৩০ মিঃ। এই গিরিখাতের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫০ কিঃ মিঃ।

নদীর গতিপথের ক্রমশঃ নীচের দিকে অর্থাৎ সমভূমির **দিকে** নদীর উপত্যকা অঞ্চলের শিলা **কোমল**। এরূপ অনেক ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতও অধিক। তথায় বৃষ্টির জল ও নদীর জলস্রোত দ্বারা উপত্যকার তলদেশে যেমন ক্ষয়কার্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে **দুই পাশেও ক্ষয়ীভবন বৃদ্ধি হয়**। এজন্য এখানে নদীর উপত্যকার আকৃতি V-এর মত (৪৩নং চিত্র)। নদীর জলের সহিত প্রবাহিত কাঁকর, বালুকা, প্রস্তরখন্ড বা নুড়ি প্রভৃতির **ঘর্ষণের** (corrosion) ফলে নদীর উপত্যকাতে কতক **গর্তের** (pot-holes) সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাতে নদীর মাঝে মাঝে ঘূর্ণস্রোতের সৃষ্টি হয়। তাহার বেগে ক্ষয়কার্য বেশী হয়। আবার কখনও নদীর প্রবাহের পথে কোন কারণে ধ্বস হইলে নদীর জলস্রোত তথায় হঠাৎ খাড়াভাবে নীচে পড়ে। তারপর ঐ জলস্রোত আবার নূতন পথে বা নীচের অন্য কোন নদীর মধ্য দিয়া বহিয়া চলে। ঐ অবস্থায় নদীর উপরের বা আগেকার উপত্যকাকে বলে **ঝুলান উপত্যকা** (hanging valley) (৪৪নং চিত্র)। এরূপ অবস্থায় নদীর জলস্রোত যখন হঠাৎ খাড়া ভাবে প্রচন্ড বেগে নীচের দিকে পড়ে তাহাকে বলে **জলপ্রপাত**। এরূপ অংশে কোথাও নদীর উপত্যকাতে **কঠিন ও কোমল শিলার স্তর একটির নীচে অন্যটি পর পর** থাকিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় স্তরগুলি জলস্রোতের বেগে **অসমানভাবে** ক্ষয় হয়। কোমল শিলার ক্ষয় হয় বেশী, কঠিন শিলার ক্ষয় হয় কম। ঐ অবস্থায় নদীর **তলদেশের ঢালেরও পরিবর্তন** হয়। তাহা সমান ঢালু থাকিতে পারে না। উপত্যকার এরূপ অংশের মধ্য দিয়া নদী প্রবাহিত হইতে হইতে কখন কখন এমন জায়গাতে পেঁছে যেখানে ভূপাত, ধস বা অন্য কোন কারণে **ভূমি হঠাৎ খুব খাড়া**। এরূপ ক্ষেত্রে নদীর পথে **জলপ্রপাত** (waterfalls) সৃষ্টি হয় (৪৫নং চিত্র)। আবার নদীর গতিপথে কঠিন ও কোমল শিলাস্তর একটির নীচে অন্যটি না থাকিয়া **পর পর পাশাপাশি** থাকিতে পারে। এরূপ স্থানের উপর দিয়া যে নদী বহিয়া যায় তাহাদ্বারা সৃষ্টি হয় **খরস্রোত**

৪৪নং চিত্র—নদীর ঝুলান উপত্যকা।

(cataract) (৪৬নং চিত্র)। মিশরে নীল নদের গতিপথে খরস্রোত অনেক। মধ্য প্রদেশে জব্বলপুরের নিকট মার্বেল পাথর অঞ্চলে নর্মদা নদীর **ধুয়ানধারা** জলপ্রপাত, কর্ণাটকে কাবেরী নদীর **শিবসমুদ্রম্ প্রপাত**, ঐ রাজ্যে সরাবতী নদীর গারসোপা বা **যোগপ্রপাত** প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। যোগপ্রপাত এদেশের উচ্চতম জলপ্রপাত। ইহার উচ্চতা
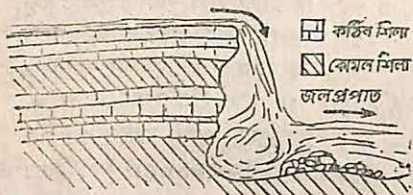
৪৫নং চিত্র। ৪৬নং চিত্র।

প্রায় ২৫৩ মিঃ। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা দেশে করোনি নদীর **এঞ্জেল প্রপাত** (Angel falls) পৃথিবীর সর্বোচ্চ জলপ্রপাত। ইহার উচ্চতা প্রায় ৯৫০ মিঃ। তবে উত্তর আমেরিকার হ্রদ অঞ্চলে সেন্ট লরেন্স নদীর **নায়গারা প্রপাত** সৌন্দর্যের জন্য অধিক প্রসিদ্ধ।

সৌরতাপ ও বায়ুর উষ্ণতার প্রভাব

উষ্ণ মরুভূমিতে দিবা ও রাত্রির উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী, আবার শীত ও গ্রীষ্মঋতুর উষ্ণতার মধ্যেও পার্থক্য তেমনই অধিক। এই জাতীয় মরুভূমি সাধারণতঃ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। তাই ইহাদের অবস্থিতির প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। মরুভূমিতে দিবাভাগে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে প্রস্তর, বালুকা প্রভৃতি অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হয়। ফলে, তথায় দিনের বেলা বায়ুর উষ্ণতাও দ্রুত বৃদ্ধি হয়। এপ্রকার **উষ্ণতা বৃদ্ধির** জন্য দিবা ভাগে তথাকার **শিলা প্রসারিত** হয়। অপরদিকে তথায় রাত্রিতে শিলা হইতে প্রচুর **তাপ বিকিরণ** (radiation) হয়। তাহার ফলে রাত্রে তথায় বায়ুর উষ্ণতা অনেক **কমিয়া** যায়। তখন **শিলা সঙ্কুচিত** হয়। শীত ও গ্রীষ্মকালেই বায়ুর উষ্ণতার পার্থক্য হয় সবচেয়ে বেশী। প্রায় প্রতিদিন উষ্ণতার এপ্রকার পার্থক্য হয় বলিয়া তথায় শিলা ক্রমাগত প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইতে থাকে। তাহার ফলে **শিলা দুর্বল** হইয়া পড়ে এবং শিলাতে চির ও ফাটল সৃষ্টি হয়। ক্রমে ক্রমে শিলা ভাঙ্গিয়া **চূর্ণ-বিচূর্ণ** (block disintegration) হয়। ভূত্বকের নীচের অংশের শিলার তুলনায় উপরের অংশের শিলাতে উষ্ণতার পার্থক্য হয় বেশী। তাহার প্রভাবও অধিক। এরূপ অধিক পার্থক্যের ফলে উপরের কতক শিলা কখন কখন আল্গা হইয়া পড়ে (peel off)। শিলাসমূহ এভাবে **স্তরে স্তরে** পৃথক্ হয় (exfoliation) বলিয়া শিলাখণ্ডের **আকৃতি** হয় প্রায় **গোল**। রাজস্থান, মেঘালয়ের খাসিয়া পাহাড় প্রভৃতি স্থানে ক্ষয়ীভবনের প্রভাবে এপ্রকার প্রায় গোল আকৃতির শিলা (spheroidal weathering এর চিহ্ন) দেখা যায়। মরুভূমির যে সকল অংশের শিলা মোটা দানাযুক্ত (coarse grained) তথায় উষ্ণতার পার্থক্যের প্রক্রিয়ার ফলে অনেক শিলা সন্ধ্যার পর ভীষণ শব্দে ফাটিয়া যায় ও ক্রমশঃ চূর্ণবিচূর্ণ হয় (granular disintegration)।

তুষারের প্রভাব

মেরু অঞ্চলে ও অত্যুচ্চ পর্বতে উষ্ণতা অত্যন্ত কম বা শীতের পরিমাণ খুব বেশী। তথায় অধিক শীতের প্রভাবে জলীয় বাষ্প ও বৃষ্টির জল ঘনীভূত হইয়া তুষারে পরিণত হয়। এসকল স্থানে কখন কখন আকাশ হইতে গুঁড়া গুঁড়া তুষারপাত (snowfall) হয়। ভূপৃষ্ঠেও অধিক শীতের প্রভাবে জল তুষারে পরিণত হয়. আশপাশের শিলার উপর তখন চাপ বাড়ে। কারণ, যে পরিমাণ জল তুষারে পরিণত হয় তাহার জল অবস্থায় ঘন ফলের তুলনায় তুষার অবস্থায় ঘন ফলের (volume) পরিমাণ বেশী। কাজেই কোন শিলা অঞ্চলে জল তুষারে পরিণত হইলে শিলার উপর তুষারের চাপ বাড়ে। তখন অধিক চাপের ফলে শিলা চূর্ণবিচূর্ণ হয়। পাহাড়, পর্বত হইতে এপ্রকার শিলাচূর্ণ প্রচুর পরিমাণে নীচের দিকে নামিয়া আসে এবং পাহাড়, পর্বতের পাদদেশে (foot hill) ক্রমশঃ ঢালু হইয়া জমিয়া থাকে। তাহাকে স্ক্রী (scree) বা ট্যালাস (talus) বলে। স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমিতে প্রচুর স্ক্রী দেখা যায়।

(খ) রাসায়নিক বিচূর্ণভবন

যান্ত্রিক বা সাধারণ আবহবিকারের সময় উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, নদীর জলস্রোত প্রভৃতি দ্বারা শিলার উপর যথেষ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়াও (chemical reaction) হয়। তাহার প্রভাবেই শিলার রাসায়নিক আবহবিকার ও ক্ষয়ীভবন (chemical weathering or decomposition) হয়।

বৃষ্টির জল ও নদীর জলস্রোতের প্রভাব

শিলার যান্ত্রিক বা সাধারণ আবহবিকারের মত রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবন সম্পর্কেও বৃষ্টির জল ও নদীর জলস্রোতের কার্যকারিতা ও প্রভাব অন্যান্য কারণ বা শক্তির কার্যকারিতা ও প্রভাবের তুলনায় অধিক। জলের রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে শিলার কতক উপাদান গলিয়া গিয়া প্রচুর ক্ষয়ীভবন বা কর্ষণ (corrosion) হয়। তাহা ভিন্ন জল ও বায়ুর উপাদান অম্লজানের (oxygen) রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে লোহার তৈরী জিনিসে মরিচা ধরে। লোহার তৈরী জিনিসে জল লাগিবার ফলে এরূপ রাসায়নিক আবহবিকারের অর্থাৎ মরিচা ধরিবার উদাহরণ সর্বত্র দেখা যায়। ইহাকে অক্সিডেশন (oxidation) বলে। তাহাছাড়া জলের সহিত বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশিয়া যাওয়াতে জল সামান্য অম্লভাবাপন্ন (acid) হয়। এরূপ জল চুনাপাথর, চক প্রভৃতি শিলা অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ার সময় ইহাদের উপর জলের রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয়। তাহার ফলে ঐ সকল শিলার অন্তর্গত চুন জাতীয় পদার্থ (carbonate of lime) গলিয়া যায়। এই রাসায়নিক পরিবর্তনকে কার্বনেশন (carbonation) বলে। ইহার ফলে চুনাপাথর অঞ্চলে গুহা বা গহ্বর তৈরী হয়। আর গুহার মধ্যে স্ট্যালেক্‌টাইট ও স্ট্যালেগ্‌মাইট সৃষ্টি হয়। এরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে চুনাপাথর ও মার্বেল পাথরের অন্তর্গত ক্যালসাইট অধিক গলিয়া যায়। তাহাকে গলন (solution) বলে। এরূপ প্রক্রিয়াতে ফেলস্‌পার, গ্র্যানাইট প্রভৃতির কতক অংশ গলিয়া যাওয়ার ফলে কেবল কর্দম (clay) ও অন্যান্য অদ্রবণীয় অংশ (insoluble matter) অবশিষ্ট থাকে।

(গ) জৈব আবহবিকার

বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গাছের অসংখ্য শিকড় খাদ্যের খোঁজে শিলার দুর্বল অংশের বা চির, ফাটল প্রভৃতির মধ্য দিয়া ছড়াইয়া পড়ে। ইহার ফলে শিলার প্রচুর বিচূর্ণী-

ভবন হয়। খরগোস, প্রেইরি ডগ, ছুঁচো, কেঁচো প্রভৃতি প্রাণীও বাস করিবার উদ্দেশ্যে, বা কখন কখন খাদ্যের খোঁজে মৃত্তিকার মধ্যে গর্ত খোঁড়ে। (মৃত্তিকা শিলার অন্তর্গত।) কাজেই উদ্ভিদ্ ও প্রাণী দ্বারাও শিলার কিছু আবহবিকার হয়। ইহাকে **জৈব আবহবিকার** (Biological or organic weathering) বলে। ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সম্বন্ধে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক আবহবিকারের তুলনায় ইহার গুরুত্ব খুব কম।

অষ্টম অধ্যায়

নদী, হিমবাহ ও বায়ুর পরিবহন ও সঞ্চয় কার্য
(Works of rivers, glaciers and wind as agents of transportation and deposition)

পৃথিবীর সৃষ্টির পর হইতেই ভূত্বকের ক্রমাগত পরিবর্তন হইতেছে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে বৃষ্টিপাত, নদী, বায়ুপ্রবাহ, হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির বা কারণের প্রভাব খুব বেশী। এ বিষয়ে উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর প্রভাব প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবের তুলনায় অনেক কম। প্রাকৃতিক কারণসমূহ দ্বারা ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজের **প্রথম অংশ** আবহবিকার ও ক্ষয়ীভবন। (এবিষয় পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।) তাহাদের কাজের **পরবর্তী অংশ** পরিবহন ও সঞ্চয়। তাহাদের বিষয় নিম্নে আলোচিত হইল।

(ক) নদীর কাজ

ভূত্বকের পরিবর্তন সম্পর্কে **নদীর প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক**। নদীর উৎস বা উৎপত্তিস্থল হইতে মোহনা বা সমুদ্রের সহিত মিলনস্থল পর্যন্ত ইহার গতিপথের বা প্রবাহের অঞ্চল সাধারণতঃ দীর্ঘ। এই দীর্ঘ পথে উপত্যকার অবস্থা ও ভূপ্রকৃতির পার্থক্য প্রচুর। নদীর মধ্য দিয়া জলের প্রবাহের পরিমাণও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের। তাই উপত্যকার বিভিন্ন অংশে নদীর কাজ সম্পর্কে পার্থক্যও খুব বেশী। এই কাজ একদিকে নদীর **জলস্রোতের পরিমাণ** ও **গতিবেগের** (velocity) উপর, অন্যদিকে নদীর প্রবাহের অঞ্চলের বা উপত্যকার **ভূপ্রকৃতি, গঠন, আয়তন** প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে নদীর জলপ্রবাহের পরিমাণ নির্ভর করে বৃষ্টির জল, বরফগলা জল প্রভৃতি কোন্ কোন্ সূত্র হইতে নদী জল লাভ করে, কত বিস্তীর্ণ অঞ্চল হইতে জল পাওয়া যায়, তারপর উপনদীর সংখ্যা কিরূপ এবং তাহারা কি পরিমাণ জল সরবরাহ করে ইত্যাদি বিষয়ের উপর। আবার জলের গতিবেগ নির্ভর করে এসকল সূত্র হইতে যে জল পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ ও সময় এবং উপত্যকা অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, তাহার ঢাল, গঠন প্রভৃতি বিষয়ের উপর।

সাধারণতঃ নদীর প্রবাহের অঞ্চলের বা উপত্যকার **ভূপ্রকৃতি** ও **নদীর কাজের** মধ্যে সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। তদনুসারে নদীর গতিপথ বা উপত্যকাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই তিন ভাগ ও তাহাদের কাজ মোটামুটি ভাবে নিম্নরূপ ঃ—(i) পার্বত্য অঞ্চলে নদীর **প্রাথমিক গতি** বা উচ্চ গতি। এখানে নদীর প্রধান কাজ ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় সাধন ও ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানসমূহের অপসারণ বা পরিবহন। (ii) তারপর সমভূমিতে নামিবার পর হইতে নদীর **মধ্য গতি**। এখানে নদীর কাজ ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়

সাধন, ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানসমূহের অপসারণ বা পরিবহন ও সঞ্চয়। কাজেই এখানে নদীর তিন কাজই সুস্পষ্ট। (iii) ইহার পর নদী যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়া যায় সেখানে দেখা যায় নদীর **সর্বশেষ অবস্থা** বা পরিণত অবস্থা। তাহার সামান্য পূর্ব হইতে নদীর কাজ ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানসমূহের অপসারণ বা পরিবহন ও সঞ্চয়। এখানে ক্ষয়কার্য প্রায় হয় না।

নদীর পরিবহন বা প্রবহন বা অপসারণ কার্য

নদীর উৎস হইতে মোহনা পর্যন্ত সমগ্র গতিপথে ইহার **অন্যতম প্রধান** কাজ ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানসমূহের **পরিবহন**। তবে নদীর উপত্যকার বিভিন্ন অংশে ভূপ্রকৃতি, গঠন, জলস্রোতের পরিমাণ ও গতিবেগ প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্য খুব বেশী। ফলে, ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানসমূহের পরিবহনের পদ্ধতি, পরিমাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে পার্থক্য বিস্তর।

পার্বত্য অঞ্চলের অবস্থা—পার্বত্য ভূমিতে, বিশেষতঃ **বর্ষা কালে** বরফগলা জল ছাড়া প্রবল বর্ষণের পর বৃষ্টির প্রায় অফুরন্ত জলধারা অসংখ্য ছোট-বড় উপনদীর (tributaries) মধ্য দিয়া ভূমির ঢাল অনুসারে নীচের দিকে নামিয়া আসে। এভাবে নামিতে নামিতে জলরাশি কোন বড় নদীর বা মূল নদীর সহিত মিশিয়া যায়। তখন ঐ নদীতে স্বভাবতঃ **জলের পরিমাণ** এবং প্রবাহের গতিবেগ অন্য সময়ের তুলনায় **বহু গুণ বৃদ্ধি** হয়। এই গতিবেগ কখন কখন ঘন্টায় ২৫-৩০ কিঃ মিঃ। এরূপ অবস্থায় নদী তাহার উপত্যকার **ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানকে** অর্থাৎ পাথর, নুড়ি প্রভৃতিকে সহজেই নীচের দিকে **বহন করে**। বস্তুতঃ তখন বিভিন্ন উপনদীর মাধ্যমে অধিক জল লাভ করিবার ফলে নদীর পক্ষে এসকল জিনিস **বহন করিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি** হয়। এই সুযোগে পার্বত্য অঞ্চলের বনের বহু **গাছ কাটিয়া তাহাদের গুঁড়ি** নদীর জলের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। কখন কখন দেখা যায় সেগুলি যেন লাফাইয়া লাফাইয়া উপর হইতে নীচের দিকে **নামিয়া** আসে। তারপর নীচে **সুবিধাজনক স্থানে** সেই গুঁড়িগুলিকে আটকাইয়া রাখা হয়। এরূপ স্থানে বা আশপাশে **করাতঘর, কাঠ চেরাই** ও কাঠের **জিনিসপত্র** তৈরীর কারখানাও গড়িয়া উঠে।

নদীর জলস্রোত যখন পাথর, নুড়ি প্রভৃতি বহন করিতে থাকে তখন একদিকে জলস্রোতের বেগে উপত্যকার ক্ষয়কার্য হয়, অন্য দিকে ঐ সকল ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানের বা পাথর, নুড়ি প্রভৃতির **আঘাত ও ঘর্ষণের** (friction) ফলেও নদীর উপত্যকার যথেষ্ট ক্ষয় সাধন হয়। ইহাকে বলা হয় **কর্ষণ** (corrosion)। আর উপাদানসমূহের বিচূর্ণীভবন, ক্ষয়ীভবন ও অপসারণকে এক সঙ্গে বলা হয় **নগ্নীভবন** (denudation)। ক্ষয়কার্যের ফলে নদীর **উপত্যকার গভীরতা** যথেষ্ট পরিমাণে **বৃদ্ধি** হয় (degrade)। পার্বত্য অঞ্চলে এভাবে কখন কখন নদীর গতিপথে গভীর খাতের (gorge) সৃষ্টি হয়। নদীর অত্যন্ত গভীর খাতকে বলে **ক্যানিয়ন** (canyon)। যুক্তরাষ্ট্রের কলোরেডো নদীর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন পৃথিবীতে নদীর গভীরতম খাত।

নদীর মধ্য গতির বা সমভূমি অঞ্চলের অবস্থা—সমভূমি অঞ্চলে নদীর ক্ষয়কার্য ও পরিবহন দুই কাজেরই পরিমাণ খুব বেশী। আবার ক্ষয়ীভূত উপাদানের অনেক অংশই এখানে সঞ্চিত হয়। বিশেষতঃ বিভিন্ন উপনদীর মধ্য দিয়া অনেক **সময়** এত বেশী পাথর, নুড়ি প্রভৃতি মূল নদীতে আসিয়া পৌঁছে যে মূল নদীর জলস্রোতের

পক্ষে তাহা সম্পূর্ণরূপে বহন করা কষ্টসাধ্য (নদী overloaded) হইয়া পড়ে। ফলে, নদীর উপত্যকার তলদেশের উচ্চতা বৃদ্ধি (aggrade) হয়।

নদীর বার্ধক্য বা শেষ বা পরিণত অবস্থা—সমুদ্রের সহিত মিলনের পূর্বে নদীর জলের বেগ অত্যন্ত কমিয়া যায়। কখন কখন ঐ গতিবেগ হয় ঘন্টায় আধ কিঃ মিঃরও কম। তখন নদীর ক্ষয়কার্য প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়। এমন কি, নদীর পক্ষে ক্ষয়ীভূত উপাদানসমূহকে সমুদ্রের দিকে **পরিবহনের ক্ষমতাও** অনেক কমিয়া যায়। ক্ষয়ীভূত বালুকা, মৃত্তিকা প্রভৃতি নদীর জলের সহিত অধিক পরিমাণে মিশিয়া থাকার ফলে এই অবস্থায় নদীর জলের রং থাকে ঘোলা। বর্ষাকালেই জলের এরূপ ঘোলা অবস্থা দেখা যায় সবচেয়ে বেশী।

নদীর গতিপথের বা উপত্যকার বিভিন্ন অবস্থায় নদীর পরিবহনের ক্ষমতা সম্পর্কে এপ্রকার পরিবর্তনের ফলে নদীর **অপসারণের পদ্ধতি সম্বন্ধেও** যথেষ্ট পার্থক্য ঘটে। যেমন, ক্ষয়প্রাপ্ত শিলার বা উপাদানের মধ্যে যে দ্রবণীয় পদার্থ (soluble materials) থাকে তাহা সাধারণতঃ **দ্রবীভূত বা গলান** অবস্থায় অপসৃত হয়। চুনাপাথর অঞ্চলে এরূপ অবস্থা বেশী দেখা যায়। তারপর ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানের মধ্যে যে পাথরের টুকরাগুলি থাকে তাহা **জলস্রোতকে অবলম্বন** করিয়া প্রায় ভাসিতে ভাসিতে বা ভাসমান অবস্থায় (in suspension) প্রবাহিত হয়। ইহাদের তুলনায় বড় অংশগুলি, যেমন, নুড়ি, পাথরের টুকরা প্রভৃতি নদীর উপত্যকার তলদেশের ঢাল (slope) অনুসারে **গড়াইতে গড়াইতে** (rolling) প্রবাহিত হয়। আরও বড় আকৃতির ও অধিক ভারী জিনিস, যেমন, পাথরের বড় বড় চাঁই বা চাঙ্গড় প্রভৃতি পার্বত্য অংশে প্রায় লাফাইয়া লাফাইয়া (hopping) প্রবাহিত হয়।

নদীর সঞ্চয় কার্য

নদীর মধ্য গতির বা সমভূমি অঞ্চলের অবস্থা—পার্বত্য অঞ্চলে নদীর প্রবল জলস্রোতের ফলে ক্ষয়ীভূত উপাদান কিছু মাত্র সঞ্চিত হইতে পারে না। ঐ অঞ্চল ছাড়িয়া নদী যখন সমভূমির উপর দিয়া নিম্নদিকে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন **নীচের দিকে** নদীর স্রোতের বেগ ক্রমশঃ কমে। তখন নদীর **উপত্যকাতে** ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে
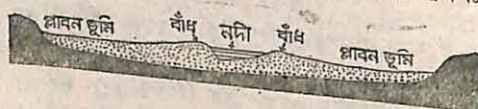
৪৭নং চিত্র—নদীর উপত্যকাতে স্বাভাবিক বাঁধ ও প্লাবনভূমি।

ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদান সঞ্চিত হয়। ক্রমে ইহাদের পরিমাণ এত বেশী হয় যে নদী তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বহন করিবার ক্ষমতা ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলে। ক্ষয়ীভূত উপাদান **পরিবহন সম্পর্কে** এভাবে নদীর **দুর্বলতা** ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ফলে, নদীর উপত্যকাতে ক্রমশঃ আরও অধিক পরিমাণে ক্ষয়ীভূত উপাদান আসিয়া পৌঁছে ও সঞ্চিত হয়। এই অবস্থায় নদীর উপত্যকার পাশের দিকে ক্রমশঃ অধিক ক্ষয় হয়, কিন্তু তলদেশে মাত্রও ক্ষয় হয় না। তাহার উপর ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদান নদীর উপত্যকাতে আরও বেশী সঞ্চয়ের ফলে প্রশস্ত উপত্যকা ক্রমশঃ আরও **অগভীর** হইয়া পড়ে। এজন্য ক্রমে নদীর **জলস্রোতের** বেগও কমিয়া যায়। ফলে, নদীর উপত্যকাতে ক্ষয়ীভূত

উপাদানের **সঞ্চয়ের পরিমাণ** আরও **বাড়িতে** থাকে। ইহাই নদীর **সঞ্চয়কার্যের** (accumulation) **লক্ষণ** বা **বৈশিষ্ট্য**।

ক্ষয়ীভূত উপাদানসমূহ নদীর উপত্যকাতে নানা পদ্ধতিতে সঞ্চিত হয়। যেমন, ইহাদের কতক অংশ নদীর জলের সহিত প্রবাহিত হওয়ার অবস্থাতেই নদীর উপত্যকাতে ও **পাশে** ধীরে ধীরে পলিরূপে সঞ্চিত হয়। দুই **পাশের নীচু জমি** এভাবে ক্রমশঃ উঁচু হয়। কালক্রমে তথায় তৈরী হয় **স্বাভাবিক বাঁধ** (levee)। ভাগীরথী এবং আরও অনেক নদীর তীরে দীর্ঘ স্বাভাবিক বাঁধ আছে। **প্লাবন** বা **বন্যার সময়** বিশেষতঃ বর্ষাকালে নদীর বন্যার জল দুই পাশের নীচু জমিতে **বহু দূর পর্যন্ত** প্রচুর পরিমাণে জমিয়া থাকে। এই জলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় যে কর্দম ঐ সকল
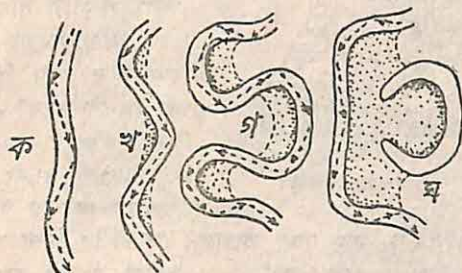
৪৮নং চিত্র—অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি।

স্থানে পৌঁছে তাহা ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে পলিরূপে (silt or alluvium) তথায় **জমিতে** থাকে। বারে বারে বন্যার ফলে এভাবে পলি জমিতে জমিতে কালক্রমে ঐ সকল নিম্নভূমি **সমভূমিতে** পরিণত হয়। ইহাদিগকে বলে **প্লাবনভূমি** (flood plain or alluvial plain) (৪৭নং চিত্র)। গঙ্গা নদীর দুই দিকের বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমিকে গাঙ্গেয় **সমভূমি** বা **গঙ্গা সমভূমি** (Ganga plain) বলে। এখানকার উর্বরতা পৃথিবীর সর্বত্র সুপরিচিত।

নদীর মধ্য গতির শেষ ভাগে ইহার জলের প্রবাহ এত **দুর্বল** থাকে যে পথে কোথাও বাধা পাইলে তাহা **বাঁকিয়া** অন্য পথে বহিয়া চলে। এজন্য ঐ অংশে **নদীর গতিপথে** অনেক বাঁক (meander) দেখা যায়। আবার এখানে নদীর দুর্বল স্রোতের দ্বারা **যে কূলে** সামান্য **ক্ষয়কার্য** হয় তাহার বিপরীত দিকেই ঐ সকল **ক্ষয়ীভূত** উপাদান **সঞ্চিত** হয়। কারণ, এখানে নদীর জলের বেগ এত ক্ষীণ বা দুর্বল যে তাহা ক্ষয়ীভূত উপাদান দূরে সরাইয়া নিতে পারে না। তাই এই অবস্থায় নদীতে প্রায়ই নূতন নূতন বালুচর, চর প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এগুলি সামান্য জলের তোড়ে সহজেই ভাঙ্গিয়াও যায়। তাহাছাড়া নদীর বাঁকা পথের বা বাঁকের দুই মাথার মধ্যে দূরত্ব কখন কখন খুব কমিয়া যায়। কখনও বা নদীর জল ঐ দূরত্বটুকু ভাঙ্গিয়া প্রায় সোজা পথে বহিয়া চলে। তখন নদীর ঐ পরিত্যক্ত অংশের বা ঐ বাঁকের অবস্থা হয় বাঁকা হ্রদের মত। ইহাদিগকে বলে **অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ** (Horse shoe or oxbow lake) (৪৮নং চিত্র)। পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে এরূপ হ্রদ অনেক।

নদীর বার্ধক্য বা পরিণত অবস্থা—নদীর গতিপথের বা উপত্যকার **আরও নিম্ন অংশে** নদী অধিক প্রশস্ত ও **নিতান্ত অগভীর** পথে সমুদ্রের সহিত মিশিবার জন্য

ধীর গতিতে আগাইয়া চলে। সেখানে নদীর **গতিবেগ প্রায় সম্পূর্ণরূপে** হ্রাস পায়। তখন নদীর জলের সহিত প্রবাহিত কাঁকর, বালুকা, **পলি** প্রভৃতির কতক অংশ সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছিবার সুযোগ পায় না। তাহা তথায় নদীর গতিপথেই **সঞ্চিত** হয়। কাজেই এখানে নদীর প্রায় একমাত্র কাজ সঞ্চয়। এই অবস্থাতে নদীর গতিপথে বহু মগ্নচর, চর প্রভৃতি সৃষ্টি হয় এবং মোহনাতে খুব বেশী ছোট ছোট দ্বীপ সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি পরস্পরের সহিত মিশিয়া যায়। ফলে, নদীর আগেকার পথ বন্ধ হইয়া যায়। নদী তখন বাধ্য হইয়া **নূতন নূতন** পথ তৈরী করিয়া সে পথে বহিয়া চলে। তবে এগুলিও নিতান্ত অগভীর এবং এখানেও ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে পলি সঞ্চিত হয়। এজন্য বহু নদীর সমুদয় মোহনার অবস্থা হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রিকোণাকার ভূমির মত। এই ভাবেই নদীর মুখে সৃষ্টি হয় **বদ্বীপ** বা ব-আকৃতির দ্বীপ (delta) (৪৯নং চিত্র)। **গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার বদ্বীপ** পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে নদীর নিম্ন অংশে গতিপথ বা উপত্যকা গভীর হইলে ও তথায় নদীতে বা সমুদ্রে জলের বেগ অধিক হইলে মোহনাতে অধিক পলি জমিতে পারে না। তাই তথায় বড় বদ্বীপ সৃষ্টি হইতে পারে না। কখনও বা বদ্বীপ সৃষ্টিই হইতে পারে না। আমাজন, কঙ্গো বা জায়রে, নর্মদা, তাপ্তী বা তাপী প্রভৃতি নদীর উদাহরণ উল্লেখযোগ্য।

৪৯নং চিত্র—বদ্বীপ সৃষ্টি।

(খ) হিমবাহের পরিবহন ও সঞ্চয়কার্য

অতি উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে ও মেরু অঞ্চলে অত্যন্ত অধিক **শীতের** জন্য জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয় ও ক্রমাগত তুষারপাত (snowfall) হয়। তথায় **হিমরেখার** (snowline)* উপরে তাহা ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে থাকে। ফলে, ধীরে ধীরে তাহা অধিক উঁচু হয় ও জমিয়া গিয়া কঠিন বরফস্তূপে পরিণত হয়। ঐসকল স্থানে ক্রমশঃ ইহাদের আয়তন অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়। কখন কখন দেখা যায় অতি বৃহৎ ভূখণ্ড (বহু শত, সহস্র বর্গ কিঃ মিঃ) বরফাবৃত। আবার তথায় সঞ্চিত বরফস্তূপের উচ্চতাও কখন কখন উচ্চ মালভূমির মত। য়্যান্টার্কটিকা ও সুমেরু অঞ্চলে এবং হিমালয় ও আল্পস পর্বতের উপরিভাগে এপ্রকার বিস্তীর্ণ ও উচ্চ বরফস্তূপ দেখা যায়। ঐসকল **বিস্তীর্ণ বরফস্তূপ** সর্বদা এক জায়গাতে স্থির থাকে না। তাহা অতিধীরে (সাধারণতঃ দৈনিক তিন ইঞ্চিরও কম গতিতে) ভূমির ঢাল অনুসারে **নামিয়া আসে**। ইহাদিগকে বলা হয় **হিমবাহ** (glacier) (৫০নং চিত্র)। সাধারণতঃ হিমবাহের অবস্থানের অঞ্চল অনুসারে ইহাদের নাম-করণ হয়। যেমন, মহাদেশীয় হিমবাহ, পর্বত্য অঞ্চলের উপরিভাগের হিমবাহ বা পার্বত্য হিমবাহ (Mountain or Alpine glacier) বা পর্বতের পাদদেশের হিমবাহ (piedmont glacier), পর্বতের বিভিন্ন উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হিমবাহ বা উপত্যকা হিমবাহ (valley glacier) প্রভৃতি। য়্যান্টার্কটিকা ও গ্রীন-

* এই কাল্পনিক রেখার নীচে তুষার গলে উপরে গলে না। কাজেই গ্রীষ্মকালে যেখানে এই রেখা থাকে শীতকালে তাহার তুলনায় অনেক নীচে থাকে।

ল্যাণ্ডে দেখা যায় বহু দূর বিস্তীর্ণ মহাদেশীয় হিমবাহ (continental glacier)। হিমালয়, আল্পস প্রভৃতি পর্বতে আছে পার্বত্য হিমবাহ ও উপত্যকা হিমবাহ। হিমবাহ যত ধীরেই প্রবাহিত হয় না কেন, বা ইহাদের গতি সহজে বুঝা না গেলেও ইহাদের দ্বারা আশপাশে ক্ষয়কার্য হয়। ক্ষয়প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ড, কাঁকর প্রভৃতি ঐ হিমবাহের উপরে প্রচুর পরিমাণে পতিত হয়। তাহাদের কতক অংশকে হিমবাহ প্রবাহিত হওয়ার সময় নীচের দিকে বহিয়া আনে। তাহাদিগকে বলা হয় **বোল্ডার ক্লে**
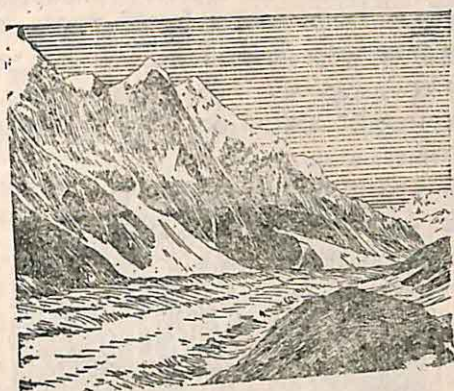
৫০নং চিত্র—পার্বত্য অঞ্চলের হিমবাহ।

(boudler clay), **টিল** (till) ইত্যাদি। এসকল উপাদানের কতক অংশ হিমবাহের ফাটলের (crevasse) মধ্য দিয়া নীচে নামিয়া যায় ও হিমবাহের নিম্ন অংশে সঞ্চিত হয়।

এদিকে হিমবাহ পার্বত্য অঞ্চল হইতে যত নীচে নামে তাহার উপর নিম্ন অংশের অধিকতর উষ্ণতার প্রভাব তত বাড়ে। তাহার ফলে হিমবাহ একটু একটু করিয়া গলিতে থাকে*। তাহাছাড়া হিমবাহের প্রবাহের পথের দুই পাশের ভূখণ্ডের সহিত **ঘর্ষণের ফলেও** হিমবাহের কিছু কিছু অংশ ভাঙ্গিতে থাকে। ফলে, হিমবাহের আকৃতি ছোট হইতে থাকে। এজন্য হিমবাহের সহিত প্রবাহিত ছোট-বড় প্রস্তরখণ্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি হিমবাহের তলদেশে ও পাশে প্রায় **সারিবদ্ধভাবে সঞ্চিত** হয়। ইহাদিগকে বলে **গ্রাবরেখা** (moraine) (৫১নং চিত্র)। হিমবাহের প্রবাহের পথের পাশে যে গ্রাবরেখা সঞ্চিত হয় তাহাকে বলে **পার্শ্ব গ্রাবরেখা** (lateral moraine)। আর যে গ্রাবরেখা হিমবাহের তলদেশে অর্থাৎ হিমবাহের প্রবাহের পথের উপর সঞ্চিত হয় তাহাকে বলে **ভূমি গ্রাবরেখা** (ground moraine)। কোথাও দুইটি হিমবাহ পরস্পর মিলিত হইলে তাহাদের মিলনক্ষেত্রের মধ্য অংশ বরাবর যে গ্রাবরেখা সঞ্চিত হয় তাহাকে বলে **মধ্য গ্রাবরেখা** (medial moraine)। আর হিমবাহ যেখানে সর্বশেষ গলিয়া যায় তথায় যে গ্রাবরেখা সঞ্চিত হয় তাহাকে বলে **প্রান্ত গ্রাবরেখা** (terminal moraine)।

* হিমশৈলও মেরু অঞ্চল হইতে অধিক দূরে ভাসিয়া আসিলে তথাকার অধিকতর উষ্ণতার প্রভাবে ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া গলিতে থাকে।

হিমবাহের প্রবাহের অঞ্চলে মাঝে মাঝে বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। উষ্ণতা বৃদ্ধি হইলে হিমবাহের বাহির দিকের কতক অংশ গলিয়া যাইতে পারে। তখন হিমবাহের আয়তন কমিয়া ছোট হয়। ইহাকে **হিমবাহের প্রত্যাবর্তন** (retreat of glacier) বলে। আবার হিমবাহের অঞ্চলে **শীত** বৃদ্ধি হইলে হিমবাহের আয়তন বাড়িতে পারে। এজন্য একই অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তনের হিমবাহ প্রবাহিত হইতে পারে। তাহার ফলে তথায় **একাধিক বার পার্শ্ব গ্রাবরেখা ও প্রান্ত গ্রাবরেখা** সঞ্চিত হইতে পারে। গ্রাবরেখা সঞ্চয়ের স্থান সম্বন্ধে এপ্রকার পরিবর্তন দেখিয়া জানা যায় যে এককালে হিমালয় অঞ্চলের হিমবাহ গঙ্গোত্রী ও বদরীনাথ মন্দিরের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিমবাহের প্রবাহের অঞ্চলে গ্রাবরেখা বিভিন্ন আকৃতিতে সঞ্চিত হইতে পারে। কোথাও গ্রাবরেখা গোলাকার ভাবেও সঞ্চিত হইতে পারে। তাহার মাঝখানে জল জমিলে **ক্ষুদ্র হ্রদ সৃষ্টি** হইতে পারে।

৫১নং চিত্র—হিমবাহ ও বিভিন্ন প্রকার গ্রাবরেখা।

কখন কখন গ্রাবরেখা দ্বারা বৃত্তাংশ (arc) সৃষ্টি হইতে পারে। বৃহৎ স্তূপের আকারেও গ্রাবরেখা সঞ্চিত হইতে পারে। ইহাদিগকে **ড্রামলিন** (drumlin) বলে। হিমবাহের নীচে মোটা বালুকারাশি ও প্রস্তরখণ্ড প্রায় স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকিতে পারে। ইহাদিগকে বলা হয় **এস্কার্স** (eskers)। ইওরোপের উত্তর প্রান্তে ইহা দেখা যায়। কোথাও কোথাও বদ্বীপের মত কৌণিক আকৃতিতে, কোথাও বা শঙ্কুর (cone) আকৃতিতে গ্রাবরেখা দেখা যায়। ইহাদিগকে বলা হয় কেমেস (cames)। তাহাছাড়া বহুদূর বিস্তৃত মহাদেশীয় হিমবাহ (continental glacier) দ্বারা বিস্তীর্ণ নিম্নাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গ্রাবরেখা সঞ্চিত হইতে পারে। এরূপ অবস্থাতে কোথাও কোথাও **হিমবাহ সমভূমি** (glacial plain) সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার উত্তর অংশে বহুদূর বিস্তৃত হিমবাহ সমভূমি দেখা যায়। তথাকার আগাসিস ও অন্য কয়েকটি হ্রদ গ্রাবরেখা সঞ্চয়ের ফলে ভরিয়া গিয়াছিল। এসকল অংশ ক্রমশঃ হিমবাহ সমভূমির অন্তর্গত হইয়াছে। তবে এখনও এখানকার কতক অংশে জলাভূমি আছে।

(গ) বায়ুপ্রবাহের পরিবহন ও সঞ্চয়কার্য

ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩২০-৪৮০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত উঁচু বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে ঘিরিয়া আছে। সূর্যের তাপের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। আর উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের

সংস্পর্শে বায়ুমণ্ডলের নিম্নতম অংশ উত্তপ্ত হয়। এখানকার উষ্ণ মরুভূমির বালুকা, পাথরের টুকরা প্রভৃতি সহজেই অধিক উত্তপ্ত হয়। এরূপ অবস্থায় কখন কখন উষ্ণ মরুভূমি হইতে উত্তপ্ত বায়ু প্রবলবেগে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহ ছোট পাথরের টুকরা ও বালুকারাশিকে বহু দূর পর্যন্ত **বহন** করিয়া থাকে। সাহারা ও আরব মরুভূমির এপ্রকার বালুকাঝড়কে* (dust devil) **সাইমুম** (simoom) বলে। পূর্ব তুর্কীস্থানের তারিম উপত্যকাতে এরূপ বালুকাঝড়কে বলে **কারাবুরান** (karaburan)। দিল্লীর আশপাশে গ্রীষ্মকালে বৈকালের দিকে প্রবাহিত বালুকা ঝড়কে বলে আঁধি।

বায়ুপ্রবাহের **সঞ্চয়কার্যও** উল্লেখযোগ্য। উষ্ণ মরুভূমির **উত্তপ্ত বায়ু** বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় তাহার সহিত প্রচুর **বালুকাও** প্রবাহিত হয়। তাহা পথিমধ্যে বড় পাথরের গায়ে বাধা পাইলেই তথায় বালুকাস্তূপ সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তথায় **বালিয়াড়ি** বা বালুকার ঢিবি (sand-dunes) সৃষ্টি হয় (৫২নং চিত্র)। বালুকার পরিমাণ, বায়ুপ্রবাহের দিক্ ও গতিবেগ প্রভৃতি বিষয়ের পার্থক্যের ফলে **বালিয়াড়ি নানা প্রকারের**। সাহারা মরুভূমি ও আমাদের দেশের থর মরু অঞ্চলে বালিয়াড়িপূর্ণ অংশ বহুদূর বিস্তৃত। এরূপ অংশকে বলা হয় এর্গ (Erg)। মরু অঞ্চলের কোন কোন অংশে প্রস্তরই অধিক। **সাহারার** পূর্বদিকের অংশের অবস্থা এরূপ। এপ্রকার প্রস্তরময় মরুভূমিকে বলে **হামাদা** (Hamada)। সাহারার কতক অংশে পাথরের অসংখ্য টুকরা পুঞ্জীভূত অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাকে বলে **রেগ** (Reg)। বিভিন্ন মরুভূমির কতক বালিয়াড়ি অত্যন্ত দীর্ঘ। এপ্রকার বালিয়াড়িকে বলে **সীফ বালিয়াড়ি** (Seif dune)। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় এক কিঃ মিঃ হইতে পারে। বালিয়াড়ির বাহির দিককে, অর্থাৎ যে দিক্ হইতে বায়ুর সহিত বালুকা প্রবাহিত হয় তাহাকে বলা হয় **বালিয়াড়ির মস্তক** (Head dune)। আর বালিয়াড়ির ভিতর দিককে, অর্থাৎ যে দিকে বালুকা সঞ্চিত হয় তাহাকে বলা হয় **বালিয়াড়ির পুচ্ছ** (Tail)। অর্ধ-চন্দ্রের মত বাঁকা বালিয়াড়িকে বলে **বারখান** (Barkhan) (৫৩নং চিত্র)। কখন কখন বায়ুপ্রবাহের সহিত বালুকারাশি বহু দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। কাজেই

৫২নং চিত্র।

৫৩নং চিত্র—বারখান।

মরুভূমি ও সমুদ্রের উপকূলের বালুকাময় অংশ হইতে বহু দূরেও বালুকা সঞ্চিত হয়। যেমন, সাহারা মরুভূমির প্রবল **সিরক্কো** (Sirocco) বায়ু ভূমধ্যসাগর পার হইয়া ইটালীর দুই পাশ দিয়া ফ্রান্সের দক্ষিণ অংশ পর্যন্ত পেঁছে। তাহা কখন কখন ইংলণ্ডের নিকট পর্যন্তও পেঁছে। ফলে, ঐ সকল স্থানে দেখা যায় সাহারার **লাল বালুকাস্তর** সঞ্চিত রহিয়াছে। মধ্য এশিয়ার গোবি মরুভূমির হলুদ বালুকা-

* এপ্রকার ঝড়ের সময় চারিদিক অন্ধকার হইয়া যায়। কখন কখন সূর্যও দেখা যায় না।

রাশি বায়ু বেগে প্রবাহিত হইয়া চীন দেশে হোয়াং হো নদীর উপত্যকাতে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়। ইহা দ্বারা তথায় সৃষ্টি হইয়াছে বিখ্যাত **লোয়েস (Loess) সমভূমি বা নিম্ন মালভূমি**। তথায় সঞ্চিত বালুকারাশি স্থানে স্থানে ৩০০ মিঃ গভীর। সাহারা মরুভূমির বালুকারাশি বায়ুবেগে নীলনদের উর্বর উপত্যকাতে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া তথাকার মরুদ্যানগুলির ক্ষতি করিতে পারে এরূপ ভয় আছে। কাজেই ঐ মরুদ্যানগুলিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বায়ুপ্রবাহের পথে সারি
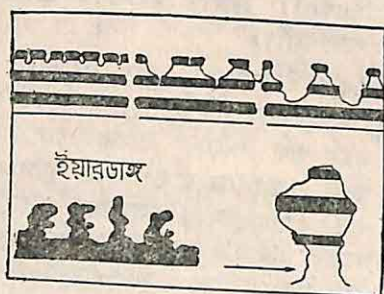
৫৪নং চিত্র।

সারি বাবলা (acacia), খেজুর ও ইউক্যালিপ্টাস প্রভৃতি গাছ রোপণ করা হইয়াছে। কখন কখন মরুভূমির বায়ুপ্রবাহের সহিত প্রবাহিত বালুকার ঘর্ষণে মরুভূমির প্রস্তরস্তূপ আংশিকভাবে ক্ষয় হইয়া থাকে। তাহার ফলে স্তূপসমূহ জুগেন, ইয়ারডাঙ্গা, গৌর প্রভৃতি আকৃতি ধারণ করে (৫৪নং চিত্র)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আঞ্চলিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক ভূগোল (Regional, Economic and Human Geography)

নবম অধ্যায়

ভারতের অবস্থিতি ও রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠন (Location of India and reorganisation of the country)

ভারতের অবস্থিতি

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি **ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র** বা ভারত দক্ষিণ এশিয়ার মধ্য ভাগে অবস্থিত। ১৯৪৭ খ্রীঃ দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত এ-দেশের নাম ছিল ভারতবর্ষ। তাহার পর হইতে এদেশ স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা ভারত নামে পরিচিত। এদেশ

আমাদের জন্মভূমি। এজন্য স্বভাবতঃ আমরা গৌরব বোধ করি। তাহাছাড়া এদেশের অতীত কালের অসামান্য উন্নতির আমরা ন্যায্য উত্তরাধিকারী। তাহা আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়। এজন্য কবির কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা সকলেই বলি, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি"।

ভারতের **মূল ভূভাগের** (main land) **দক্ষিণ সীমার** অর্থাৎ কুমারিকা অন্তরীপের অক্ষাংশ প্রায় ৮°৪′ উঃ অঃ, আর **উত্তর সীমার** অর্থাৎ জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত পারপাক লার অক্ষাংশ প্রায় ৩৭°৬′ উঃ অঃ। ফলে, কাল্পনিক **কর্কটক্রান্তি রেখা** (২৩½° উঃ অঃ) এদেশের প্রায় মধ্য ভাগ দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, দুর্গাপুর প্রভৃতি এই রেখার আশপাশে। এদেশের অন্তর্গত **আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ সীমা** পিগম্যালিয়ান পয়েন্ট ৮° উঃ অঃ-এর দক্ষিণে অবস্থিত। তারপর এদেশের **পশ্চিম সীমার** অর্থাৎ গুজরাটের পশ্চিম সীমার লালপতের দেশান্তর প্রায় ৬৮°৭′ পূঃ দ্রাঃ এবং এদেশের **পূর্ব সীমার** অর্থাৎ অরুণাচল প্রদেশের পূর্ব সীমাতে অবস্থিত চৌকান লার দেশান্তর প্রায় ৯৭°২৫′ পূঃ দ্রাঃ। কাজেই কাল্পনিক ৮২½° পূঃ দ্রাঃ রেখা এদেশের প্রায় মধ্য ভাগে অবস্থিত এলাহাবাদের পাশ দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এদেশের এপ্রকার অবস্থিতি এবং দেশের দক্ষিণ অর্ধাংশের প্রায় ত্রিকোণ আকৃতির ফলে এদেশের **আয়তন** প্রায় ৩২·৭৪ লক্ষ বর্গ কিঃ মিঃ। পৃথিবীর সমুদয় দেশের মধ্যে আয়তন হিসাবে ভারতের স্থান সপ্তম, এশিয়াতে দ্বিতীয় (কেবল চীনের* পরে)।

ভারতের উপরিলিখিত রূপ অবস্থিতির ফলে দেশের দক্ষিণ অর্ধাংশ উষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ও উত্তর অর্ধাংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত। সেজন্য এদেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে **জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, কৃষিজ সম্পদ্** প্রভৃতি সম্পর্কে বৈচিত্র্য খুব বেশী। অবশ্য এসকল বিষয়ে এদেশের বিভিন্ন অংশের ভূপ্রকৃতি, ভূগঠন প্রভৃতির পার্থক্যের প্রভাবও প্রচুর। তারপর এদেশের পূর্ব ও পশ্চিম সীমার মধ্যে প্রায় ২৯° দেশান্তরের পার্থক্য। ফলে, এই দুই সীমার মধ্যে **স্থানীয় সময়ের** (local time) **পার্থক্য** প্রায় দুই ঘন্টা। অর্থাৎ অরুণাচল প্রদেশের পূর্ব সীমাতে যখন কোন দিন ভোরে স্থানীয় সময় সকাল ৬টা (6 a.m.), তখন গুজরাটের পশ্চিম সীমাতে স্থানীয় সময় শেষ রাত্রি ৪টা (4 a.m.)। স্থানীয় সময় সম্পর্কে এপ্রকার পার্থক্যের ফলে এদেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সময়ের হিসাবের ও কাজকর্মের অসুবিধা হইতে পারে। তাই এরূপ অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে দেশের প্রায় **মধ্য ভাগে** অবস্থিত এলাহাবাদের নিকটবর্তী স্থানের **দেশান্তর** অর্থাৎ ৮২½° পূঃ দ্রাঃ অনুসারে **ভারতের প্রমাণ কাল** (Indian Standard Time or I. S. T.) স্থির করা হইয়াছে।

ভারতের অবস্থিতি সম্পর্কে আরও কয়েকটি বিষয়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন, মধ্য-এশিয়ার ঠিক দক্ষিণদিকে **ভারত** এরূপ স্থানে অবস্থিত যে ইহাই **পূর্ব গোলার্ধের কেন্দ্রস্থল**। কারণ, এদেশের উত্তরদিকে পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূভাগ। পশ্চিমে পশ্চিম এশিয়া এবং আরবসাগর ও ভারত

---

* সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে। এদেশের বৃহত্তর অংশ এশিয়ার অন্তর্গত, আর ক্ষুদ্রতর অংশ ইওরোপের অন্তর্গত। এদেশের বেশীর ভাগ মানুষ ইওরোপীয় অংশে বাস করে। অর্থনৈতিক হিসাবেও সেই অংশই অধিক উন্নত।

মহাসাগরের পশ্চিমদিকে আফ্রিকা। আর এদেশের পূর্বদিকে দক্ষিণপূর্ব ও পূর্ব এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরের পূর্বদিকে অস্ট্রেলিয়া। এদেশের অবস্থিতি সম্বন্ধে কতক অসুবিধাও আছে। যেমন, ভারতের উত্তর সীমা দিয়া পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয় পূর্ব-পশ্চিমদিকে বিস্তৃত। ফলে, ভারত হইতে উত্তরদিকে সহজ যোগাযোগের ব্যবস্থা নাই। হিমালয়ের কয়েকটি গিরিপথের মধ্য দিয়া কেবল মাত্র গ্রীষ্মকালে স্থলপথে যাতায়াত ও কিছু মালপত্র পরিবহন সম্ভবপর। তবে তাহাও যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। ভারতের পশ্চিমে **আরব সাগর** ও দক্ষিণে **বঙ্গোপসাগর** এবং উভয়ের দক্ষিণে **ভারত মহাসাগর**। এদেশের জলবায়ু সম্পর্কে এদেশের এপ্রকার অবস্থিতির গুরুত্ব খুব বেশী। প্রধানতঃ একারণেই এদেশের উপর দিয়া বর্ষাকালে আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহার ফলেই এদেশে বর্ষাকালে বৎসরের প্রায় ৯০% বৃষ্টি হয়। এদেশের বিপুল কৃষিজ সম্পদ্ উৎপাদন সম্পর্কে এই বৃষ্টি-পাতের গুরুত্ব খুব বেশী। এই কৃষিজ সম্পদ্ এক দিকে সরবরাহ করে এদেশের প্রায় ৭০ কোটি লোকের খাদ্যসম্ভার। অন্য দিকে এদেশের নানাপ্রকার কৃষিজ সম্পদ্ই এখানকার বিভিন্ন প্রকার শিল্পের উন্নতির মূল কারণ। আবার এসকল শিল্পই এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির অন্যতম কারণ। অর্থাৎ এদেশের প্রায় সকল বিষয়েই লক্ষ্য করা যায় দক্ষিণদিকের সাগর, মহাসাগরের **অবস্থিতির প্রভাব** খুব বেশী। এসম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পৃথিবীর আর কোন মহাসাগরই কোন দেশের নামে পরিচিত নয়। তাহাছাড়া দক্ষিণদিকে সাগরাদির অবস্থিতির ফলেই ভারতের উপকূল অঞ্চলের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬৫০ কিঃ মিঃ এবং এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে ১৫০টির অধিক **সমুদ্র-বন্দর**। তারপর আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের সমুদ্র-পথেই অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সহিত আমাদের দেশের যোগাযোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তন্মধ্যে এদেশের দক্ষিণে সিংহল (বর্তমান শ্রীলঙ্কা), দক্ষিণ-পূর্বে শ্যামদেশ (থাইল্যান্ড), কম্বোজ (ক্যাম্বো-ডিয়া), যবদ্বীপ (জাভা), বলিদ্বীপ (বালি) প্রভৃতির সহিত এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব, আফ্রিকার উপকূলভাগ, আরও দূরে ইওরোপের বিভিন্ন অংশের সহিত বহু-কাল পূর্ব হইতে আমাদের ব্যবসাবাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বরবুদর, এঙ্কোরবাট প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন মন্দির ও অন্যান্য শিল্পকার্য **ভারতীয় সংস্কৃতির** নিদর্শন।

পরবর্তীকালেও দক্ষিণদিকের **সমুদ্র পথেই** আরব, আফ্রিকার কতক দেশ ও ইওরোপের ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের লোক এদেশে আসিয়াছে। তাহারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদিগকে প্রায় ১৯০ বৎসর (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রীঃ) থাকিতে হইয়াছিল মুখ্যতঃ ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ অধীনে। এখনও সমুদ্রপথেই দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, পূর্বদিকে মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান প্রভৃতি, উত্তরে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র এবং সুদূর যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতির সহিত আমাদের **ব্যবসা, বাণিজ্যের** পরিমাণ খুব বেশী।

রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠনের পটভূমিকা (background)—১৭৫৭ খ্রীঃ **পলাশীর** যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতভূমির শাসনকার্য বিভিন্ন সময়ে পরিচালনা করিয়াছেন এদেশের হিন্দু রাজা ও সম্রাট এবং **মুসলমান** বাদশাহগণ। তাঁহারা এদেশেই বসবাস করিতেন। অবশ্য কেহ কেহ বিদেশ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। ঐ রূপ কোন কোন সময়ে ভারতের রাজনৈতিক সীমা পূর্ব ও পশ্চিমে এখনকার সীমার চেয়ে

বেশী দূর বিস্তৃত ছিল। তারপর ১৭৫৭ খ্রীঃ **পলাশীর যুদ্ধে** বাংলার নবাব সিরাজ-দ্দৌল্যার পরাজয়ের সুযোগে ইংরেজগণ ক্রমশঃ প্রায় সমগ্র **ভারতের শাসনকার্য** হস্তগত করে। তখন হইতে যুক্তরাজ্যের রাজা বা রাণীর নির্দেশে এদেশের শাসনকার্য চলিত। সে দেশের স্বার্থে এদেশের বৃহত্তর অংশকে বিভক্ত করা হইয়াছিল কয়েকটি **গভর্ণর-শাসিত প্রদেশে** ও **চীফ-কমিশনার-শাসিত ক্ষুদ্র প্রদেশে**। আর দেশের বিভিন্ন অংশে রাখা হইয়াছিল ৬০০-এর অধিক দেশীয় রাজ্য বা সামন্ত রাজ্য। তাহাদের ভাষায় এগুলি ছিল 'Native states'। তবে এই রাজ্যগুলিকে বলা হইত **'স্বাধীন রাজ্য'**। কিন্তু কার্যতঃ এগুলির সহিত ইংরেজ সরকারের সরাসরি (direct) যোগাযোগ ছিল। ইংরেজ সরকারই খাজনা বা রাজস্ব (revenue) আদায় ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ (control) করিত। এদেশে ইংরেজ শাসনের সময় চন্দননগর, পণ্ডিচেরী প্রভৃতি দেশের সামান্য কয়েকটি স্থান **ফরাসীদের** ও গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি কয়েকটি স্থান **পর্তুগীজদের অধীন** ছিল।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠনের সূত্রপাত

১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধের পর হইতেই দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হয়। পরাধীন অবস্থায় এদেশে চরম অত্যাচার হইয়াছে। **স্বাধীনতা সংগ্রাম** উপলক্ষে আমাদের পূর্বপুরুষগণ দীর্ঘকাল অসামান্য কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহারও তুলনা নাই। তাহার ফলে ১৯৩৭ খ্রীঃ ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ হয় ও ১৯৪৮ খ্রীঃ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস লাভ করে। আর ১৯৪৭ খ্রীঃ **১৫ই আগস্ট** (বস্তুতঃ ১৪ই আগস্ট মধ্য রাত্রি) ইংরেজ সরকার ভারতের হিন্দুপ্রধান ও মুসলমান-প্রধান অংশের ভিত্তিতে দেশকে **দুই ভাগে বিভক্ত করে**। উভয় দেশকে তাহারা **ডোমিনিয়নের মর্যাদা** (Dominion status) দিয়া তাহারা এদেশ ছাড়িয়া যায়। এক ভাগ হইল **ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র** বা ভারত, অপর ভাগ পাকিস্তান। (পাকিস্তানে ১৪ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়।) পাকিস্তানের তখন ছিল দুই ভাগ—**পশ্চিম পাকিস্তান** ও **পূর্ব পাকিস্তান**। এই ঘটনার প্রায় একই সময়ে **ফরাসীগণ** এবং পরে **পর্তুগীজগণও** এদেশ ছাড়িয়া যান। এভাবে ধীরে ধীরে ভারতের **সমুদয় অংশ ভারত সরকারের অধীন** হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠন

১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতে ছিল **১১টি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশ** (Provinec), **৫টি চীফ-কমিশনার-শাসিত প্রদেশ** এবং ৬০০-এর **অধিক স্বাধীন দেশীয় বা সামন্ত রাজ্য**। দেশের শাসন ভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠন এবং অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নতিবিধানের জন্য সচেষ্ট হন। ফলে, ১৯৫০ খ্রীঃ **২৬শে জানুয়ারী ভারত সার্বভৌম গণতন্ত্র রাষ্ট্রে** (Sovereign Democratic Republic) পরিণত হয়। অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে ঐ বৎসরই **প্ল্যানিং কমিশন** গঠিত হয়।

১৯৪৭ খ্রীঃ হইতেই এদেশে রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ * আরম্ভ হয়। —যেমন, **ঐ সময়ই** বড়, ছোট কতক 'স্বাধীন' রাজ্য তাহাদের **পৃথক্ অস্তিত্ব** বজায়

* আগেকার বঙ্গদেশের পশ্চিম অংশ লইয়া গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ঐ সময় হইতে গভর্ণর-শাসিত রাজ্য।

রাখিয়া অর্থাৎ অন্য কোন রাজ্যের সহিত মিশিয়া না গিয়া **ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের** অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে **জম্মু ও কাশ্মীর** এবং **হায়দরাবাদ**, এই দুই প্রাক্তন বৃহৎ দেশীয় রাজ্য, তাহাদের তুলনায় ক্ষুদ্র **মহীশূর** রাজ্য এবং **ত্রিপুরা, মণিপুর** প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। ফরাসীদের শাসনমুক্ত **পণ্ডিচেরীও** অন্য কোন প্রদেশ বা রাজ্যের সহিত মিশিয়া যায় নাই। অন্য দিকে তখনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের মধ্যে অনেকগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া **রাজপ্রমুখ-শাসিত রাজ্যে** পরিণত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে **রাজপুতনার** প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যগুলির উদাহরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার কতক আগেকার **দেশীয় রাজ্য** এবং **বিদেশী শাসনমুক্ত অংশ পার্শ্ববর্তী গভর্ণর-শাসিত প্রদেশের সহিত মিলিত** হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের আয়তন এবং **সীমা** সম্বন্ধেও কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। যেমন, ফরাসী শাসনমুক্ত **চন্দননগর** (১৯৫৪ খ্রীঃ) এবং স্বাধীন রাজ্য **কোচবিহার** (১৯৬০ খ্রীঃ) **পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত** হইয়াছে। বিহারের কাটিহারের কতক অংশ এবং পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (১৯৫৬ খ্রীঃ)। ইহার পর পর্তুগীজদের শাসন হইতে মুক্ত হইয়া দাদরা ও নগর হাভেলি এবং গোয়া, দমন, দিউ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (১৯৬২ খ্রীঃ)। ইহাদের নিজ নিজ সীমা বজায় আছে।

এদেশের রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের **ভাষা**, আগেকার রাজ্যসমূহের **সীমারেখা, দেশের বিভিন্ন সম্পদ্‌** ও তাহাদের ব্যবহারের বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। সম্পূর্ণ ভাষাভিত্তিক পুনর্বিন্যাস করিলে বহু নূতন **সমস্যার** সৃষ্টি হইতে পারে এরূপ আশঙ্কায় ঐ ব্যবস্থা পুরোপুরি পালিত হয় নাই। ১৯৫৩ খ্রীঃ আগেকার হায়দরাবাদ রাজ্যের অধিকাংশ ও মাদ্রাজ প্রদেশের কতক অংশ লইয়া **অন্ধ্র প্রদেশ** নামে **নূতন রাজ্যের** সৃষ্টি হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশের বাকী অধিকাংশ স্থানের নামকরণ হইয়াছে তামিলনাড়ু। ইহার পর ১৯৫৬ খ্রীঃ ১লা নভেম্বর এদেশের রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠনের ফলে এদেশে সৃষ্টি হইয়াছে **১৪টি গভর্ণর-শাসিত রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্র-শাসিত রাজ্য,** অর্থাৎ মোট ২০টি রাজ্য। এই ব্যবস্থার ফলে জম্মু ও কাশ্মীর এবং রাজপুতনার রাজপ্রমুখ-শাসিত অঞ্চলও গভর্ণর-শাসিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। তাহার পর আসাম অঞ্চলের পরিবর্তন হইয়াছে সবচেয়ে বেশী। এখানকার **উত্তর-পূর্ব অংশকে** লইয়া **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল** (North-east Frontier Agency or N E F A) ও তাহার দক্ষিণে **নাগাপাহাড়-টুয়েনসাঙ্গ অঞ্চল** নামে দুই কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। পরে (১৯৭১ খ্রীঃ) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের নাম হইয়াছে **অরুণাচল প্রদেশ**। আর নাগাপাহাড়-টুয়েনসাঙ্গ অঞ্চলের নাম হইয়াছে (১৯৭২ খ্রীঃ) **নাগাল্যান্ড**। তাহা গভর্ণর-শাসিত রাজ্য। ১৯৭০ খ্রীঃ আসামের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণদিকের মালভূমি অঞ্চলকে লইয়া **মেঘালয়** নামে নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা গভর্ণর-শাসিত রাজ্য। আসামের দক্ষিণ সীমার অর্থাৎ ত্রিপুরার পূর্বদিকের মিজো পাহাড় অঞ্চলকে লইয়া (১৯৭১ খ্রীঃ) গঠিত হইয়াছে **মিজোরাম** রাজ্য। তাহা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল।

১৯৫৬ খ্রীঃ ১লা নভেম্বরের পরে দেশের অন্যান্য অংশেও রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ হইয়াছে। যেমন, ১৯৬০ খ্রীঃ ২রা মে আগেকার বোম্বাই রাজ্যের উত্তর অংশকে লইয়া গঠিত হইয়াছে নূতন **গুজরাট** রাজ্য। আর দক্ষিণ অংশের নাম হইয়াছে **মহারাষ্ট্র**। দুই রাজ্যই গভর্ণর-শাসিত। তারপর মহীশূর রাজ্যের

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক বিভাগসমূহ

গভর্ণর-শাসিত রাজ্য (২৫)

রাজ্য	রাজধানী	আয়তন (হাজার বর্গ কিমি)	আয়তন হিসাবে পর্যায়	লোকসংখ্যা ১৯৮১ খ্রীঃ (লক্ষ)	লোকসংখ্যা হিসাবে পর্যায়
মধ্য প্রদেশ	ভূপাল	৪৪৩	১	৫২২	৬
রাজস্থান	জয়পুর	৩৪২	২	৩৪৩	৯
মহারাষ্ট্র	বোম্বাই	৩০৮	৩	৬২৮	৩
উত্তর প্রদেশ	লক্ষ্মৌ	২৯৪	৪	১১০৯	১
অন্ধ্র প্রদেশ	হায়দরাবাদ	২৭৫	৫	৫৩৫	৫
জম্মু ও কাশ্মীর**	শ্রীনগর	২২২	৬	৬০	১৬
গুজরাট	গান্ধীনগর	১৯৬	৭	৩৪১	১০
কর্ণাটক	ব্যাঙ্গালোর	১৯২	৮	৩৭১	৮
বিহার	পাটনা	১৭৪	৯	৬৯৯	২
উড়িষ্যা	ভুবনেশ্বর	১৫৬	১০	২৬৪	১১
তামিলনাড়ু	মাদ্রাজ	১৩০	১১	৪৮৪	৭
পশ্চিমবঙ্গ	কলিকাতা	৮৯	১২	৫৪৬	৪
আসাম*	দিসপুর	৭৮	১৩	১৯৯	১৩
হিমাচল প্রদেশ	সিমলা	৫৬	১৪	৪৩	১৭
পঞ্জাব	চণ্ডীগড়	৫০	১৫	১৬৮	১৪
হরিয়ানা	"	৪৪	১৬	১২৯	১৫
কেরালা	ত্রিবান্দ্রম্	৩৯	১৭	২৫৪	১২
মেঘালয়	শিলং	২২·৪	১৮	১৩	২০
মণিপুর	ইম্ফল	২২·৩	১৯	১৪	১৯
মিজোরাম	আইজল	২১	২০	৪·৯	২৪
নাগাল্যাণ্ড	কোহিমা	১৭	২১	৮	২২
ত্রিপুরা	আগরতলা	১০·৫	২২	২১	১৮
অরুণাচল প্রদেশ	ইটানগর	৮·৪	২৩	৬·৩	২৩
সিকিম	গ্যাংটক	৭	২৪	৩	২৫
গোয়া	পানাজি	৩·৭	২৫	১০	২১

* আনুমানিক।

** এই রাজ্যের কতক অংশ চীনের ও কতক অংশ পাকিস্তানের দখলে আছে।

২০-২-১৯৮৭ হইতে অরুণাচল প্রদেশ ও মিজোরাম এবং ৩০-৫-১৯৮৭ হইতে গোয়া গভর্ণর-শাসিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

কেন্দ্র-শাসিত রাজ্য (৭)

রাজ্য	রাজধানী	আয়তন (শত বর্গ কিঃ মিঃ)	আয়তন হিসাবে পর্যায়	লোকসংখ্যা ১৯৮১ খ্রীঃ (হাজার)	লোকসংখ্যা হিসাবে পর্যায়
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীঃ পুঃ	পোর্ট ব্লেয়ার	৮২	১	১৮৯	৪
দিল্লী	দিল্লী	১৫	২	৬২২০	১
পণ্ডিচেরী	পণ্ডিচেরী	৫	৩	৬০৪	২
দাদরা ও নগর হাভেলি	সিলভাসা	৫	৩	১০৪	৫
চণ্ডীগড়	চণ্ডীগড়	১·১	৫	৪৫২	৩
দমন, দিউ	পানাজি	১·১	৫	৭৯	৬
লক্ষ দ্বীপ	কাভারত্তি	০·৩	৭	৪০	৭

নূতন নামকরণ হইয়াছে **কর্ণাটক**। ইতিমধ্যে ১৯৬৬ খ্রীঃ ১লা নভেম্বর ভারতের অন্তর্গত পঞ্জাবের দক্ষিণ অংশকে লইয়া গঠিত হইয়াছে **হরিয়ানা** রাজ্য, উত্তর অংশের নাম পঞ্জাবই রাখা হইয়াছে। এই দুই রাজ্যই গভর্ণর-শাসিত। ইহার পরে কেন্দ্র-শাসিত হিমাচল প্রদেশের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহা পরে (১৯৭০ খ্রীঃ) **গভর্ণর-শাসিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছে**। ত্রিপুরা এবং মণিপুরও গভর্ণর-শাসিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। অন্যদিকে ফরাসী শাসনমুক্ত পণ্ডিচেরী এবং পর্তুগীজ শাসনমুক্ত গোয়া, দমন, দিউ **কেন্দ্র-শাসিত রাজ্যে** পরিণত হইয়াছে। আরও পরে ১৯৭৫ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে **সিকিম** বিধানসভা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পর হইতেই সিকিম ভারতের একটি গভর্ণর-শাসিত রাজ্য। শীঘ্রই অরুণাচল গভর্ণর-শাসিত রাজ্যে পরিণত হইতে পারে। আর চণ্ডীগড় পঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

উপরিলিখিত রূপ রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে এখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আছে নিম্নলিখিত ২২টি* গভর্ণর-শাসিত রাজ্য ও ৯টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ মোট ৩১টি রাজ্য বা রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগ। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (India, 1985 অনুসারে) নিম্নরূপঃ

গভর্ণর-শাসিত রাজ্য

রাজ্য	রাজধানী	আয়তন (হাজার বর্গ কিঃ মিঃ)	আয়তন হিসাবে পর্যায়	লোকসংখ্যা ১৯৮১ খ্রীঃ (লক্ষ)	লোকসংখ্যা হিসাবে পর্যায়
মধ্য প্রদেশ	ভূপাল	৪৪৪	১	৫২২	৬
রাজস্থান	জয়পুর	৩৪২	২	৩৪৩	৯
মহারাষ্ট্র	বোম্বাই	৩০৮	৩	৬২৮	৩
উত্তর প্রদেশ	লক্ষ্ণৌ	২৯৪	৪	১১০৯	১
অন্ধ্র প্রদেশ	হায়দরাবাদ	২৭৫	৫	৫৩৫	৫
জম্মু ও কাশ্মীর**	শ্রীনগর	২২২	৬	৬০	১৬
গুজরাট	গান্ধীনগর	১৯৬	৭	৩৪১	১০
কর্ণাটক	ব্যাঙ্গালোর	১৯২	৮	৩৭১	৮
বিহার	পাটনা	১৭৪	৯	৬৯৯	২
উড়িষ্যা	ভুবনেশ্বর	১৫৬	১০	২৬৪	১১
তামিলনাড়ু	মাদ্রাজ	১৩০	১১	৪৮৪	৭
পশ্চিমবঙ্গ	কলিকাতা	৮৯	১২	৫৪৬	৪
আসাম†	দিসপুর	৭৮	১৩	১৯৯	১৩
হিমাচল প্রদেশ	সিমলা	৫৬	১৪	৪৩	১৭
পঞ্জাব	চণ্ডীগড়	৫০	১৫	১৬৮	১৪
হরিয়ানা	"	৪৪	১৬	১২৯	১৫

* ১৯৫৬ খ্রীঃ ছিল ১৪টি গভর্ণর-শাসিত রাজ্য। তাহার পরে সৃষ্টি হইয়াছে নিম্নলিখিত ৮টি গভর্ণর-শাসিত রাজ্য—নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, মণিপুর ও সিকিম।

** এই রাজ্যের কতক অংশ চীনের ও কতক অংশ পাকিস্তানের দখলে আছে।

† আনুমানিক।

রাজ্য	রাজধানী	আয়তন (হাজার বর্গ কিঃ মিঃ)	আয়তন হিসাবে পর্যায়	লোকসংখ্যা ১৯৮১ খ্রীঃ (লক্ষ)	লোকসংখ্যা হিসাবে পর্যায়
কেরালা	ত্রিবান্দ্রম্	৩৯	১৭	২৫৫	১২
মেঘালয়	শিলং	২২·৪	১৮	১৩	২০
মণিপুর	ইম্ফল	২২·৩	১৯	১৪	১৯
নাগাল্যাণ্ড	কোহিমা	১৭	২০	৮	২১
ত্রিপুরা	আগরতলা	১০·৫	২১	২১	১৮
সিকিম	গ্যাংটক	৭	২২	৩	২২

কেন্দ্র-শাসিত রাজ্য

রাজ্য	রাজধানী	আয়তন (শত বর্গ কিঃ মিঃ)	আয়তন হিসাবে পর্যায়	লোকসংখ্যা ১৯৮১ খ্রীঃ (হাজার)	লোকসংখ্যা হিসাবে পর্যায়
অরুণাচল প্রদেশ	ইটানগর	৮৩৭	১	৬৩২	৩
মিজোরাম	আইজল	২১১	২	৪৯৪	৫
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীঃ পুঃ	পোর্ট ব্লেয়ার	৮২	৩	১৮৯	৭
গোয়া, দমন, দিউ	পানাজি	৩৮	৪	১০৮৬	২
দিল্লী	দিল্লী	১৫	৫	৬২২০	১
দাদরা ও নগর হাভেলি	সিলভাসা	৫	৬	১০৪	৮
পণ্ডিচেরী	পণ্ডিচেরী	৫	৭	৬০৪	৪
চণ্ডীগড়	চণ্ডীগড়	১	৮	৪৫২	৬
লক্ষদ্বীপ	কাভারাত্তি	০·৩	৯	৪০	৯

দশম অধ্যায়

প্রতিবেশী দেশসমূহ
(Neighbouring countries)

ভারতের উত্তরদিকে নিকটতম প্রতিবেশী দেশ চীন, নেপাল ও ভুটান, পূর্বদিকে বাংলাদেশ ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা এবং উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তান ও আফগানিস্থান (৫৫নং চিত্র)। মাত্র ৪০ বৎসর পূর্বে ১৯৪৭ খ্রীঃ পাকিস্তান (তখনকার পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ সহ) ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ পৃথক্ হইয়াছে আরও ১০ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৯৩৭ খ্রীঃ। চারি পাশের এসকল দেশের সহিত ভারতের এক দিকে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ্, কৃষিজ সম্পদ্ প্রভৃতি বিষয়ে, অন্য দিকে মানবসমাজ, তাহাদের ভাষা, সংস্কৃতি

প্রভৃতি সম্পর্কে মিল খুব বেশী। এসকল দেশের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

নেপাল

অবস্থিতি ও আয়তন

হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে ভারতের ঠিক উত্তর সীমাতে নেপাল দেশ। ইহা পশ্চিমে ৮০° পূঃ দ্রাঃ এর সামান্য পূর্ব হইতে পূর্বদিকে ৮৮° পূঃ দ্রাঃ এর সামান্য পূর্ব পর্যন্ত এবং দক্ষিণে প্রায় ২৬½° উঃ অঃ হইতে উত্তরে ৩০° উঃ অঃ এর সামান্য উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশটির আকৃতি প্রায় আয়ত ক্ষেত্রের মত এবং আয়তন প্রায় ১·৪১ লক্ষ বর্গ কিঃ মিঃ ; অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের আয়তনের দেড় গুণের চেয়ে কিছু বেশী।
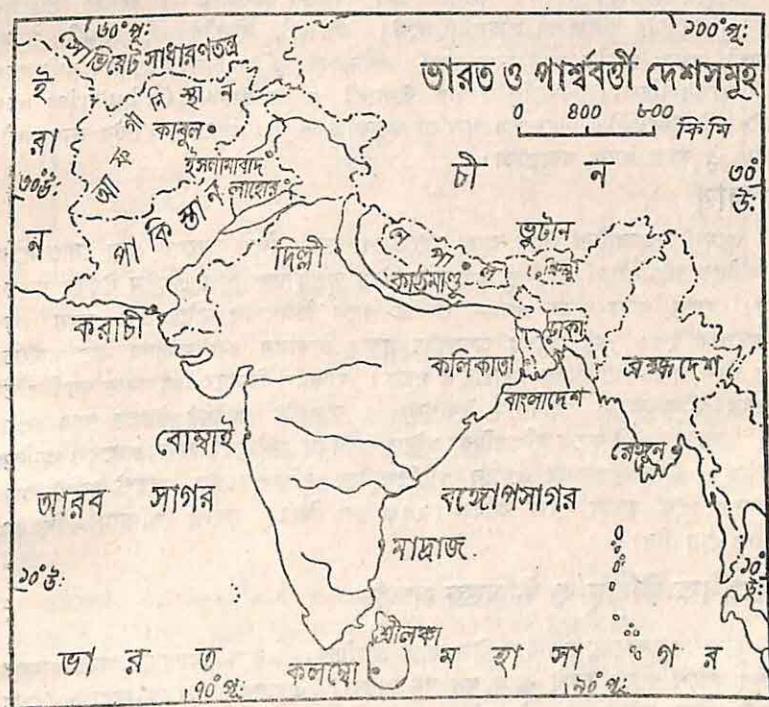
৫৫নং চিত্র।

এদেশের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ, এই তিন দিকেই ভারত এবং উত্তরে চীন দেশ (৫৬নং চিত্র)।

ভূপ্রকৃতি ও জলনিকাশ ব্যবস্থা

নেপাল একটি পর্বতময় দেশ। হিমালয়ের প্রধান শাখা হিমাগিরি এদেশের উত্তর অংশ দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে গিয়াছে। আর নিম্ন অবহিমালয় বা শিবালিক পাহাড়

এদেশের দক্ষিণ অংশ দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। পৃথিবীর পাঁচটি সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের মধ্যে দুইটি এদেশের উত্তর অংশে প্রধান হিমালয়ে অবস্থিত। তাহাদের মধ্যে পৃথিবীর **সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেস্ট** (৮৮৪৮ মিঃ) এদেশের উত্তর অংশে প্রায় চীনের সীমার নিকট অবস্থিত। ইহার অনেকটা পশ্চিমে পৃথিবীর চতুর্থ উচ্চতম শৃঙ্গ **ধবলগিরি** (৮১৭২ মিঃ)। এদেশে আছে আরও বহু পর্বত। এবং মাকালু (৮৪৭০ মিঃ), অন্নপূর্ণা (৮০৭৪ মিঃ) প্রভৃতি উচ্চ শৃঙ্গেও আছে এখানে। এদেশের কতক পর্বত উত্তর-দক্ষিণেও বিস্তৃত। এদেশের বিভিন্ন পর্বতের মাঝে মাঝে আছে অনেক **উপত্যকা**। তাহাদের মধ্যে **কাঠমণ্ডু উপত্যকা ও পোখরার সমভূমি** (পোখর=হ্রদ) বিখ্যাত। এসকল উপত্যকা পর্বতবেষ্টিত এবং ইহাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চমৎকার। দেশের দক্ষিণ অংশের তরাই একটি **সঙ্কীর্ণ সমভূমি** অঞ্চল।

এদেশে **নদ-নদী** অনেক। এগুলি উচ্চ পর্বতের বরফগলা জল ও এই অঞ্চলের মৌসুমী বৃষ্টির জলধারার সাহায্যে পুষ্ট। **কর্ণালী, কালীগণ্ডক, রাপ্তী, সপ্তকোশী, অরুণ** প্রভৃতি নদী বেশ বড়। এখানকার ভূমির ঢাল অনুসারে অধিকাংশ নদী **দক্ষিণবাহিনী**। এগুলি গঙ্গার উপনদী ও প্র-উপনদী (tributaries and sub-tributaries)। এদেশের পার্বত্য ভূপ্রকৃতি ও বর্ষা কালের বৃষ্টির জন্য নদীগুলি ঐ সময় থাকে **খরস্রোতা**।

জলবায়ু

এদেশ রাজস্থানের উত্তর অংশ হইতে পঞ্জাবের দক্ষিণ অংশের প্রায় সোজাসুজি পূর্বদিকে অবস্থিত। কিন্তু এখানকার উচ্চ ভূপ্রকৃতির জন্য এখানে উষ্ণতা অনেক কম। ফলে, **শীত কালে** এখানে উষ্ণতা থাকে **হিমাঙ্কের নীচে** এবং তখন প্রচুর **তুষারপাত** হয়। এই দেশের অন্তর্গত **প্রধান হিমালয়** এবং অন্যান্য বহু পর্বতের উচ্চ অংশ প্রায় সারা বৎসর **তুষারাবৃত** থাকে। অক্ষাংশ হিসাবে এখানকার অবস্থিতির প্রভাবে গ্রীষ্ম কালে এখানকার উপত্যকা ও সমভূমি অংশের উষ্ণতা প্রচুর (৩০-৩২° সেঃ)। বর্ষা কালে দক্ষিণদিক্ হইতে প্রবাহিত **মৌসুমী বায়ু** এদেশেও আসিয়া পৌঁছে। তাহার প্রভাবে এখানে পর্বতগুলির দক্ষিণ ঢালে যথেষ্ট **বৃষ্টি** হয়। এদেশের পূর্ব অংশে বৃষ্টি অধিক (২৫০ সেঃ মিঃ)। ক্রমশঃ পশ্চিমে বৃষ্টি কম (১০০ সেঃ মিঃ)।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ্

এদেশের জলবায়ু প্রধানতঃ উষ্ণ আর্দ্র প্রকৃতির। এরূপ জলবায়ুর জন্য এদেশের দক্ষিণ অংশে আছে **তরাই নামে ঘন বন** অঞ্চল। এখানকার গাছের মধ্যে পর্ণমোচী জাতীয় শাল, সেগুন এবং চিরহরিৎ জাতীয় শিশু, গর্জন প্রভৃতি প্রধান। এদেশে আর আছে প্রচুর বাঁশ ও বেতের ঝোপ। এদেশের মধ্য ভাগ হইতে উত্তরদিকে সাবুই ঘাস প্রচুর। এদেশের উত্তর অংশে **ওক, ম্যাপল** প্রভৃতি পর্ণমোচী গাছ এবং উপরদিকে **চীর, দেবদারু, পাইন, স্প্রুস, ফার, সাইপ্রেস, বার্চ** প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছ অনেক। এসকল গাছের কাঠ মূল্যবান্ এবং প্রচুর পরিমাণে **রপ্তানি** হয়। এদেশের উত্তর অংশে হিমালয়ের গায়ে বহু মূল্যবান্ ঔষধের গাছ জন্মে। এদেশের গভীর বন অঞ্চলে ভল্লুক, চিতাবাঘ, হাতী, মহিষ, চমরী, বানর, সাপ প্রভৃতি প্রাণী অনেক।

ভূমির সদ্ব্যবহার ও কৃষিজ সম্পদ্

এদেশে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত প্রচুর। তদুপরি আছে সেচের সুযোগ। তাই এদেশের উপত্যকা অঞ্চলে **কৃষি কার্য** উন্নত। এদেশ ও ভারতের সীমান্তে হনুমান-নগরে কোশী নদীর উপর এবং বাল্মীকিনগরে গণ্ডক নদীর উপর প্রকাণ্ড বাঁধ তৈরী হইয়াছে। তাহার ফলে প্রচুর **সেচ** ও **জলজ বিদ্যুৎশক্তি** সরবরাহের সুব্যবস্থা
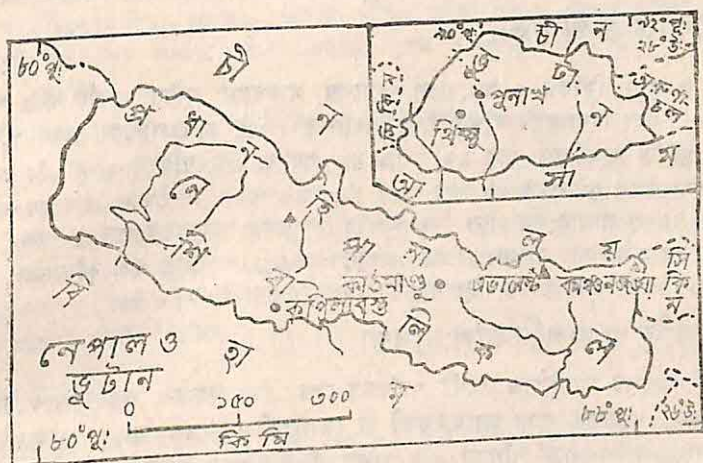
৫৬নং চিত্র।

হইয়াছে। এদেশের ফসলের মধ্যে ধান সর্বপ্রধান। তারপর পাট, ডাল, তৈলবীজ, আখ, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, গম, লঙ্কা, তেঁতুল প্রভৃতির স্থান। এদেশ হইতে প্রচুর ফসল রপ্তানি হয়। এদেশে কমলালেবু, কলা, আম প্রভৃতি ফলও জন্মে প্রচুর।

শিল্প

এদেশের **চট, থলে, চিনি, সিগারেট** প্রভৃতি শিল্প যথেষ্ট উন্নত। এগুলি এদেশের পাট, আখ, তামাক প্রভৃতি কৃষিজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। ১৯৬২ খ্রীঃ হইতে পরিকল্পনা অনুসারে এদেশের নানাবিষয়ে উন্নতি বিধান হইতেছে। এদেশে চর্ম, পশম, বাঁশ, বেত প্রভৃতির তৈরী কুটীর শিল্পও উন্নত।

অধিবাসী

এদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১½ কোটি (১৯৭৮ খ্রীঃ)। তাহাদের অধিকাংশ হিন্দু ও বৌদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই এক মাত্র হিন্দু রাষ্ট্র। এদেশ পর্বত ও বনময়। সেজন্য এখানে **লোকবসতির ঘনত্ব কম**। অধিবাসীদের প্রধান কাজ **কৃষি**। এখানকার অধিবাসিগণ খুব **সাহসী**। গোর্খাগণ সৈন্য বিভাগে এবং শেরপাগণ হিমালয় অভি-যানে দক্ষ।

নগরাদি

কাঠমণ্ডু উপত্যকাতে অবস্থিত কাঠমণ্ডু (১৩৭০ মিঃ উচ্চ ; লোকসংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ) এদেশের রাজধানী ও প্রধান নগর। ইহা অবাধ বাণিজ্যের (Free trade) কেন্দ্র। পোখরা সমভূমিতে অবস্থিত পোখরা একটি বড় শহর। দক্ষিণে তরাই অঞ্চলে অবস্থিত কপিলাবস্তু বা কপিলবাস্তু বুদ্ধদেবের জন্মস্থান।

ভুটান

অবস্থিতি ও আয়তন

ভারতের সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশের মাঝখানে ভুটান একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশ। ইহা **হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে** অবস্থিত। এই দেশ পশ্চিমে প্রায় ৮৯° পূঃ দ্রাঃ হইতে পূর্বদিকে প্রায় ৯২° পূঃ দ্রাঃ পর্যন্ত এবং দক্ষিণে ২৬½° উঃ অঃ এর সামান্য উত্তর হইতে উত্তরে প্রায় ২৮° উঃ অঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। এদেশের আয়তন প্রায় ৪৬·৬ হাজার বর্গ কিঃ মিঃ, অর্থাৎ নেপালের আয়তনের প্রায় ⅓ অংশ। ইহা ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের চেয়ে একটু বড়। নেপালের মত ভুটানেরও পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে ভারত, উত্তরে চীন দেশ (৫৬নং চিত্র)।

ভূপ্রকৃতি ও জলনিকাশ ব্যবস্থা

নেপালের মত ইহাও একটি **পর্বতময় দেশ** এবং ইহারও **উত্তর অংশ উচ্চতম**। এখানকার উচ্চতম শৃঙ্গ চোমোলহরী বা চুমলহারী (৭২৯৪ মিঃ)। এদেশেও বহু পাহাড়, পর্বত পূর্ব-পশ্চিমে এবং কতক উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। তন্মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত **কৃষ্ণ** পর্বত দ্বারা এদেশ প্রায় দুই ভাগে বিভক্ত। বিভিন্ন পাহাড়, পর্বতের মাঝখানে আছে অনেক উপত্যকা। তাহাদের মধ্যে থিম্পু উপত্যকা, পুনাখা উপত্যকা, প্যারো উপত্যকা প্রভৃতি যথেষ্ট বিস্তীর্ণ। তাহাদের তলদেশ প্রায় সমতল। এদেশের দক্ষিণ অংশের **ডুয়ার্স** একটি সংকীর্ণ সমভূমি অঞ্চল। এদেশে মার্বেল, চুনাপাথর, গ্র্যাফাইট, সীসা, তামা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়।

এদেশে **নদ-নদী** অনেক। সেগুলি উত্তরদিকের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের বরফগলা জল ও এখানকার প্রচুর মৌসুমী বৃষ্টির জল দ্বারা পুষ্ট। তাহাদের মধ্যে **তোর্সা, জলঢাকা, সঙ্কোশ, মানস** প্রভৃতি প্রধান। ভূমির ঢাল অনুসারে অধিকাংশ নদী **দক্ষিণবাহিনী** এবং ব্রহ্মপুত্রের উপনদী ও প্র-উপনদী। এদেশের পার্বত্য ভূপ্রকৃতি ও বর্ষা কালের অধিক বৃষ্টির জন্য এসময় নদীগুলি থাকে **খরস্রোতা**।

জলবায়ু

এদেশের উত্তর সীমা প্রায় দিল্লীর সমসূত্রে অবস্থিত। অথচ ভূমির উচ্চতার জন্য এদেশে শীতকালের উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে। এজন্য এদেশের বহু স্থান প্রায় সারা বৎসর তুষারাবৃত থাকে। এই উচ্চতার জন্য গ্রীষ্ম কালে এদেশের মধ্য ভাগের উষ্ণতা আরামদায়ক। দক্ষিণে **ডুয়ার্স** অঞ্চলে তখনকার উষ্ণতা অধিক। **বর্ষা কালে** দক্ষিণদিক হইতে মৌসুমী বায়ু এদেশের দিকে আসে। তাহার প্রভাবে তখন এখানে পর্বতগুলির দক্ষিণ ঢালে বৃষ্টি হয় খুব বেশী (২৫০ সেঃ মিঃর অধিক)।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ্

এদেশের দক্ষিণ অংশে আছে ডুয়ার্স সমভূমি। সেখানকার জলবায়ু উষ্ণ আর্দ্র প্রকৃতির। এজন্য এখানে নেপালের তরাই অঞ্চলের মত চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের মিশ্র ও অতিশয় ঘন বন আছে। এদেশের মধ্য অংশে পাহাড়, পর্বতের গায়ে আছে পর্ণমোচী গাছের বন। আর দেশের উত্তরদিকের উচ্চ অংশে আছে নেপালের উত্তর অংশের মত সরলবর্গীয় গাছের বন। এদেশের প্রায় ⅓ অংশ বনভূমি। এদেশের মধ্যভাগে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি আছে। শীত কালে এদেশের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের পশুপালকগণ ইয়াক বা চমরীগাই, মেষ, শূকর প্রভৃতি পশুর দল সহ সমভূমিতে নামিয়া আসে। আবার গ্রীষ্ম কালে তাহারা উপরে উঠিয়া যায়। এদেশেও প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়। এদেশের পশম ও কাঠের তৈরী ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প বিখ্যাত।

ভূমির সদ্ব্যবহার এবং কৃষিজ ও অন্যান্য সম্পদ্

এদেশে পাহাড়, পর্বতের ঢালে ধাপে ধাপে ও উপত্যকাসমূহের তলদেশের সমভূমিতে কৃষিকার্য হয়। ফসলের মধ্যে ভুট্টা প্রধান। তাহাছাড়া এদেশে কিছু গম, আলু, যব, বাজরা, ধান, সরিষা প্রভৃতি জন্মে। এদেশে প্রচুর আপেল, কমলালেবু, এলাচ প্রভৃতি জন্মে। এদেশ হইতে এসকল জিনিস ও পশমী জামা কাপড় রপ্তানি হয়। আর এদেশে ভারত হইতে আমদানি হয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, ঔষধপত্র, সিমেন্ট প্রভৃতি জিনিস।

লোকবসতি

এদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ (১৯৭৯ খ্রীঃ)। মধ্যভাগের উপত্যকাগুলিতে লোকবসতি অধিক, উত্তরদিকের পার্বত্য অংশে ও দক্ষিণদিকের বন অঞ্চলে লোক কম।

নগরাদি

এদেশের পশ্চিম অংশে প্যারো নদীর তীরে অবস্থিত থিম্পু এদেশের রাজধানী। পুনাখা, প্যারো, বুমথাং, ফুটশোলিং প্রভৃতি এদেশের অন্যান্য শহর।

বাংলাদেশ

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পূর্বদিকে বাংলাদেশ। ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৪ই আগস্ট মধ্য রাত্রিতে ভারতের অন্তর্গত অবিভক্ত বঙ্গদেশের পূর্বদিকের প্রায় ⅔ অংশ ও আসামের শ্রীহট্ট (Sylhet) জেলার বেশীর ভাগ লইয়া গঠিত হইয়াছিল পূর্ব পাকিস্তান। তখন হইতে ২৪ বৎসর তাহা ছিল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। তারপর ১৯৭১ খ্রীঃ ১৬ই ডিসেম্বর ইহা বাংলাদেশ নামে স্বাধীন দেশে পরিণত হয় (৫৭নং চিত্র)।

অবস্থিতি ও আয়তন

বাংলাদেশ দক্ষিণে প্রায় ২০½° উঃ অঃ হইতে উত্তরে প্রায় ২৬½° উঃ অঃ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে প্রায় ৮৮° পূঃ দ্রাঃ হইতে পূর্বদিকে ৯২½° পূঃ দ্রাঃ-র অধিক পর্যন্ত বিস্তৃত। এদেশের আয়তন প্রায় ১·৪৪ লক্ষ বর্গ কিঃ মিঃ, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের আয়তনের দেড় গুণের চেয়ে বেশী। নেপালের চেয়ে এদেশের আয়তন সামান্য বেশী।

দিকে পাহাড় অঞ্চলে তখনকার বৃষ্টির পরিমাণ এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী (৩০০-৩৫০ সেঃ মিঃ), ক্রমশঃ উত্তর ও পশ্চিমে কম (১৫০-২০০ সেঃ মিঃ)। শীতকালে এখানে বৃষ্টি হয় না।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ্

উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাবে এদেশের দক্ষিণ অংশে **সুন্দরবনে** ও পূর্বদিকে পাহাড়ের গায়ে আছে ঘন বন। সুন্দরবনে আছে গেঁওয়া, গরান, কেওড়া, হন্তাল, সুন্দরী প্রভৃতি গাছ। আর পূর্বদিকে পাহাড়ের গায়ে চাপলাস, জারুল, গর্জন, শিশু প্রভৃতি চিরহরিৎ গাছ ও বাঁশ, বেত অধিক জন্মে। এদেশে **সেগুন** ও মেহগিনি গাছও কিছু আছে। ইহাদের কাঠ বিশেষ মূল্যবান্।

ভূমির সদ্ব্যবহার ও কৃষিজ সম্পদ্

এদেশের পলিমাটি উর্বর। এদেশে প্রচুর মৌসুমী বৃষ্টি হয়। তাহার উপর আছে কিছু কিছু সেচের ব্যবস্থা। ফলে, এদেশের **কৃষিকার্য বিশেষ উন্নত**। কোন কোন জমিতে **বৎসরে** ৩/৪টি ফসল পর পর উৎপন্ন হয়। এদেশের **প্রধান ফসল** ধান। আউস, আমন ও বোরো—তিন রকম ধানই এদেশে জন্মে। এদেশে উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধানের পর **পাট**। এদেশে পাটের উৎপাদনের পরিমাণ সাধারণতঃ পৃথিবীতে প্রথম। তাহাছাড়া ডাল, তামাক, আখ, কার্পাস, তৈলবীজ, চা, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি এদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

শিল্পসম্ভার ও বৈদেশিক বাণিজ্য

এদেশের পাট **শিল্পের** স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয় (ভারতের পরে)। এদেশে চট, থলে, ত্রিপল, দড়ি প্রভৃতি অধিক তৈরী হয়। এই শিল্পের **প্রধান কেন্দ্র** ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম-সীতাকুণ্ড, ভৈরব বাজার-আশুগঞ্জ, মাদারিপুর প্রভৃতি। এদেশের **কার্পাস** বস্ত্র **শিল্পের** কেন্দ্র ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, কুষ্ঠিয়া প্রভৃতি। আর চিনির কল বেশী আছে কিশোরগঞ্জ, সেতাবগঞ্জ, দর্শনা, গোপালপুর প্রভৃতি স্থানে। চা তৈরীর কেন্দ্র শ্রীহট্ট। এই জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস ও চুনাপাথর পাওয়া যায়। এদেশের রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, কাগজ (নিউজ প্রিন্ট), কৃষিসার, সিমেন্ট, কাচ, তৈলশোধন, তামাক (সিগারেট), দিয়াশলাই, হোসিয়ারি প্রভৃতি শিল্পও উন্নত। এদেশের কুটীর শিল্পের মধ্যে তাঁতের কাপড়, কাঠ, মাটি, শাঁখা ও কাঁসা, পিতলের জিনিস, শীতল পাটি প্রভৃতি প্রধান। এদেশ হইতে ভারতে রপ্তানি হয় পাট, নিউজ প্রিন্ট (কাগজ), চর্ম প্রভৃতি। আর এদেশ ভারত হইতে আমদানি করে কয়লা, কার্পাস বস্ত্র, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি, সিমেন্ট, ঔষধ-পত্র ইত্যাদি।

লোকবসতি

এদেশের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৮·৯ কোটি (১৯৮০ খ্রীঃ)। এখানকার লোক-বসতির ঘনত্ব পশ্চিমবঙ্গের লোকবসতির ঘনত্বের মত। উভয় অংশের লোকের মধ্যে জীবনযাত্রার প্রণালী, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে মিল খুব বেশী। এদেশের ৮৫-৯০% লোক কৃষিজীবী ও গ্রামে বাস করে।

ভূপ্রকৃতি ও জলনিকাশ ব্যবস্থা

এদেশের প্রায় ৯/১০ অংশ **সমভূমি**, আর পূর্বদিকের প্রায় ১/১০ অংশ উচ্চভূমি। পশ্চিমবঙ্গের মত এদেশেরও সমভূমি অঞ্চলে **পলিমাটির** গভীরতা অন্ততঃ ১০০০ মিঃ। কাজেই এদেশের মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর। দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগরের **নিকটবর্তী** অংশ যথেষ্ট নীচু। তথায় নূতন নূতন **বালুচর, চর, দ্বীপ** প্রভৃতি সৃষ্টি হইতেছে। এদেশের **পূর্বদিকের** উচ্চভূমির দুইটি বিভাগ ; একটি উত্তর-পূর্বে, অন্যটি দক্ষিণ-পূর্বে। ইহাদের মাঝখানে আছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। এদেশের উত্তর-পূর্বদিকে কিছু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে মেঘালয়ের গারো পাহাড়ের কতক অংশ। আর দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে কতক নীচু পাহাড় প্রায় পাশাপাশি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। তন্মধ্যে সীতাকুণ্ডের **চন্দ্রনাথ** পাহাড় (১২২০ মিঃ) ও তাহার দক্ষিণদিকের **কেওক্রাডঙ** পাহাড় (১২৩০ মিঃ) একটু বেশী উঁচু।

৫৭নং চিত্র।

এদেশের **সর্বপ্রধান নদী পদ্মা**। বর্তমানে ইহাই **গঙ্গার** নিম্ন অংশের মূল পথ (main course)। ইহার কতক অংশ **কীর্তিনাশা** নামে পরিচিত। এদেশের অপর প্রধান নদী **যমুনা**। ইহা ব্রহ্মপুত্রের নিম্নদিকের অংশ। এদেশের আর একটি বড় নদী **মেঘনা**। এই তিন নদী পরস্পর মিলিত হইয়া দক্ষিণদিকে গিয়া মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এদেশ **গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের** ব-দ্বীপের পূর্ব অংশ (পশ্চিম অংশ পশ্চিমবঙ্গ)। এদেশের দক্ষিণ অংশে **রায়মঙ্গল, পশুর, হরিণঘাটা, বিষখালি, তেঁতুলিয়া** প্রভৃতি কতক নদী আছে। আর দেশের উত্তর অংশে আছে **তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই** প্রভৃতি নদী। এগুলি ব্রহ্মপুত্রের উপনদী।

জলবায়ু

এদেশের প্রায় মধ্যভাগের উপর দিয়া কল্পিত **কর্কটক্রান্তি** রেখা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। ফলে, এদেশে **গ্রীষ্মকালের** (মে-জুন মাস) **উষ্ণতা অধিক** (সাধারণতঃ ৩৩-৩৬° সেঃ)। দেশের দক্ষিণ অংশে **সমুদ্র উপকূলে** সমুদ্রের প্রভাবে উষ্ণতা কিছু কম (৩১-৩৩° সেঃ)। শীত কালে সমুদ্রের প্রভাবে দক্ষিণ অংশে **উষ্ণতা মধ্যম** রকম (১৫-১৮° সেঃ)। ক্রমশঃ উত্তরে তখনকার উষ্ণতা কম (৯-১০° সেঃ)। বর্ষাকালে দক্ষিণদিকের বঙ্গোপসাগর হইতে আর্দ্র **মৌসুমী বায়ু** এদেশের উপর দিয়া উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। তাহার প্রভাবে তখন এদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়। পূর্ব-

প্রধান নগরাদি

ঢাকা বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা এদেশের রাজধানী, সর্বপ্রধান নগর ও শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্র। আশপাশ সহ এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। চট্টগ্রাম দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা দেশের দ্বিতীয় নগর, প্রধান বন্দর ও বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। এই নগর পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর। শ্রীহট্ট সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা দেশের তৃতীয় নগর ও একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। চালনা, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালনন্দ, চাঁদপুর, ভৈরব বাজার, পশর, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি নদীবন্দর ও শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্র। রাজসাহী, পাবনা, কুমিল্লা প্রভৃতি বড় শহর।

ব্রহ্মদেশ

এদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ১৯৩৭ খ্রীঃ এবং ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস বা স্বায়ত্তশাসন লাভ করে ১৯৪৮ খ্রীঃ। এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ খ্রীঃ।

অবস্থিতি ও আয়তন

ভারতের অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও মিজোরামের এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ (৫৮নং চিত্র)। এদেশ দক্ষিণে প্রায় ১০° উঃ অঃ হইতে উত্তরে প্রায় ২৮½° উঃ অঃ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে প্রায় ৯২° পূঃ দ্রাঃ হইতে পূর্বদিকে প্রায় ১০১° পূঃ দ্রাঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। এদেশের প্রায় মধ্য ভাগে ২১-২২° উঃ অঃ-এর নিকট এদেশ পূর্ব-পশ্চিমে সবচেয়ে বেশী প্রশস্ত। এদেশের আকৃতি ও আয়তন তথা হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। দেশের উত্তর অংশকে বলে আপার বার্মা, দক্ষিণ অংশকে বলে লোয়ার বার্মা। এদেশের আয়তন প্রায় ৬·৮ লক্ষ বর্গ কিঃ মিঃ, অর্থাৎ ভারতের আয়তনের প্রায় ২০%। এদেশের উত্তরে ও পূর্বদিকে বহু দূর পর্যন্ত চীন দেশ। এদেশের দক্ষিণ-পূর্বদিকে সামান্য অংশ লাওস, বাকী অংশ থাইল্যান্ড। ব্রহ্মদেশের পশ্চিমদিকে অনেক দূর পর্যন্ত ভারত। তাহার দক্ষিণে সামান্য অংশ বাংলাদেশ। পশ্চিমদিকের বাকী অংশ ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর।

ভূপ্রকৃতি ও জলনিকাশ ব্যবস্থা

ব্রহ্মদেশের উত্তর অংশ কাচিন মালভূমি। এখানে কতক পাহাড়, পর্বতও আছে। এই অঞ্চল পশ্চিমদিকে হিমালয়ের পূর্ব অংশের সহিত ও পূর্বদিকে চীনের ইউনান মালভূমির সহিত যুক্ত। (তারপর এদেশের উত্তর-পশ্চিমদিকে ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশে আছে পাটকই বুম, নাগা, লুসাই প্রভৃতি পাহাড়।) এদেশের প্রায় মধ্য ভাগ হইতে পূর্বদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে প্রশস্ত সান মালভূমি। তাহার প্রায় দক্ষিণ সীমা হইতে দক্ষিণে দেশের প্রায় দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে টেনাসেরিম মালভূমি। আর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত আছে আরাকান উপকূলের সঙ্কীর্ণ সমভূমি। তাহার পূর্বদিক্ দিয়া আরাকান য়োমা (পাহাড়) উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। আরও পূর্বে দেশের প্রায় মধ্য ভাগ দিয়া পেগু য়োমা (পাহাড়) উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এদেশে কয়েকটি আগ্নেয়গিরিও আছে। দেশের প্রায় মধ্য ভাগ ইরাবতীর উপত্যকার সমভূমি। তাহার দক্ষিণে ইরাবতীর

প্রশস্ত বদ্বীপ। ইরাবতীর উপত্যকার ও বদ্বীপের সমভূমিতে প্রচুর কৃষিকার্য হয়। ইরাবতীর উপত্যকাতে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায়। এই সমভূমি অঞ্চলে শিল্পও উন্নত। তাই এসকল স্থান, এদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক হিসাবে সবচেয়ে বেশী উন্নত অঞ্চল।

এদেশের উত্তর সীমা হইতে দেশের প্রায় মধ্য ভাগের উপর দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে ইরাবতী। ইহা এদেশের সর্বপ্রধান নদী। ইহার উপনদী অনেক। তন্মধ্যে চিন্দুইন প্রধান। দেশের পূর্ব অংশের সালুয়েন নদীও দক্ষিণবাহিনী।

জলবায়ু

এদেশের জলবায়ু সম্পর্কে অবস্থিতি ও ভূপ্রকৃতির প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশটি উত্তর-দক্ষিণে অনেক দূর বিস্তৃত। তারপর দেশের পশ্চিম-দিকে বহু দূর সমুদ্র-উপকূল। আর এদেশে অনেক পাহাড় উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এদেশের জলবায়ু সম্পর্কে এসকল বিষয়ের প্রভাব খুব বেশী। বিশেষতঃ এই দেশ নিরক্ষরেখার নিকট অবস্থিত বলিয়া এদেশের দক্ষিণ অংশে ও উপকূলে শীত ও গ্রীষ্ম কালের উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য কম। দেশের মধ্যভাগে ঐ পার্থক্য অধিক। উত্তর অংশে শীত কাল ও গ্রীষ্ম কালের উষ্ণতার পার্থক্য অনেক বেশী। বস্তুতঃ উত্তর সীমার নিকটবর্তী স্থানসমূহে শীত কালে তুষার-পাত হয়। তারপর দেশের দক্ষিণ অংশে ও উপকূলে গ্রীষ্ম কালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। ঐ বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। তাহার প্রভাবে এসকল স্থানে বর্ষা কালে প্রচুর (২০০-৩০০ সেঃ মিঃ) বৃষ্টি হয়। দেশের মধ্য ভাগে বৃষ্টি মধ্যম রকম (১০০-২০০ সেঃ মিঃ). উত্তর অংশে বৃষ্টি খুব কম। শীত কালে এদেশের দক্ষিণ অংশ ভিন্ন অন্যত্র বৃষ্টি প্রায় হয় না।
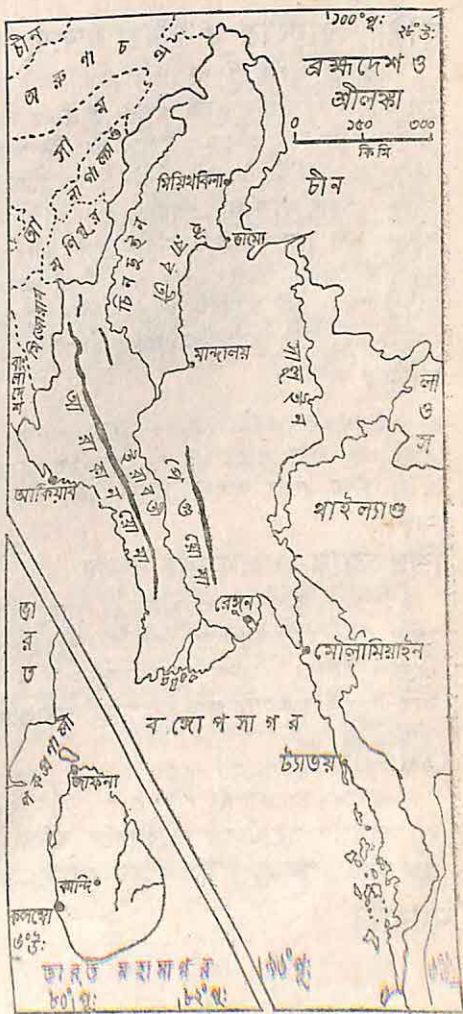
৫৮নং চিত্র।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ্

এদেশের **বিস্তীর্ণ** অংশ অর্থাৎ অর্ধেকের অধিক **বন ভূমি**। পাহাড়ের গায়ে আছে **শাল, সেগুন, পোয়া** প্রভৃতি পর্ণমোচী গাছ এবং **বাঁশ, বেত** ও লম্বা ঘাসের ঘন বন। এদেশের সেগুন কাঠ (Burma teak) বিখ্যাত ও অত্যন্ত মূল্যবান্। দেশের উত্তর অংশে পাহাড় পর্বতের উপরদিকের অংশে আছে **দেবদারু, পাইন** প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছের বন। নানাপ্রকার কাঠ, বেত ও বাঁশ এদেশের মূল্যবান্ সম্পদ্। এগুলি প্রচুর পরিমাণে **রপ্তানিও** হয়।

ভূমির সদ্ব্যবহার ও কৃষিজ সম্পদ্

ইরাবতী নদীর প্রশস্ত উপত্যকা ও বদ্বীপের সমভূমি এদেশের প্রধান **কৃষি অঞ্চল**। স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ছাড়া এখানে সেচেরও সুবিধা আছে। এদেশের ফসলের মধ্যে **ধান সর্বপ্রধান**। অধিক পরিমাণে ধান উৎপাদনের জন্য এদেশকে **সুদূর প্রাচ্যের ধান ভাণ্ডারও** (Rice bowl of the Far East) বলা হয়। তাহাছাড়া **ভুট্টা, ডাল, আখ, তামাক, কার্পাস, তৈলবীজ** প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে জন্মে ঐ সমভূমি অঞ্চলে। দেশের মধ্য ভাগ হইতে উত্তরদিকে বৃষ্টি কম। তাই উত্তর অঞ্চলে জন্মে **রাগি, বাজরা, জোয়ার** প্রভৃতি ফসল। এদেশের দক্ষিণ অংশে বর্ষা ও শীত কালে, দুই ঋতুতেই বৃষ্টি হয়। এই সুযোগে এখানে বহু **রবারের আবাদ** আছে। আর উপকূল অঞ্চলে আছে বহু দূর বিস্তৃত **নারিকেল বাগান**।

খনিজ সম্পদ্

ইরাবতীর উপত্যকার এনাং ইয়ং, মিনবু প্রভৃতি স্থানে প্রচুর **খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস** পাওয়া যায়। আর মধ্য ভাগের সান মালভূমিতে **মরকত, পদ্মরাগ মণি, সীসা, দস্তা, রূপা, এণ্টিমণি, টিন** প্রভৃতি খনিজ সম্পদ্ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

শিল্পসম্ভার ও অন্যান্য সম্পদ্

এদেশে চাউলের কল অনেক। **রবার, চিনি, তামাক** (চুরুট, সিগারেট), **নারিকেল তেল**, দড়ি, সিমেন্ট, সার, কার্পাস বস্ত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরী সংক্রান্ত শিল্পও এদেশে উন্নত। এদেশ প্রচুর চাল, কাঠ, নানারকম খনিজ সম্পদ্ প্রভৃতি রপ্তানি করে। আর আমদানি করে কলকব্জা, রেলওয়ে ইঞ্জিন, কাগজ, কয়লা প্রভৃতি জিনিস।

লোকবসতি

এদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ৩.৩ কোটি (১৯৭৯ খ্রীঃ)। ইরাবতী নদীর উপত্যকা ও বদ্বীপের সমভূমিতে লোকবসতি অধিক। দেশের অন্যান্য স্থানে লোকবসতি খুব কম। পাহাড়, পর্বত ও বন অঞ্চলে লোকবসতি স্বভাবতঃ সবচেয়ে কম।

নগরাদি

ইরাবতী নদীর বদ্বীপে অর্থাৎ রেঙ্গুন নদীর তীরে **রেঙ্গুন** (লোকসংখ্যা ৩৬২ লক্ষ) অবস্থিত। ইহা এদেশের রাজধানী, **সর্বপ্রধান নগর, বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র**। ইরাবতীর তীরে অবস্থিত **মান্দালয়** এদেশের প্রাচীন রাজধানী। ইহা বর্তমানে দেশের দ্বিতীয় নগর। দেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত **আকিয়াব** ও দক্ষিণে সালুয়েন নদীর মোহনাতে অবস্থিত **মৌলমেন** বড় বন্দর।

শ্রীলঙ্কা

এই দ্বীপের সহিত দাক্ষিণাত্য মালভূমির গঠন সম্পর্কে মিল খুব বেশী। বহু-পূর্বে পরস্পর যুক্ত ছিল, পরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। উভয়ের মাঝখানে আছে সঙ্কীর্ণ পক প্রণালী ও বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র দ্বীপ। রাজনৈতিক হিসাবে এদেশও বহু কাল ইংলণ্ডের অধীন ছিল। তারপর স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। ১৯৭২ খ্রীঃ এদেশে গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবস্থিতি ও আয়তন

ভারতের দক্ষিণ সীমার সামান্য দক্ষিণ-পূর্বদিকে শ্রীলঙ্কা। ইহা একটি দ্বৈপ দেশ (Island country)। এদেশ দক্ষিণে প্রায় ৬° উঃ অঃ হইতে উত্তরে প্রায় ১০° উঃ অঃ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে প্রায় ৭৯½° পূঃ দ্রাঃ হইতে পূর্বদিকে প্রায় ৮২° পূঃ দ্রাঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। এদেশের উত্তর সীমা ও ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের মধ্যে আছে সঙ্কীর্ণ **পক প্রণালী**। ইহা মাত্র ২২ কিঃ মিঃ প্রশস্ত। এই প্রণালী ও তাহার দক্ষিণে **পক উপসাগরের** দক্ষিণে আছে বহু বালুচর ও দ্বীপ। তাহাদের মধ্যে **রামেশ্বরম্, ধনুষ্কোদি, আদম সেতু** (Adam's bridge) প্রভৃতি দ্বীপ বিখ্যাত। ইহাদের দক্ষিণে আছে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত **মান্নার উপসাগর**। শ্রীলঙ্কার অন্যান্য দিকে ভারত মহাসাগর। এদেশের এপ্রকার অবস্থিতির ফলে ভারত মহা-সাগরের উপর দিয়া যাতায়াতকারী জাহাজসমূহের পক্ষে এদেশের **কলম্বো** একটি স্বাভাবিক **বিশ্রামস্থল**। এই সুযোগে অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা একটি **আন্ত-র্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র**।

এই দ্বীপের আয়তন প্রায় ৬৫·৬ হাজার বর্গ কিমি, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের আয়তনের প্রায় ¾ অংশ। এই দ্বীপ উত্তর হইতে দক্ষিণে ক্রমশঃ অধিক প্রশস্ত (৫৮নং চিত্র)।

ভূপ্রকৃতি ও জলনিকাশ ব্যবস্থা

ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমির ভূপ্রকৃতির সহিত এদেশের ভূপ্রকৃতির মিল প্রচুর। এই দেশের দক্ষিণ অংশের **মধ্য ভাগ সর্বোচ্চ**। তথা হইতে ভূমি চারিদিকে ঢালু। উত্তরদিকের ভূমি খুব ধীরে ঢালু হইয়া গিয়াছে। তাহার তুলনায় অন্যান্য দিকে ভূমির ঢাল খাড়া। মধ্য ভাগের সর্বোচ্চ অংশে **পিদুরুতালাগালা** (২৫২৪ মি) অব-স্থিত। ইহা এদেশের **সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ**। তাহার দক্ষিণদিকের **আদম শৃঙ্গও** (Adam's peak) বিখ্যাত। এদেশের বিভিন্ন **উপকূলে সমভূমি** আছে। উত্তরদিকে তাহা অধিক প্রশস্ত।

এদেশের উচ্চভূমি অংশ হইতে কয়েকটি **নদী** উৎপন্ন হইয়াছে। এগুলি ভূমির ঢাল অনুসারে চারিদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে **মহাবেলী** প্রধান। ইহা উত্তর-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে।

জলবায়ু

এদেশ নিরক্ষরেখা হইতে অল্প উত্তরে অবস্থিত এবং সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত। এজন্য এখানকার **উষ্ণতা সমস্ত** বৎসরই প্রায় এক রকম (৩০-৩১° সেঃ)। এখানে আমাদের দেশের মত গ্রীষ্ম ও শীতকাল নাই। কিন্তু এদেশ ভারত মহাসাগরের

মৌসুমী বায়ুর গতিপথে অবস্থিত। এজন্য এদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে জুন-সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে খুব বেশী (৪০০-৫০০ সেঃ মিঃ) বৃষ্টি হয়। আর এদেশের **উত্তর-পূর্ব অংশে নভেম্বর-ডিসেম্বর** মাসে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে **প্রচুর বৃষ্টি** হয়। কাজেই এদেশে বৎসরে **দুই বার** অধিক বৃষ্টি হয় বা দুইটি বর্ষা কাল। এবিষয়ে ভারতের করমণ্ডল উপকূলের সহিত এখানকার মিল সুস্পষ্ট।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ্

এদেশের মধ্য ভাগের উচ্চভূমিতে বন ঘন। এখানকার **আবলুস, মেহগিনি** ও **সেগুন** গাছ বিখ্যাত। ইহাদের কাঠ মূল্যবান্ সম্পদ্। এখানে বাঁশ, বেত, লম্বা ঘাসও আছে প্রচুর।

ভূমির সদ্ব্যবহার ও কৃষিজ সম্পদ্

এদেশের উপকূলের সমভূমিতে প্রচুর **ধান** জন্মে। উপকূলে **নারিকেল ও সুপারি** গাছও আছে অনেক। এদেশের জমি ঢালু ও জলবায়ু নিরক্ষীয় প্রকৃতির। তাহার প্রভাবে এখানে **চা, কফি, কোকো, রবার** ও **সিঙ্কোনার** আবাদ অনেক। এদেশে তামাক, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, জায়ফল প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

খনিজ সম্পদ্

এদেশের মধ্য ভাগের উচ্চভূমির প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে প্লাম্বেগো, কৃষ্ণসীস, গ্র্যাফাইট ও মূল্যবান্ পাথর পাওয়া যায়। সমুদ্রে পাওয়া যায় মুক্তা, শঙ্খ ও ঝিনুক।

শিল্প

এদেশে রবার, চা, কফি, তামাক (সিগারেট), নারিকেল তেল ও ছোবড়ার দড়ি, সিমেন্ট, কাগজ, চর্ম প্রভৃতি শিল্প উন্নত। এদেশ চা, রবার, নারিকেল তৈল প্রভৃতি রপ্তানি করে।

অধিবাসী

এদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১·৫ কোটি। তাহাদের অধিকাংশ সিংহলী। এদেশে তামিল ভাষাভাষী লোকও অনেক। কৃষি ও বিভিন্ন আবাদের কাজ এদেশের ৯০% লোকের জীবিকা।

নগরাদি

পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত **কলম্বো** (৫·৬ লক্ষ অধিবাসী) এদেশের **রাজধানী, সর্বপ্রধান নগর ও বন্দর**। ভারত মহাসাগরের উপর দিয়া যাতায়াতকারী জাহাজ ও বিমানপোতের পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ বিশ্রামস্থল। মধ্য ভাগের উচ্চভূমিতে অবস্থিত **কান্দি** ও **অনুরাধাপুর** এদেশের প্রাচীন রাজধানী। উত্তর উপকূলের **জাফনা** ও পূর্ব উপকূলের **ত্রিঙ্কোমালি** দুইটি বড় বন্দর।

পাকিস্তান

১৯৪৭ খ্রীঃ ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রিতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া নূতন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। অবিভক্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ লইয়া গঠিত

হইয়াছে **পশ্চিম পাকিস্তান**। আর অবিভক্ত বঙ্গদেশের পূর্বদিকের অংশ ও আসামের শ্রীহট্ট জেলার অধিকাংশ লইয়া গঠিত হইয়াছে **পূর্ব পাকিস্তান**। ১৯৭১ খ্রীঃ পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়। ফলে, পশ্চিম পাকিস্তানই পাকিস্তান (Islamic Republic of Pakistan) নামে পরিচিত (৫৯নং চিত্র)।

অবস্থিতি ও আয়তন

পাকিস্তান দক্ষিণে প্রায় ২৩½° উঃ অঃ হইতে উত্তরে প্রায় ৩৭½° উঃ অঃ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে প্রায় ৬১° পূঃ দ্রাঃ হইতে পূর্বদিকে প্রায় ৭৫½° পূঃ দ্রাঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। কাল্পনিক কর্কটক্রান্তি রেখা এদেশের দক্ষিণ সীমা দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।
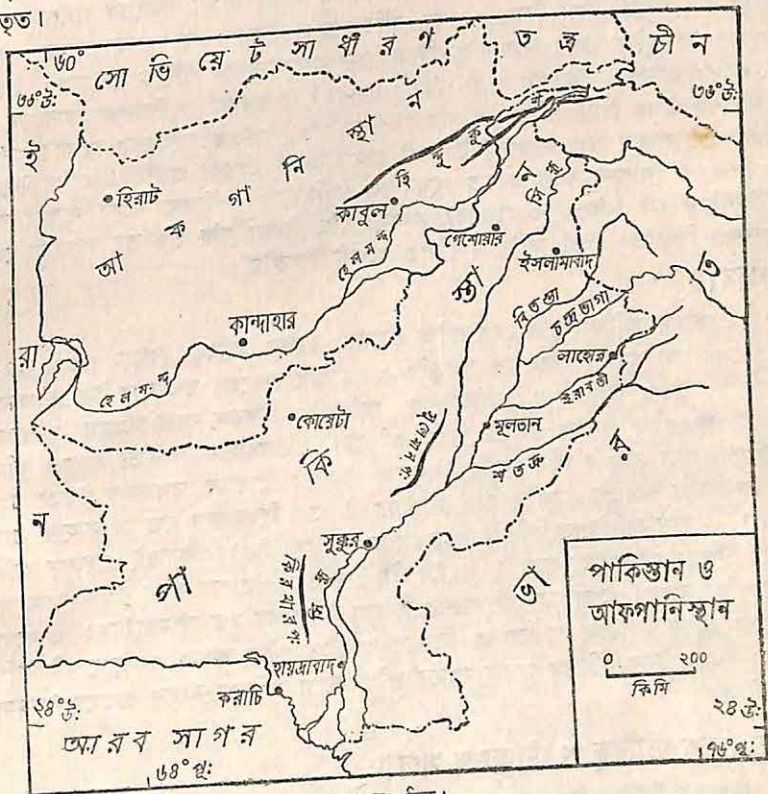
৫৯নং চিত্র।

এদেশের আয়তন ৮ লক্ষ বর্গ কিঃ মিঃ-র অধিক, অর্থাৎ ভারতের আয়তনের প্রায় সিকি ভাগ। এদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বদিকে ভারত, উত্তর-পূর্বে চীন, উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্থান, পশ্চিমে ইরান ও দক্ষিণে আরব সাগর।

ভূপ্রকৃতি ও জলনিকাশ ব্যবস্থা

এদেশের পশ্চিম ও উত্তরাদিকের প্রায় ⅔ অংশ উচ্চভূমি। এখানকার উচ্চতা গড়ে ১৮০০ মিঃ। এদেশের উত্তর অংশ দিয়া **হিন্দুকুশ পর্বত** প্রায় পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

ইহার দক্ষিণে দেশের পশ্চিম অংশে আছে **সফেদকোহ** পর্বত। দেশের পূর্ব অংশ দিয়া **সুলেমান ও খিরথির পর্বত** উত্তর হইতে দক্ষিণে বহু দূর বিস্তৃত। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের উচ্চভূমি প্রকৃত পক্ষে বৃহৎ ইরান মালভূমির পূর্ব অংশ। এই অঞ্চলে খাইবার, বোলান, গোমল প্রভৃতি কয়েকটি গিরিপথ (pass) আছে। ইহাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এদেশের পূর্বদিকের প্রায় ⅓ অংশ ও দক্ষিণে সংকীর্ণ সমুদ্র উপকূল **সমভূমি**। পূর্ব অংশের **সমভূমি** প্রকৃত পক্ষে **সিন্ধু** ও ইহার উপনদী-সমূহের **উপত্যকার** ও **বদ্বীপের সমভূমি**।

এদেশের **সর্বপ্রধান নদী** সিন্ধু। ইহা জম্মু ও কাশ্মীরের উপর দিয়া পশ্চিম-দিকে আসিয়াছে। তারপর এই রাজ্যের পশ্চিম অংশে নাঙ্গা পর্বতের পাশে গভীর খাতের (gorge) মধ্য দিয়া দক্ষিণে বাঁকিয়াছে। ইহার পর পাকিস্তানের পূর্ব অংশের সমভূমির উপর দিয়া দক্ষিণদিকে গিয়া **আরব সাগরে পতিত** হইয়াছে। ইহার উপনদী অনেক। তাহাদের মধ্যে **শতদ্রু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা** ও **বিতস্তা** ভারতের ও এদেশের উপর দিয়া পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে গিয়াছে। ইহাদের দোয়াব অঞ্চল বিখ্যাত। সিন্ধুর আর কয়েকটি উপনদী, যেমন চিত্রল, **গোমল** প্রভৃতি এদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম অংশ হইতে পূর্বদিকে আসিয়াছে। সিন্ধু নদের **সুক্কুর বাঁধ** (Sukkur or Lloyd barrage), **মঙ্গলা বাঁধ**, জিন্না **বাঁধ** প্রভৃতির সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা বিখ্যাত। এই নদীর বদ্বীপও যথেষ্ট বিস্তীর্ণ।

জলবায়ু

এদেশের অধিকাংশ স্থানের **গ্রীষ্ম কালের** উষ্ণতা অধিক (গড়ে ৪৩° সেঃ)। এদেশের মধ্য ভাগের, বিশেষতঃ সমভূমি ও মরুপ্রায় অঞ্চলের তখনকার উষ্ণতা আরও বেশী। সিন্ধু-উপত্যকার জেকোবাবাদ পৃথিবীর **উষ্ণতম স্থানসমূহের অন্যতম**। এখানকার গ্রীষ্ম কালের উষ্ণতা প্রায় ৫৩° সেঃ। উত্তরদিকে পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির উচ্চতার জন্য এবং দক্ষিণে সমুদ্র উপকূলে সমুদ্রের প্রভাবে তখনকার উষ্ণতা কম। **শীত কালে** এদেশের বেশীর ভাগ জায়গার উষ্ণতা **হিমাঙ্কের মত** বা তাহার চেয়ে কম। এদেশে বৃষ্টিপাত অতি সামান্য (গড়ে ৫০ সেঃ মিঃ)। কাজেই এদেশের অধি-কাংশ স্থানের **জলবায়ু চরম** বা **মহাদেশীয়** প্রকৃতির। তাহার মধ্যে কতক স্থান থর মরুভূমির অংশ। তথাকার আশপাশের অবস্থা মরুভূমির মত বা **মরুপ্রায়**। এদেশের দক্ষিণ অংশে উপকূল অঞ্চলে ও সিন্ধুর বদ্বীপে গ্রীষ্ম কালে একটু বেশী বৃষ্টি হয়। আর উত্তর-পশ্চিমে কতক স্থানে শীত কালে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে সামান্য বৃষ্টি হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ্

এদেশের উত্তর অংশের পার্বত্য অঞ্চলে পাইন, ফার প্রভৃতি **সরলবর্গীয় বৃক্ষের** বনভূমি আছে। দেশের বাকী অধিকাংশ স্থানে চরম ও মরুপ্রায় জলবায়ুর প্রভাবে ঘন বনের অভাব। নিকৃষ্ট তৃণভূমিই এদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ্।

ভূমির সদ্ব্যবহার ও কৃষিজ সম্পদ্

এদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন নদীর দোয়াব অঞ্চলের বহু স্থানে ভারতবর্ষের অন্তর্গত থাকাকালেই **সেচ কার্য** আরম্ভ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সিন্ধুনদের উপর নির্মিত **লয়েড ব্যারেজ** বা **সুক্কুর** ব্যারেজ বিখ্যাত। সিন্ধুর উপনদী বিতস্তা, চন্দ্রভাগা

প্রভৃতির সাহায্যে সেচ ব্যবস্থাও বিশেষ উন্নত। এসম্পর্কে উচ্চ ও নিম্ন চন্দ্রভাগা (Chenab) খাল, উচ্চ ও নিম্ন বিতস্তা (Jhelum) খাল, নিম্ন বারিদোয়াব খাল ও **ত্রয়ী পরিকল্পনা** (Triple project) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পরেও ভারতের সহিত জলচুক্তি এবং **মঙ্গলা বাঁধ, জিন্না বাঁধ** প্রভৃতি বাঁধ তৈরী ও অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে এদেশে সেচের অনেক উন্নতি হইয়াছে। এদেশে পাহাড়ের পাদদেশে **ক্যারেজ** সেচ ব্যবস্থা বা সুড়ঙ্গের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা বিখ্যাত। এভাবে সেচের উন্নতি এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে এদেশে কৃষিকার্যের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। এজন্য এদেশের বহু মরুপ্রায় স্থানও **উন্নত ধরনের কৃষিক্ষেত্রে** পরিণত হইয়াছে।

এদেশের ফসলের মধ্যে **গম, ধান** ও **কার্পাস** প্রধান। রাগি, বাজরা, আখ, ভুট্টা, যব প্রভৃতিও এদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এদেশে আপেল, পিচ, কমলালেবু প্রভৃতি ফলও অধিক জন্মে।

খনিজ সম্পদ্

এদেশের পাটোয়ার সমভূমিতে কয়েকটি কেন্দ্রে **খনিজ তৈল** ও **প্রাকৃতিক গ্যাস** পাওয়া যায়। এদেশের লবণ পর্বতের (Salt range) খেওড়া খনিতে **সৈন্ধব লবণ** পাওয়া যায়। তাহাছাড়া এদেশে নানাস্থানে এণ্টিমণি, ক্রোমাইট, জিপসাম, তামা ও সামান্য কয়লা, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি পাওয়া যায়।

শিল্প

এদেশে **কার্পাস** ও **পশমবস্ত্র, চিনি, ইঞ্জিনিয়ারিং, রাসায়নিক** প্রভৃতি শিল্প উন্নত। কার্পাস বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র করাচি, লাহোর, লায়ালপুর। চিনি শিল্পের কেন্দ্র রাওয়ালপিণ্ডি, এবটাবাদ, মার্দান প্রভৃতি। জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র করাচি।

লোকবসতি

এদেশের লোকসংখ্যা ৮ কোটির অধিক। দেশের সমভূমি অংশে লোকবসতি ঘন। পার্বত্য অঞ্চলে ও মরুপ্রায় অংশে লোকবসতি খুব কম। কতক স্থান প্রায় জনহীন।

নগরাদি

এদেশের উত্তর অংশের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত **ইসলামাবাদ** (৭৭,০০০ অধিবাসী) এদেশের **রাজধানী**। পাশের **রাওয়ালপিণ্ডি** বা পিণ্ডি ও **মুরি** বিখ্যাত শৈলনিবাস। পিণ্ডি কিছু দিন সে দেশের রাজধানীও ছিল। ইহার দক্ষিণে ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত **লাহোর** এদেশের দ্বিতীয় নগর। আরও দক্ষিণে সিন্ধুনদের বদ্বীপে অবস্থিত **করাচি** এদেশের প্রাচীন রাজধানী ও দেশের সর্বপ্রধান নগর ও বন্দর। **কোয়েটা, লায়ালপুর, পেশোয়ার, হায়দরাবাদ** প্রভৃতি বৃহৎ নগর ও শিল্পকেন্দ্র। এদেশের অন্তর্গত তক্ষশিলা, মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পাতে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আফগানিস্থান

অবস্থিতি ও আয়তন

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমদিকে আফগানিস্থান (৫৯নং চিত্র)। এদেশ দক্ষিণে প্রায় ২৯° উঃ অঃ হইতে উত্তরে প্রায় ৩৮½° উঃ অঃ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে প্রায় ৬১° পূঃ দ্রাঃ হইতে পূর্বদিকে প্রায় ৭৪½° পূঃ দ্রাঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। এদেশের আয়তন প্রায় ৬·৪ লক্ষ বর্গ কিঃ মিঃ অর্থাৎ পাকিস্তানের আয়তনের প্রায় ৮০%। এদেশের পশ্চিমে ইরান, উত্তরে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, উত্তর-পূর্বে চীন, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে পাকিস্তান। এদেশের পূর্ব-সীমার সামান্য অংশ জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম সীমার নিকট অবস্থিত।

ভূপ্রকৃতি ও জলনিকাশ ব্যবস্থা

এদেশ একটি নিম্ন মালভূমি। এখানে কিছু কিছু পাহাড় ও উপত্যকা আছে। ইহা ইরান মালভূমির পূর্ব অংশ। এদেশের উত্তর অংশ দিয়া **হিন্দুকুশ** পর্বত প্রায় পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

এদেশে বৃষ্টিপাত কম। এজন্য এখানে নদ-নদীও কম। **হরিরুদ** এদেশের পশ্চিম অংশের ও **হেলমন্দ** দক্ষিণ অংশের প্রধান নদী। দুইটিই অন্তর্বাহিনী নদী। এদেশের পূর্ব অংশের প্রধান নদী **কাবুল**। ইহা সিন্ধুর উপনদী। আমুদরিয়ার (Oxus) সামান্য অংশ এদেশের উপর দিয়া উত্তরদিকে বহিয়া গিয়াছে।

জলবায়ু

শীত কালে এদেশের অনেক স্থানে **তুষারপাত** হয় এবং উচ্চ পর্বতে তুষার জমিয়া থাকে। তবে দেশটি মালভূমি বলিয়া এদেশে গ্রীষ্ম কালের উষ্ণতা মধ্যম রকম। কাজেই এদেশে শীত ও গ্রীষ্ম কালের উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী। তারপর এদেশ চারিদিকে স্থলদ্বারা বেষ্টিত এবং দক্ষিণদিকে আরব সাগর হইতে অনেক দূরে। সেজন্য এদেশে বৃষ্টিপাত অতি সামান্য (৩০-৩৫ সেঃ মিঃ)। তাই এদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবস্থা **মরুপ্রায়**। এদেশের পশ্চিম অংশের রেজিস্থান ও সীস্থান দুইটি মরু উপত্যকা (desert basin)। এদেশের উত্তর অংশে **শীত কালে** পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কিছু **বৃষ্টি** হয়। এখানকার জলবায়ুর অবস্থা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ুর মত।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ

এদেশের **উত্তর অংশে** পার্বত্য অঞ্চলে **বন** আছে। পর্বতের উত্তর ঢালে শীত কালে বষ্টি হয়। তাই সেখানে বন ঘন। এদেশের জলবায়ু প্রায় শুষ্ক। এজন্য এদেশে আছে **নিকৃষ্ট তৃণভূমি** এবং তাহা বহু দূর বিস্তৃত। আর মরুপ্রায় অংশে আছে বাবলা জাতীয় কতক কাঁটা গাছ। এদেশে বহু উট ও মেষ পালন করা হয়।

ভূমির সদ্ব্যবহার ও কৃষিজ সম্পদ্

এদেশে পর্বতের তুষারগলা জল ও নদীর জলের সাহায্যে কিছু কিছু **সেচ কার্য** হয়। ফলে, এদেশে গ্রীষ্ম কালে ধান, ভুট্টা, রাগি, বাজরা, তামাক, কার্পাস প্রভৃতির চাষ হয়। আর এদেশে শীত কালে গম, যব জন্মে। তবে সব ফসলেরই উৎপাদনের পরিমাণ কম। এদেশের উত্তর অংশে আপেল, আঙ্গুর, পীয়ার, পীচ, এপ্রিকট, বেরী, বেদানা, ডুমুর প্রভৃতি **ফল অধিক** জন্মে। এসকল ফল প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়।

খনিজ সম্পদ্

এদেশে সামান্য কয়লা, লোহা, তামা, সীসা ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। দেশের পশ্চিম ও উত্তর অংশে খনিজ তৈল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শিল্প

এদেশে পশম ও কার্পাস বস্ত্র, চর্ম, সিমেন্ট, চিনি প্রভৃতি শিল্প আছে।

লোকবসতি

এদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১·৭ কোটি (১৯৭৬ খ্রীঃ)। এদেশের বিস্তীর্ণ মরুপ্রায় অংশে ও উচ্চ পর্বত অঞ্চলে লোকবসতি সবচেয়ে কম।

নগরাদি

এদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে কাবুল নদীর তীরে **কাবুল** (প্রায় ৭½ লক্ষ অধিবাসী) অবস্থিত। ইহা এদেশের **রাজধানী**। তাহার দক্ষিণে **গজনী** অবস্থিত। ইহা এদেশের প্রাচীন রাজধানী। দেশের পশ্চিম অংশে হরিরুদের তীরে **হিরাট** অবস্থিত এবং দক্ষিণ পূর্ব অংশে হেলমন্দের তীরে **কান্দাহার** অবস্থিত। এই দুইটি বৃহৎ নগর।

একাদশ অধ্যায়

ভারতের ভৌগোলিক গুরুত্ব
(Geographical Importance of India)

সুদূর **অতীত কালে** পৃথিবীর কয়েকটি মাত্র দেশ নানা বিষয়ে অসামান্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আমাদের ভারত তাহাদের অন্যতম। আবার **বর্তমান কালেও** পৃথিবীর **উন্নয়নশীল** (developing) দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। এদেশের এপ্রকার অবস্থা সম্পর্কে এখানকার ভৌগোলিক বিষয়সমূহের গুরুত্ব ও প্রভাব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এদেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধেও ইহাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

I. ভূপ্রকৃতি ও তাহার প্রভাব

ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভূপ্রকৃতি ও ভূগঠন সম্বন্ধে পার্থক্য বিস্তর। তদনুসারে এদেশ নিম্নলিখিত **চারিটি** প্রধান ভূপ্রাকৃতিক বিভাগে (on the basis of relief) বিভক্ত (৬০নং চিত্র)।

(১) উত্তর ও উত্তর পূর্ব অংশের পার্বত্য অঞ্চল

ভারতের উত্তর অংশ উচ্চ পর্বত অঞ্চল। ইহা পশ্চিমে জম্মু ও কাশ্মীরের পশ্চিম সীমা হইতে পূর্বদিকে অরুণাচল প্রদেশের পূর্ব সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এদেশের উত্তরপূর্বদিকে অরুণাচল হইতে দক্ষিণে মিজোরামের দক্ষিণ সীমা পর্যন্তও পার্বত্য অঞ্চল বিস্তৃত। তবে এই অঞ্চলের উচ্চতা কম।

(ক) উত্তর অংশের পার্বত্য অঞ্চল

জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি ও পর্বতগ্রন্থি (mountain knot) পামির। ইহাকে পৃথিবীর ছাদও (Roof of the world) বলা হয়। এখান হইতে ভারতের উত্তর অংশ দিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে **পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়**। এই অঞ্চল পশ্চিমে জম্মু ও কাশ্মীরের পশ্চিম সীমা হইতে পূর্বদিকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক কাল (Geological time scale) অনুসারে টার্সিয়ারি কালেও অর্থাৎ এখন হইতে আনুমানিক ৪ কোটি বৎসর আগেও ছিল **টেথিস সাগর**। তাহা ছিল একটি অগভীর সমুদ্র বা অতিবৃহৎ মহীখাত (Geosyncline)। তাহার উত্তরে ছিল পৃথিবীর এক

৬০নং চিত্র।
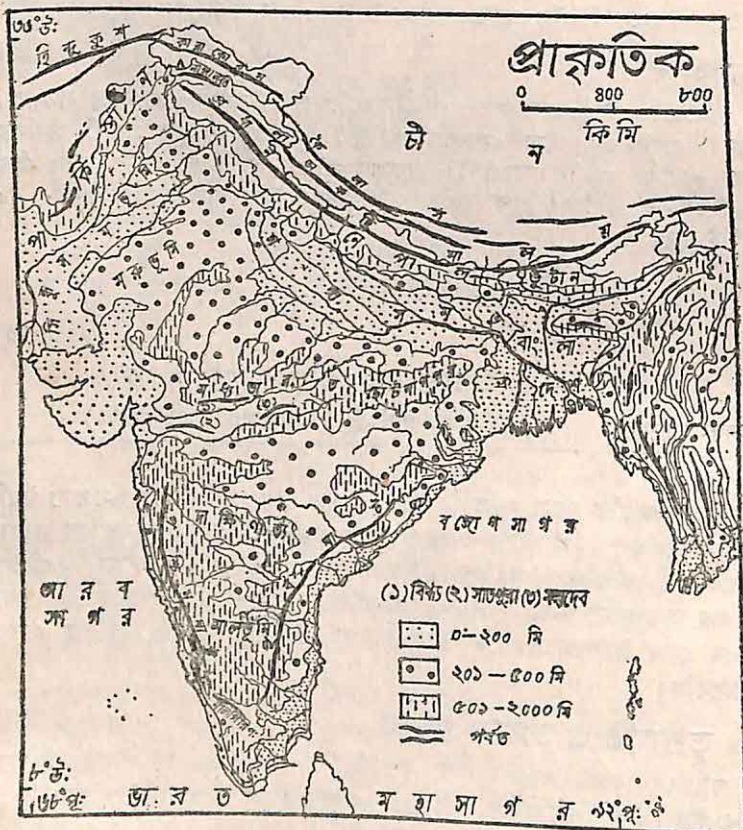
প্রাচীনতম ভূখণ্ড আঙ্গারাল্যান্ড। আর তাহার দক্ষিণে ছিল অপর এক প্রাচীনতম ভূখণ্ড গণ্ডোয়ানাল্যান্ড। এই দুই ভূখণ্ড হইতে পাথর, নুড়ি, বালুকা প্রভৃতি হিমবাহ, নদী ও বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির সহিত অনবরত প্রবাহিত হইয়াছে মধ্য ভাগের টেথিস সাগরের দিকে। টার্সিয়ারি ও পরবর্তী কোয়াটারনারি যুগে অর্থাৎ এখন হইতে

আনুমানিক ৪ কোটি বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক ৭/৮ লক্ষ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত এসকল উপাদান টেথিস সাগরে সঞ্চিত হইয়াছে অসংখ্য পলিস্তর রূপে। এই দীর্ঘ কালে তাহাদের দ্বারা এই অঞ্চলে সৃষ্টি হইয়াছে নানারকম **পাললিক শিলা**। তাহাছাড়া এই সময়ে ভূগর্ভে অতিপ্রবল **ভূ-আন্দোলন** (tectonic movement) হইয়াছে এবং প্রচণ্ড **অনুভূমিক চাপেরও** (lateral pressure) সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার ফলে এসকল কোমল শিলাতে অতি উচ্চ **ভাঁজের** (fold) সৃষ্টি হইয়াছে। এভাবেই গঠিত হইয়াছে **হিমালয় পর্বতমালা**। প্রধান হিমালয়ের আশপাশের, বিশেষতঃ উত্তরদিকের পর্বতকে বলা হয় **টেথিস হিমালয়** বা **ট্রান্স-হিমালয়**। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অত্যধিক চাপের ফলে হিমালয় বা এপ্রকার উচ্চ পর্বতের উপরদিকের কতক স্তর ভাঙ্গিয়া যায়। এরূপ কতক ভগ্ন অংশ হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকাতে দেখা যায়। আর পর্বতের কতক অংশ এভাবে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে ভাঙ্গা জায়গার নীচের অংশ এখন দেখা যায় (exposed)।

হিমালয় পর্বত অঞ্চলের পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০ কিঃ মিঃ (৬১নং চিত্র)। এখানকার উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার পশ্চিম অংশে প্রায় ৪০০ কিঃ মিঃ। হিমালয় পর্বত পূর্বদিকে ক্রমশঃ সরু। তাহার ফলে পূর্ব প্রান্তে ইহার বিস্তার প্রায় ১৫০

৬১নং চিত্র।

কিঃ মিঃ। **পূর্ব-পশ্চিমে** বিস্তৃতি অনুসারে হিমালয়কে নিম্নলিখিত **চারি ভাগে** বিভক্ত করা যাইতে পারে :—(i) **পঞ্জাব হিমালয়**—হিমালয় অঞ্চলের সকলের পশ্চিমদিকের অংশ সিন্ধুনদ হইতে পূর্বদিকে শতদ্রু নদী পর্যন্ত প্রায় ৫৬০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ। (ii) **কুমায়ুন হিমালয়**—এই অঞ্চল শতদ্রু নদী হইতে পূর্বদিকে কালী নদী পর্যন্ত প্রায় ৩২০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ। সিন্ধুনদ হইতে এ পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে, অর্থাৎ পঞ্জাব হিমালয় ও কুমায়ুন হিমালয়কে এক সঙ্গে **পশ্চিম হিমালয়** বলে। (iii) **মধ্য হিমালয়** বা **নেপাল হিমালয়**—এই অঞ্চল কালী নদী হইতে পূর্বদিকে তিস্তা নদী পর্যন্ত প্রায় ৮০০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ। এই অংশ নেপালের অন্তর্গত। (iv) **পূর্ব হিমালয়** বা **আসাম হিমালয়**—এই অঞ্চল হিমালয় অঞ্চলের সকলের পূর্বদিকের অংশ। ইহা তিস্তা হইতে পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত প্রায় ৭২৫ কিঃ মিঃ দীর্ঘ।

হিমালয় অঞ্চলের পর্বতগুলি সাধারণতঃ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। তাহাদের মধ্যে **তিনটি** পর্বতশ্রেণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(i) প্রধান হিমালয় বা হিমাদ্রি বা হিমগিরি

হিমালয় অঞ্চলের সকল পর্বতশ্রেণীর উত্তরে বা ভিতরদিকে এই পর্বতশ্রেণী। সেজন্য ইহা **অন্তর্হিমালয়** (Inner Himalaya)। আবার ইহাই এই অঞ্চলের **প্রাচীনতম, দীর্ঘতম ও সর্বোচ্চ** পর্বত। ইহার উচ্চতা গড়ে প্রায় ৬০০০ মিঃ। সেকারণেই ইহা প্রধান হিমালয় (Great Himalaya)। এখানকার উচ্চতম অংশ সর্বদা তুষারাবৃত। এজন্য ইহার হিমালয় (হিম+আলয়) নাম সার্থক ও অর্থবহ। জম্মু ও কাশ্মীরের জাস্কর পর্বত প্রধান হিমালয়ের অন্তর্গত। এই পর্বতের উত্তরে লাডাক উচ্চ মালভূমি। তাহার উত্তরে **কারাকোরাম** পর্বত। ইহা সম্ভবতঃ আরও প্রাচীন। হিমালয় অঞ্চলে বহু বিস্তীর্ণ **হিমবাহ** (glaciers) আছে। ইহাদের পরিমাণ কেবল মাত্র মেরু অঞ্চলের হিমবাহের পরে। এখানকার সিয়াচেন, বায়াফো, বাল্টরো প্রভৃতি হিমবাহ বিখ্যাত।

(ii) মধ্য হিমালয় বা হিমাচল পর্বত

হিমালয় অঞ্চলের তিনটি প্রসিদ্ধ পর্বতশ্রেণীর মধ্যে **অবস্থিতি, উচ্চতা** (গড়ে ৫০০০ মিঃ) ও **বয়স**—তিন হিসাবেই ইহা মধ্যম। অর্থাৎ প্রধান হিমালয়ের তুলনায় ইহা বেশ নীচু। জম্মু ও কাশ্মীরের **পিরপঞ্জাল** এবং হিমাচল প্রদেশের **ধৌলধর** বা **ধবলাধর** প্রভৃতি পর্বত এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পিরপঞ্জালের উত্তরদিকে বিখ্যাত বিতস্তা (Jhelum) উপত্যকা বা **কাশ্মীর উপত্যকা**। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। এই সৌন্দর্য ও চমৎকার জলবায়ুর জন্য এই উপত্যকা অঞ্চল 'ভূস্বর্গ' নামে সচরাচর পরিচিত। এই পর্বতের **বানিহাল গিরিপথের** মধ্য দিয়া জম্মু ও অন্যান্য স্থান হইতে শ্রীনগর যাওয়ার পথ। বর্তমানে এখানকার নিম্ন অংশের **জওহর টানেলের** মধ্য দিয়া যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। আর ধৌলধরের দক্ষিণদিকে আছে কুলু উপত্যকা, কাংড়া উপত্যকা এবং মুসৌরি, মানালি প্রভৃতি শৈল নিবাস।

(iii) অবহিমালয় বা শিবালিক পাহাড়

ইহা হিমালয় অঞ্চলের **সকলের দক্ষিণে** বা **বাহিরদিকে** অবস্থিত। সেজন্য ইহা **বহির্হিমালয়** (Outer Himalaya)। ইহার উচ্চতা গড়ে ৬০০-১৫০০ মিঃ। উচ্চতা হিসাবে ইহা এই অঞ্চলের **সর্বনিম্ন** এবং বয়স হিসাবে **সবচেয়ে পরবর্তী** বা **আধুনিক**। উত্তর প্রদেশে শিবালিকের উত্তরে ও মধ্য হিমালয়ের দক্ষিণে আছে বিখ্যাত দেরাদুন উপত্যকা ও কুমায়ুনের হ্রদ অঞ্চল। শিবালিক পাহাড় পূর্ব অংশে বিভিন্ন নদী দ্বারা **খণ্ডবিখণ্ড** ও **ক্ষয়প্রাপ্ত**। তাহার দক্ষিণে আছে তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের ঘন বন। শিবালিকের দক্ষিণদিকের কতক অংশ যথেষ্ট নীচু। আবার কতক অংশ নুড়ি, বালুকা প্রভৃতি সঞ্চয়ের ফলে একটু উঁচু। এরূপ উঁচু অংশকে বলে **ভাবর**। এই অঞ্চলের বিভিন্ন ফাঁকের (pass) মধ্য দিয়া ভুটানের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেজন্য **ডুয়ার্স** (duars=doors) নামটিও অর্থবহ।

পৃথিবীর পাঁচটি সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ—**এভারেস্ট** (৮৮৪৮ মি), **গডউইন অস্টিন** বা $\mathbf{K_2}$ (৮৭১৩ মিঃ), **কাঞ্চনজঙ্ঘা** (৮৫৯৮ মিঃ), **ধবলগিরি** (৮১৭২ মিঃ) এবং **নন্দাদেবী** (৭৮১৭ মিঃ) হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত (৬২ ও ৬৩নং চিত্র)। ইহাদের মধ্যে উচ্চতা হিসাবে **এভারেস্ট** প্রথম ও **পৃথিবীতে সর্বোচ্চ**, গডউইন অস্টিন দ্বিতীয়,

কাঞ্চনজঙ্ঘা তৃতীয়, ধবলগিরি চতুর্থ এবং নন্দাদেবী পঞ্চম। তাহাছাড়া এই অঞ্চলে আছে আরও প্রায় ১০০টি পর্বতশৃঙ্গ যাহাদের প্রত্যেকের উচ্চতা ৬৭০০ মিঃ-র অধিক। হিমালয় অঞ্চলের উচ্চ শৃঙ্গসমূহের মধ্যে গডউইন অস্টিন জম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্গত। তবে ইহা এখন পাকিস্তানের অধিকারে। নাঙ্গাপর্বতও
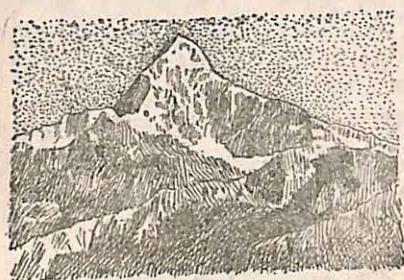
৬২নং চিত্র—এভারেস্ট শৃঙ্গ।

৬৩নং চিত্র—কাঞ্চনজঙ্ঘা ও নিকটবর্তী শৃঙ্গসমূহ।

জম্মু ও কাশ্মীরে, কাঞ্চনজঙ্ঘা সিকিমে। নন্দাদেবী, কামেট প্রভৃতি উত্তর প্রদেশে। আর এভারেস্ট, ধবলগিরি, মাকালু প্রভৃতি ভারতের বাহিরে নেপালে। কাজেই কারাকোরম পর্বতের অন্তর্গত গডউইন অস্টিন বা K_2 ভারতের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে কাঞ্চনজঙ্ঘাই এদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ।

(খ) উত্তর পূর্ব অংশের পার্বত্য অঞ্চল

হিমালয়ের পূর্ব সীমার অর্থাৎ অরুণাচল প্রদেশের উত্তর-পূর্ব সীমার দক্ষিণে আছে মিসমি পাহাড়। তথা হইতে **পাটকইবুম** ও **নাগা পাহাড়** দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছে (৬৪নং চিত্র)। ইহাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে **মিকির** ও **বরাইল** পাহাড়। মেঘালয়ের **গারো**, **খাসিয়া** ও **জয়ন্তিয়া** পাহাড় পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বিস্তৃত এবং পূর্ব সীমাতে বরাইল পাহাড়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। আরও দক্ষিণে মিজোরামে আছে **লুসাই** ও **মিজো পাহাড়**। মেঘালয় বহু কাল পূর্বে দক্ষিণাত্য মালভূমির সহিত যুক্ত ছিল। পরে আলাদা হইয়া গিয়াছে। কাজেই এখানকার পাহাড়গুলিও বয়স হিসাবে দাক্ষিণাত্যের পাহাড়, পর্বতের মত প্রাচীন ও ক্ষয়প্রাপ্ত। ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশের অন্য পাহাড়গুলি ভঙ্গিল জাতীয় ও বয়স হিসাবে আধুনিক।

পার্বত্য অঞ্চলের প্রভাব

গ্রীষ্ম কালে এদেশের দক্ষিণদিকের সমুদ্র হইতে আর্দ্র মৌসুমী বায়ু এদেশের উপর দিয়া উত্তরদিকে আসে। তাহা হিমালয় অঞ্চলের বিভিন্ন পর্বতের প্রতিবাত পার্শ্বে বা দক্ষিণ ঢালে বাধা পায়। এজন্য এই ঢালে ও পাশের উপত্যকাতে বৃষ্টি হয় খুব বেশী। আবার শীত কালে মধ্য এশিয়া হইতে তীব্র শীতল বায়ু বা হিমপ্রবাহ দক্ষিণদিকে আসে। তাহা এই অঞ্চলের উত্তর অংশের প্রধান হিমালয়ের উত্তর ঢালে বাধা পায়। এজন্য তাহা হিমালয়কে অতিক্রম করিয়া ভারতে আসিতে পারে না।

তারপর হিমালয় অঞ্চলে আছে বহু দূর বিস্তৃত হিমবাহ, তুষারস্তূপ ও বরফাবৃত অঞ্চল। এই অঞ্চলে তুষার দ্বারা দীর্ঘকাল ক্ষয়কার্যের ফলে গ্রাবরেখা, এরিটিস, সার্ক প্রভৃতি দেখা যায়। তাহাছাড়া এখানকার প্রচুর বরফগলা জল, বৃষ্টির জল ও বিভিন্ন প্রস্রবণের জলই বহু **নদ-নদীর** উৎস। এসকল জলস্রোত উত্তর ভারতের প্রধান নদী **গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র** ও **সিন্ধুকে** পুষ্ট করিতেছে। হিমালয় অঞ্চলে **স্বাভাবিক** উদ্ভিদ্ অতি বিচিত্র এবং পরিমাণেও অত্যধিক। ফলে, এখানে এক দিকে সবুজের সমারোহ, অন্য দিকে এখানকার **বনজ সম্পদ্** অতুলনীয়। আবার এখানকার পাহাড়, পর্বতের ঢালে ও উপত্যকা অঞ্চলে জলবায়ু ও মৃত্তিকার পার্থক্য খুব বেশী। সেজন্য এখানে **কৃষিজ সম্পদ্** এবং ফুল, ফল প্রভৃতির উৎপাদন প্রচুর। এখানকার বন্ধুর ভূপ্রকৃতি ও বিস্তীর্ণ বন ঘন লোকবসতি এবং তাহাদের যাতায়াত, পরিবহন ও বৃহৎ শিল্প-কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতির পক্ষে অসুবিধাজনক। অবশ্য কতক সুবিধাজনক স্থানে গড়িয়া
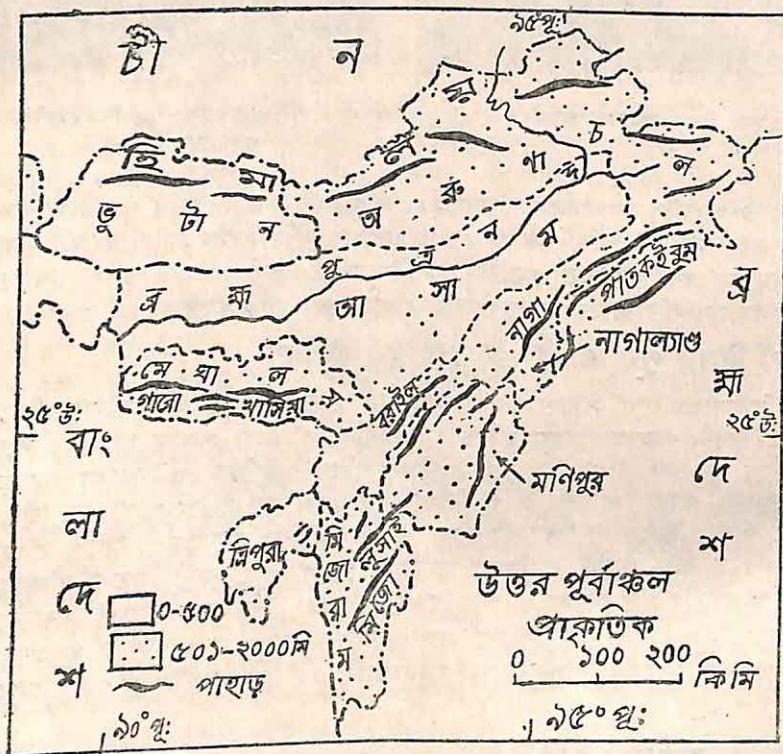
৬৪নং চিত্র।

উঠিয়াছে কেদারনাথ, বদরীনাথ প্রভৃতি বিখ্যাত মঠ ও মন্দির। আর শ্রীনগর, সিমলা, রাণীক্ষেত, দার্জিলিং প্রভৃতি প্রসিদ্ধ **শৈলনিবাস**। তাহাছাড়া এখানে আছে অনেক বিস্তীর্ণ লোকালয়। তাহাদের মধ্যে কতক শিল্পকেন্দ্র হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার অধিবাসীরা স্বভাবতঃ সাহসী ও শক্তিমান্। ইহাদিগকে লইয়া গঠিত গোর্খা, গাড়োয়ালী, ডোগরা প্রভৃতি সেনাবিভাগ (regiments) বিখ্যাত। তাহাছাড়া হিমালয়ের বিভিন্ন অভিযানে এখানকার শেরপাগণের সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(২) উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চল

হিমালয়ের দক্ষিণ অংশের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে মধ্যভারত মালভূমির উত্তর-দিকের পাদদেশ পর্যন্ত আছে এক বিস্তীর্ণ ও বিখ্যাত সমভূমি। এখানকার পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০ কিঃ মিঃ, আর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার প্রায় ২৫০-৪০০ কিঃ মিঃ। সমগ্র উত্তর ভারত এই সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। ইহা ভারতের **বৃহৎ সমভূমি** বা ভারতীয় **সমভূমি** (The Great Plains of India) নামে পরিচিত।

হিমালয় পর্বত সৃষ্টির পরেও অগভীর **টেথিস সমুদ্রের** কতক অংশ এখান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাজেই হিমালয় সৃষ্টির পরেও এখানে **অসংখ্য পলিস্তর** সঞ্চিত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে এখানে প্রবল ভূ-আন্দোলন ও উন্নয়ন হইয়াছে। তাহার ফলে এই অঞ্চল **সমভূমিতে** পরিণত হইয়াছে। এখানকার সৃষ্টির কাল হিমালয়ের অনেক পরে আধুনিক কোয়াটারনারি যুগ, অর্থাৎ এখন হইতে ২০-৩০
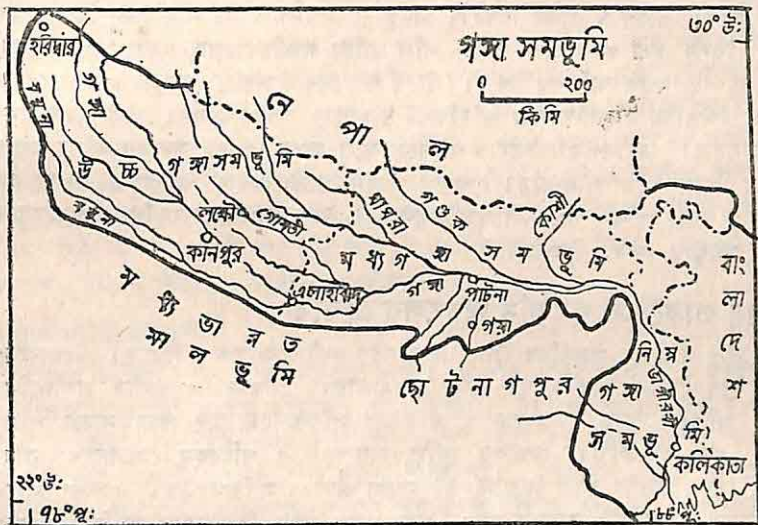
৬৫নং চিত্র।

লক্ষ বৎসর পূর্বে। এখানকার উত্তর সীমার উচ্চতা সমুদ্র-সমতল হইতে প্রায় ৩০০ মিঃ, দিল্লীর নিকট প্রায় ২১৫ মিঃ। আর এখানকার দক্ষিণ সীমা অর্থাৎ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার ব-দ্বীপ প্রায় সমুদ্র-সমতলে অবস্থিত। এজন্য এখান-কার ভূমির উত্তর হইতে দক্ষিণে ঢাল এত কম যে তাহা প্রায় লক্ষ্য করা যায় না। ফলে, এখানকার উপরিভাগের সমতা **আদর্শ স্থানীয়**। তাই ইহা পৃথিবী-বিখ্যাত সমভূমি। লোকবসতির ঘনত্ব, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কে এখানকার খ্যাতি আরও বেশী।

উত্তর ভারতের সমভূমির **প্রধান** অংশ **গঙ্গার সমভূমি** (৬৫নং চিত্র)। তাহা দিল্লীর নিকটবর্তী সামান্য উচ্চভূমি বা দিল্লীর শৈলশিরা (Delhi ridge) হইতে

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে ঢালু। তাহার পূর্ব সীমা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াইয়া বাংলাদেশ পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর ভারতের সমভূমির এক ক্ষুদ্র অংশ দিল্লীর শৈলশিরা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিমে ঢালু। ইহা **সিন্ধুর সমভূমির** অংশ। এই সমভূমির বৃহৎ অংশ পাকিস্তানের অন্তর্গত। উত্তর ভারতের সমভূমির আর এক ক্ষুদ্র অংশ পূর্বদিকে **ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা**। তাহা গঙ্গা সমভূমির উত্তর-পূর্বদিকে। এখানে পলি মাটির গভীরতা গঙ্গা সমভূমির পলি মাটির গভীরতার চেয়ে বেশী। গঙ্গা সমভূমির আয়তন বিস্তীর্ণ। এখানকার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভূমির উচ্চতা, মৃত্তিকা, জলবায়ু, কৃষিজ সম্পদ্ প্রভৃতি সম্পর্কে পার্থক্য বিস্তর। এজন্য ইহা আবার **তিন ভাগে** বিভক্তঃ—পশ্চিম অংশ উচ্চ গঙ্গা (Upper Ganga) সমভূমি, মধ্য অংশ **মধ্য গঙ্গা** (Middle Ganga) সমভূমি এবং পূর্বদিকের অংশ **নিম্ন গঙ্গা** (Lower Ganga) সমভূমি। এই অঞ্চলে দুই নদীর মাঝখানের দোয়াব সম্পর্কেও দেখা যায় পার্থক্য। দোয়াবের উঁচু অংশকে বলে **ভাঙ্গর**, আর নীচু অংশকে বলে **খাদর**। এই নীচু অংশে বন্যার সময় জল জমে। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ সমভূমিতে পলি মাটির গভীরতা উত্তর অংশে কম, কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ অংশে পলি মাটির গভীরতা গড়ে প্রায় ১০০০ মিঃ। সেজন্য এই অঞ্চল **অতিশয় উর্বর**। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ সমভূমির মধ্যে কেবল সিন্ধু সমভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণে রাজস্থান প্রায় সমভূমি। ইহা বালুকাময় ও অনুর্বর। এখানকার গুল্মযুক্ত অংশকে বলে **বাগার**। এই সমপ্রায় ভূমির কতক অংশে আছে প্রচুর বালিয়াড়ি। স্থানে স্থানে ছোট পাহাড় ও লোনা জলের হ্রদ আছে। তাহা পশ্চিম দিকে পশ্চিম উপকূলের উত্তর অংশের সমভূমি বা গুজরাটের উর্বর সমভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত।

উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চলের প্রভাব

উত্তর ভারতের সমভূমির উপর দিয়া বহু নদী প্রবাহিত হইতেছে। এখানকার ভূপ্রকৃতির উপরিভাগের সমতা আদর্শ স্থানীয়। সেজন্য এখানকার নদীগুলির গতি অতিশয় শান্ত। এখানে প্রতি বৎসর সঞ্চিত হইতেছে প্রচুর নূতন পলি। ফলে, ইহা চির-উর্বর। লোকের বসতি, যাতায়াত ও পরিবহন, সেচব্যবস্থা, কৃষিকার্য, শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়েই এই অঞ্চল অত্যন্ত সুবিধাজনক। এসকল কারণে এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। গ্রাম, শহর, নগর, শিল্পকেন্দ্র প্রভৃতির সংখ্যাও এখানেই এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। ভারতের প্রধান নগরগুলির মধ্যে দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, কলিকাতা প্রভৃতি এখানেই অবস্থিত। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্রসমূহের মধ্যেও এই অঞ্চলের সিন্ধু সভ্যতা অন্যতম। এখানকার পূর্ব অংশে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা। এখানে বর্ষা কালে প্রায়ই প্রবল বন্যা হয়। অপর দিকে এই সমভূমি অঞ্চলের পশ্চিম অংশে রাজস্থানের সমভূমির বহু স্থানের অবস্থা মরুপ্রায়। সেজন্য এই অংশে লোকবসতি কম।

(৩) মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমি

উত্তর ভারতের সমভূমির দক্ষিণ হইতে ভারতের দক্ষিণ **সীমা** পর্যন্ত এক **বিস্তীর্ণ মালভূমি** অঞ্চল। ইহার ক্ষুদ্রতর অংশ নর্মদা নদীর উত্তরে। তাহাই মধ্য ভারত মালভূমি। আর বৃহত্তর অংশ নর্মদার দক্ষিণে। তাহা **দাক্ষিণাত্য মালভূমি**।

(ক) মধ্য ভারত মালভূমি

নর্মদা নদীর উত্তরদিকে পশ্চিমে রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বত হইতে পূর্বদিকে ছোটনাগপুরের পরেশনাথ ও রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত মধ্য ভারতের মালভূমি (৬৬নং চিত্র) বিস্তৃত। ইহা একটি **নিম্ন** (২০০-৪৫০ মিঃ) **মালভূমি**। এই মালভূমির দক্ষিণ সীমাতে বিন্ধ্য পর্বত ও কাইমুর পাহাড় পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। ফলে, এই মালভূমি **উত্তর দিকে ঢালু**। এই মালভূমির পশ্চিম অংশ **মালব** মালভূমি। তাহা লাভা দ্বারা গঠিত এবং অধিক প্রশস্ত। মধ্য ভারত মালভূমির প্রায় মধ্য ভাগে **বুন্দেলখণ্ড** ও **বাগেলখণ্ড** মালভূমি। তাহার দক্ষিণপূর্বে **ছত্রিশগড়** একটি পর্বত-বেষ্টিত প্রায়-সমভূমি (উচ্চতা গড়ে ৩০০ মিঃ)। তাহার পূর্বদিকে **ছোটনাগপুর** মালভূমি।

মধ্য ভারত মালভূমির পশ্চিমদিকে **আরাবল্লী** পর্বত। ইহা পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম ও **অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত** পর্বত। (এখানে আর্কিয়ান যুগের শিলা সুস্পষ্ট। তাহার বয়স প্রায় ৬০ কোটি বৎসর।) এই পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গুরুশিখর (১৭২৩ মিঃ)। তবে পাশের **মাউন্ট আবু** শৃঙ্গ অধিক বিখ্যাত। এই মালভূমির দক্ষিণদিকে **বিন্ধ্য** পর্বত। ইহা একটি **প্রাচীন ক্ষয়প্রাপ্ত** পর্বত। (এখানে পুরানা বা প্রাক্-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শিলা আছে। তাহার বয়স ৫০-৬০ কোটি বৎসর।) এখানকার কতক শৃঙ্গ ৭০০ মিঃ-র অধিক উঁচু। (সাধারণতঃ পর্বতের উচ্চতা ইহার চেয়ে অনেক বেশী, অর্থাৎ ৯০০ মিঃ-র অধিক।) এই মালভূমির পূর্বদিকের অংশ **ছোটনাগপুর** মালভূমি। এখানকার সহিত দাক্ষিণাত্য মালভূমির ভূগঠনের মিল অধিক। এই মালভূমি ভারতের **খনিজ সম্পদের** কেন্দ্র। এখানকার **পরেশনাথ** (১৩৭৩ মিঃ) ও **রাজমহল** পাহাড় প্রসিদ্ধ।

(খ) দাক্ষিণাত্য মালভূমি

ভারতের নর্মদা নদীর দক্ষিণদিকের অংশের আকৃতি প্রায় ত্রিকোণ। এখানকার বিস্তীর্ণ মালভূমি অংশের আকৃতিও প্রায় ত্রিকোণ। ইহা দক্ষিণ ভারতের মালভূমি বা **দাক্ষিণাত্য মালভূমি** নামে পরিচিত। ইহা তিন দিকে উচ্চ পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। এই মালভূমি অতি প্রাচীন ও **ক্ষয়প্রাপ্ত**। এখানকার উচ্চতা ৩০০-২০০০ মিঃ এবং তাহা সাধারণতঃ পশ্চিম হইতে **পূর্বদিকে ঢালু**। (এখানকার কতক শিলা বিন্ধ্য, কুড্ডাপা, পুরানা প্রভৃতি জাতীয়। তাহাদের বয়স ৫০/৬০ কোটি বৎসর।) এই মালভূমি পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম ভূখণ্ড গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অংশ। এখানকার উত্তর-পশ্চিম অংশ লাভা দ্বারা গঠিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া বারে বারে ক্ষয়ীভবনের ফলে এই অংশে, বিশেষতঃ পশ্চিমঘাট পর্বতের গায়ে সৃষ্টি হইয়াছে বহু ধাপ। ইহা **দাক্ষিণাত্যের ট্র্যাপ অঞ্চল** (Deccan trap) নামে পরিচিত।

এই মালভূমির উত্তরদিক্ দিয়া অর্থাৎ নর্মদা নদীর দক্ষিণদিক্ দিয়া **সাতপুরা** পর্বত প্রায় পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত (৬৬নং চিত্র)। ইহা বিন্ধ্য পর্বতের প্রায় সমান্তরালভাবে* অবস্থিত। ইহার পূর্ব অংশে **অমরকণ্টক শৃঙ্গ** (১০০০ মিঃ-র অধিক উচ্চ)। সাতপুরার দক্ষিণে **মহাদেব** পর্বত। এই অংশের উচ্চতম শৃঙ্গ **পাচমারি**

* বিন্ধ্য ও সাতপুরা সম্ভবতঃ স্তূপ পর্বত এবং নর্মদা ও তাপী সম্ভবতঃ গ্রস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

(১৩৫০ মিঃ)। তাহার পূর্বদিকে মাইকাল বা মহাকাল বা মাকালা পর্বত ও দক্ষিণে **অজন্তা** পাহাড়। অজন্তার গুহাচিত্র (cave paintings) পৃথিবী-বিখ্যাত। দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিমদিক্ দিয়া **সহ্যাদ্রি** বা **পশ্চিমঘাট** পর্বত প্রায় অবিচ্ছিন্ন-ভাবে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০০ মিঃ ও উচ্চতা গড়ে ১২০০ মিঃ। এই পর্বতের পশ্চিমদিকের ঢাল খাড়া। সহ্যাদ্রির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **কলসুবাই** (১৬৪৬ মিঃ) মহারাষ্ট্রে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্য মালভূমির পূর্বদিকে **মলয়াদ্রি** বা **পূর্বঘাট** পর্বত। ইহা উত্তরে মহানদীর উপত্যকা হইতে দক্ষিণে নীলগিরি পর্যন্ত
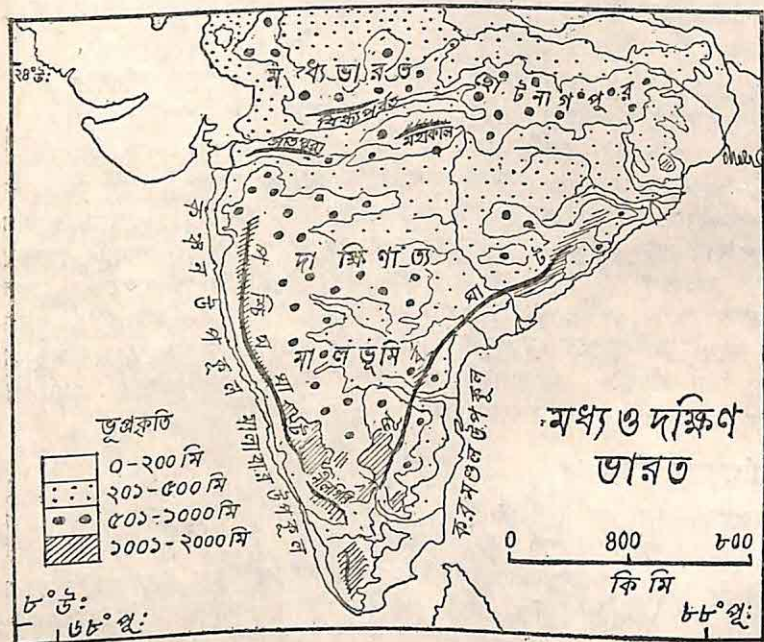
৬৬নং চিত্র।

বিস্তৃত। ইহার মাঝে মাঝে আছে কয়েকটি **ফাঁক** (gap)। তাহাদের মধ্য দিয়া পূর্বদিকে বহিয়া গিয়াছে দাক্ষিণাত্যের চারিটি প্রধান নদী—মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী। পূর্বঘাটের সর্বোচ্চ অংশ **মহেন্দ্রগিরি** (১৫০০ মিঃ) উড়িষ্যাতে অবস্থিত। পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বত দাক্ষিণাত্য মালভূমির দক্ষিণ অংশে **নীল-গিরিতে** মিলিত হইয়াছে। এই অঞ্চল কর্ণাটক, কেরালা ও তামিলনাড়ুর প্রায় মিলনস্থলে। ইহাদের মিলনস্থলে নীলগিরির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **দোদাবেতা** (২৬৩৭ মিঃ)। ইহার দক্ষিণে বিখ্যাত **পালঘাট গিরিপথ** (Palghat gap)। ইহার উচ্চতা মাত্র ১৪৪ মিঃ ও বিস্তার কম পক্ষে ২৪ কিঃ মিঃ। ইহা মালভূমি অঞ্চল ও উপকূলের সমভূমির মধ্যে যোগাযোগের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। ইহার দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ **আনাইমুদি** (২৬৯৫ মিঃ)। ইহা আন্নামালাই,

পালনি ও কার্ডামম পাহাড়ের মিলনস্থল। পশ্চিমঘাট, পূর্বঘাট ও নীলগিরি সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্য মালভূমির চেয়ে প্রাচীন ও অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত।

মালভূমি অঞ্চলের প্রভাব

মধ্য ভারতের মালভূমির ঢাল উত্তরদিকে। এজন্য তথাকার নদীগুলি উত্তর-বাহিনী। আর দাক্ষিণাত্যের ভূমির ঢাল পূর্বদিকে। এজন্য তথাকার নদীগুলি পূর্ববাহিনী। দাক্ষিণাত্য পর্বতবেষ্টিত মালভূমি। এজন্য তথাকার মধ্য ভাগে বৃষ্টি কম, ভূমিও অনুর্বর। তাই এই অংশ ঘন লোকবসতির পক্ষে অসুবিধাজনক। তাহাদের জীবিকা অর্জনের সুযোগও এখানে কম। এখানকার নিম্ন অংশসমূহে অনেক বৃহৎ স্বাভাবিক জলাশয় আছে। তাহাদের তলদেশের শিলা অত্যন্ত শক্ত। ঐ কঠিন শিলার মধ্য দিয়া জল সহজে চুয়াইতে পারে না। কাজেই জলাশয়গুলিতে সারা বৎসর জল সঞ্চিত থাকে। ফলে, এসকল জলাশয় জলসেচের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। মালভূমি অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম অংশে আছে লাভাজাত মৃত্তিকা। তাহা অতিশয় উর্বর। এখানকার প্রধান ফসল কার্পাস ও গম। মধ্য ভারত মালভূমির পূর্বদিকের অংশ ছোটনাগপুর। এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানকার লৌহ ও ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতব শিল্প বিশেষ উন্নত। সমগ্র মালভূমি অঞ্চলের বিভিন্ন নদীর উপত্যকাতে লোকবসতি অধিক। মালভূমি অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে আছে অনেক বিখ্যাত শৈলনিবাস। যেমন, পশ্চিমঘাটে মহাবালেশ্বর, নীলগিরিতে উৎকামণ্ড বা উটি, সাতপুরাতে পাচমারি, ছোটনাগপুর মালভূমিতে রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ প্রভৃতি।

(৪) উপকূলের সমভূমি ও দ্বীপ অঞ্চল

(ক) পশ্চিম উপকূল

পশ্চিম উপকূলের সমভূমি উত্তরে গুজরাট হইতে দক্ষিণে ক্রমশঃ সংকীর্ণ। তাহাছাড়া পশ্চিমঘাটের পশ্চিম ঢাল ও পশ্চিমে আরব সাগরের উপকূল দুই-ই খাড়া। এই উপকূলের গোয়ার উত্তরদিকের অংশকে বলা হয় **কঙ্কন উপকূল**। তাহার দক্ষিণে আছে **কর্ণাটক উপকূল**। আর সকলের দক্ষিণে কেরালাতে আছে **মালাবার উপকূল**। কেরালার উপকূলে আছে অনেক অগভীর **উপহ্রদ** (lagoon) ও **কয়াল** বা **হ্রদ** (back water)।

(খ) পূর্ব উপকূল

পূর্ব উপকূলের সমভূমি উত্তর (উড়িষ্যা) হইতে দক্ষিণে ক্রমশঃ প্রশস্ত। এই উপকূলের উত্তরদিকের অংশ **উড়িষ্যা উপকূল** বা উৎকল উপকূল। এই উপকূলের মধ্য অংশ **অন্ধ্র উপকূল** ও দক্ষিণ অংশ **করমণ্ডল উপকূল**। পূর্ব উপকূলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য দাক্ষিণাত্যের চার প্রধান নদী—মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর **বদ্বীপ**। তাহাছাড়া এই অংশে আছে কয়েকটি হ্রদ ও উপহ্রদ। তাহাদের মধ্যে উড়িষ্যার **চিল্কা** ও তাহার দক্ষিণে তামিলনাড়ুর **পুলিকট** হ্রদ প্রধান।

(গ) দ্বীপ অঞ্চল

ভারতের অন্তর্গত দ্বীপগুলির মধ্যে বঙ্গোপসাগরের **আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ** বৃহত্তম। এগুলি সমুদ্রে নিমজ্জিত পর্বতের উপরিভাগ এবং **মহাদেশীয় দ্বীপ** (Continental islands) হিসাবে গণ্য। পশ্চিম উপকূলের নিকটবর্তী

পূর্ব ও পূর্বদিকে আসিয়াছে। এখানকার সমভূমির উপর দিয়া ইহা **অতি ধীর গতিতে** প্রবাহিত হইয়াছে। তারপর বিহারের পূর্ব সীমাতে রাজমহল পাহাড়ের পূর্বদিক্ দিয়া দক্ষিণে বাঁকিয়া গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার পর হইতে নদীর **পরিণত অবস্থা**। এখানেই ধুলিয়ানের নিকট ইহা দুই শাখায় (distributaries) বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা **ভাগীরথী** সোজাসুজি দক্ষিণে আসিয়াছে। অপর শাখা **পদ্মা** বাংলাদেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে গিয়াছে। দুই শাখাই **বঙ্গোপসাগরে পতিত** হইয়াছে। **ভাগীরথী** এক কালে ছিল * গঙ্গার প্রধান শাখা, এখন **পদ্মা** প্রধান। ইহার দৈর্ঘ্যও ভাগীরথীর চেয়ে বেশী। ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশের নাম **হুগলি নদী**। কলিকাতার নিকট ইহার **গঙ্গা** নাম অধিক প্রচলিত। **পদ্মা** (গঙ্গা) পথে **যমুনা** (ব্রহ্মপুত্র) ও **মেঘনার সহিত মিলিত** হইয়াছে। তাই গঙ্গার **বদ্বীপ** প্রকৃত পক্ষে এই তিন নদীর মিলিত বদ্বীপ। অবশ্য গঙ্গার জলপ্রবাহের সহিত সঞ্চিত পলিমাটির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। এই বদ্বীপের পশ্চিম অংশ পশ্চিমবঙ্গে, পূর্ব অংশ বাংলাদেশে। ভাগীরথী ও পদ্মা ভিন্ন **জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, ইচ্ছামতী** (পশ্চিমবঙ্গে), গড়ই, আড়িয়াল খাঁ (বাংলাদেশে) প্রভৃতি গঙ্গার অন্যান্য **শাখানদী**।

হিমালয় অঞ্চলের ও উত্তর ভারতের সমভূমিতে গঙ্গার **উপনদী** (tributaries) অনেক। তাহাদের মধ্যে **যমুনা সর্বপ্রধান**। ইহা গঙ্গার **ডান তটের** উপনদী। হিমালয় অঞ্চলে গঙ্গোত্রীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত যমুনোত্রী হিমবাহ ইহার উৎস। এলাহাবাদের নিকটবর্তী প্রয়াগ গঙ্গা ও যমুনার মিলনস্থল। মধ্য প্রদেশের মাকালা বা মহাকাল পর্বত হইতে উৎপন্ন **শোণ** গঙ্গার ডান তটের অপর প্রধান উপনদী। আর বিন্ধ্য পর্বত হইতে উৎপন্ন **চম্বল, সিন্ধ, বেতোয়া** প্রভৃতি যমুনার উপনদী। অপর দিকে হিমালয় হইতে উৎপন্ন **গোমতী, ঘাঘরা** বা **সরযু, গণ্ডক, কোশী, মহানন্দা** প্রভৃতি গঙ্গার বাম তটের উপনদী। ছোটনাগপুর মালভূমি হইতে উৎপন্ন **ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ** প্রভৃতি ভাগীরথীর ডান তটের উপনদী। ফলে, গঙ্গা ও ইহার বিভিন্ন উপনদী, শাখানদী প্রভৃতির মধ্য দিয়া এদেশের প্রায় ⅓ অংশ জলনিকাশ হয়। আর এই নদীর পার্বত্য, সমভূমি ও পরিণত—এই **তিন অবস্থাই অত্যন্ত সুস্পষ্ট**। সেজন্য ইহা একটি **আদর্শ নদী** হিসাবে গণ্য। এদেশের প্রধান নগরসমূহের মধ্যে উত্তর প্রদেশের **হরিদ্বার, কানপুর** ও **বানারস** (বারাণসী), বিহারের **পাটনা** গঙ্গার তীরে অবস্থিত। **দিল্লী** ও **আগ্রা** যমুনার তীরে অবস্থিত। **এলাহাবাদ** গঙ্গা-যমুনার মিলনস্থলের নিকট অবস্থিত। আর **লক্ষ্ণৌ** গোমতীর তীরে এবং **কলিকাতা** ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত।

(২) **ব্রহ্মপুত্র** (দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭২০ কিঃ মিঃ)—তিব্বতের দক্ষিণ অংশে **মানস সরোবর-রাক্ষসতাল** হ্রদ বা মানসালোয়া চিহ ও রাকা চিহ অঞ্চলের নিকটবর্তী **হিমবাহ** ইহার **উৎস**। এখানকার উচ্চতা প্রায় ৫৫০০ মিঃ। তথা হইতে **সংকীর্ণ** উপত্যকার মধ্য দিয়া বহু দূর (প্রায় ১৪৪০ কিঃ মিঃ) ইহা **পূর্বদিকে** আসিয়াছে। সেখানে ইহার নাম **সাঁপো** বা **সাংপো** (Tsanpo)। তারপর অরুণাচলের উত্তর-পূর্বদিকে হিমালয়ের পূর্ব সীমার নিকট নামচা বারোয়া (৭৭৭৪ মিঃ) শৃঙ্গের পাশ

* এখন খরার সময় ভাগীরথীর অবস্থা মৃতপ্রায়। ভাগীরথীর মধ্য দিয়া নৌপথে যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ফরাক্কাতে গঙ্গার উপর পৃথিবীর দীর্ঘতম ব্যারেজ তৈরী করা হইয়াছে। কিন্তু এখনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

বোম্বাই, সলসেট, বেসিন প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্বীপও মহাদেশীয় দ্বীপ। অর্থাৎ এক কালে এগুলি মূল ভূভাগের অংশ ছিল। ঐ অংশের লক্ষদ্বীপ এবং দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের রামেশ্বর, মান্নার দ্বীপ, আদম সেতু প্রভৃতি **প্রবাল দ্বীপ** (Coral islands)। আর সুন্দরবনের দক্ষিণদিকের সাগর দ্বীপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্বীপ পলি সঞ্চয়ের ফলে গঠিত। এগুলি **মহাসাগরীয় দ্বীপ** (Oceanic islands) হিসাবে গণ্য।

উপকূল ও দ্বীপ অঞ্চলের প্রভাব

এদেশের **উপকূলের সমভূমির** উর্বরতা উত্তর ভারতের সমভূমির মত। কাজেই এখানেও কৃষি কার্যের সুযোগ খুব বেশী। স্বাভাবিক বৃষ্টির সাহায্যেই এখানে কৃষি কার্য উন্নত। অধিকন্তু উপকূলে আছে অসংখ্য নারিকেল গাছ ও মসলার আবাদ। উভয় উপকূলে গড়িয়া উঠিয়াছে বহু নগর, বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। তাহাদের মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপটনম্, ত্রিবান্দ্রম্, কোচিন, ম্যাঙ্গালোর প্রভৃতি অধিক প্রসিদ্ধ। তাহাছাড়া বহু স্থানে আছে মৎস্য শিকারের ও মৎস্য সংক্রান্ত শিল্পের অনেক কেন্দ্র। উপকূল অঞ্চলে লবণ তৈরীর কেন্দ্রও আছে অনেক। আর আছে অন্ততঃ ১৫০টি বন্দর। **দ্বীপসমূহ** এখনও ঘন বনপূর্ণ। তবে দ্বীপগুলিতে ক্রমশঃ আবাদের পরিমাণ ও লোকবসতি বাড়িতেছে এবং নানাভাবে ইহাদের উন্নতি সাধন হইতেছে।

II. জলনিকাশ ব্যবস্থা ও তাহার প্রভাব

ভারতের **জলনিকাশ** (drainage) ব্যবস্থা সম্পর্কে এদেশের ভূপ্রকৃতির, বিশেষতঃ হিমালয় ও পশ্চিমঘাট পর্বতের অবস্থিতি, বিস্তার ও উচ্চতার প্রভাব খুব বেশী। তারপর এবিষয়ে এদেশের জলবায়ুর, বিশেষতঃ আর্দ্র মৌসুমী বায়ুর প্রবাহ ও বর্ষা কালের প্রচুর বৃষ্টির প্রভাব খুব বেশী। তাহাছাড়া এদেশের পার্বত্য অঞ্চলের অসংখ্য প্রস্রবণ, বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বরফগলা জল প্রভৃতির প্রভাবও স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এদেশের এসকল বিষয়ের প্রভাবে ভারতে নদ নদী বহু শত এবং এদেশের মানুষের জীবনে **নদীর প্রভাব** অবর্ণনীয়। এজন্যই ভারত নদীমাতৃক দেশ। এদেশের নদীগুলি দুইটি প্রধান ও দুইটি অপ্রধান ভাগে বিভক্ত।

(ক) উত্তর ভারতের নদী বা হিমালয় হইতে উৎপন্ন নদী

(১) গঙ্গা (দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০ কিঃ মিঃ ; ভারতের অংশে প্রায় ২০৭০ কিঃ মিঃ) —ইহা **ভারতের সর্বপ্রধান নদী**। গুরুত্ব হিসাবে ইহা **পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ** নদীগুলির অন্যতম। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহের পশ্চিমে **গোমুখ** বা **গোমুখী** অঞ্চল ইহার **উৎস**। এখান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে গঙ্গার উপনদী ভাগীরথী। গোমুখের একটু পূর্বদিকে **মন্দাকিনীর উৎস**। মন্দাকিনী অল্প দূরে গিয়া মিশিয়াছে **অলকনন্দার** সহিত। পরে অলকনন্দা ও ভাগীরথী মিলিয়া সৃষ্টি হইয়াছে **গঙ্গা**। উত্তর প্রদেশের **হরিদ্বার পর্যন্ত** গঙ্গার **উচ্চ গতি** বা **পার্বত্য গতি**। এ পর্যন্ত মূল নদী গঙ্গার ও ইহার উপনদীগুলির উপত্যকা সঙ্কীর্ণ ও গভীর। এখানে ইহাদের স্রোতের বেগ প্রবল ও ক্ষয় কার্য অধিক।

উত্তর প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে শিবালিক পাহাড় পার হইয়া গঙ্গা হরিদ্বারে সমভূমিতে পৌঁছিয়াছে। ইহার পর হইতে গঙ্গার **সমভূমি অবস্থা**। এখান হইতে কিছু দূর দক্ষিণে আসিয়া দিল্লীর শৈলশিরার পূর্বদিক্ দিয়া ইহা **দক্ষিণ-**

দিয়া ইহা দক্ষিণদিকে বাঁকিয়াছে। এখানকার গভীর খাতের মধ্য দিয়া ইহা ভারতের অরুণাচল প্রদেশে পৌঁছিয়াছে। সেখানে ইহার নাম **ডিহং**। এপর্যন্ত এই নদীর **উচ্চ গতি**। এখান পর্যন্ত ইহার উপত্যকা সংকীর্ণ। এখানে বহু **গিরিখাত** ও **জলপ্রপাত** আছে।

তারপর আসামের উত্তর-পূর্ব অংশে ইহা সমভূমিতে পৌঁছিয়াছে। এখান হইতে ইহার **সমভূমি অবস্থা**। এখান হইতে ইহা **ব্রহ্মপুত্র** * নামে দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে আসিয়াছে। এখানেও ইহার উপত্যকা **সংকীর্ণ**। তারপর আসামের পশ্চিম সীমা পার হইয়া ইহা মেঘালয়ের গারো পাহাড়ের পশ্চিমদিক্ দিয়া দক্ষিণে বাঁকিয়াছে। এখানে ইহা বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এখান হইতে ইহার **পরিণত অবস্থা** এবং নদীর নাম **যমুনা**। ইহা দক্ষিণদিকে আসিয়া গোয়ালনন্দের নিকট **পদ্মার** (গঙ্গা) **সহিত** মিশিয়াছে। এই মিলিত নদী দক্ষিণ-পূর্বদিকে চাঁদপুরের নিকট **মেঘনার সহিত** মিশিয়াছে। অল্প পরেই মিলিত নদী **মেঘনা** নামে **বঙ্গোপসাগরে** পতিত হইয়াছে।

হিমালয় হইতে উৎপন্ন **সুবনসিরি, ধনসিরি, ডিবাং, মানস, তোর্সা, তিস্তা** প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের ডান তটের উপনদী। আর হিমালয় হইতে উৎপন্ন **ডিহিং, লোহিত,** বরাইল পাহাড় হইতে উৎপন্ন **কাপিলি** প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের বাম তটের উপনদী। ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার তুলনায় দৈর্ঘ্যে বড়। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া গঙ্গার অববাহিকার তুলনায় স্বল্প আয়তনের স্থানের জলনিকাশ হয়। তবে এই অঞ্চলে বর্ষা কালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশী। সেজন্য তখন এই নদীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত জলের পরিমাণ খুব বেশী পরিমাণে বাড়িয়া যায়। **ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটি** বা **গুয়াহাটি, ধুবড়ি** প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। **জলপাইগুড়ি** তিস্তার তীরে, আর **কোচবিহার** তোর্সার তীরে অবস্থিত।

(৩) **সিন্ধু** (দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮৮০ কিঃ মিঃ)—তিব্বতের **মানস সরোবর-রাক্ষসতাল** হ্রদ বা মানসালোয়া চিহ ও রাকা চিহ অঞ্চল হইতে এই নদী উৎপন্ন হইয়াছে। তবে ইহা তিব্বতের দক্ষিণ অংশের **সংকীর্ণ** উপত্যকার মধ্য দিয়া **পশ্চিমদিকে** (ব্রহ্মপুত্রের বিপরীত দিকে) আসিয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্ব সীমার নিকট ইহা ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। তারপর কারাকোরম ও প্রধান হিমালয় বা জাস্করের মাঝখানের সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া ইহা উত্তর-পশ্চিমদিকে গিয়াছে। পরে ঐ রাজ্যের পশ্চিম সীমাতে নাঙ্গা পর্বতের নিকট গভীর খাতের মধ্য দিয়া ইহা দক্ষিণে বাঁকিয়াছে। এপর্যন্ত ইহার **উচ্চ গতি**। তার পর সিন্ধু পাকিস্তানের সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। তারপর সেদেশের উপর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়া ইহা আরব সাগরে পতিত হইয়াছে।

হিমালয় অঞ্চল হইতে উৎপন্ন **বিতস্তা** (Jhelum), **চন্দ্রভাগা** (Chenab), **ইরাবতী** (Ravi), **বিপাসা** (Beas) ও **শতদ্রু** (Sutlej) সিন্ধুর বাম তটের উপনদী। এই পাঁচ নদীর জন্যই **পঞ্জাবের** এরূপ (পঞ্চ+অপ) **নাম**। ইহাদের মধ্যে বিপাসা সম্পূর্ণরূপে ভারতের অন্তর্গত। অন্য চারিটি উপনদীর উপরের অংশ ভারতের অন্তর্গত ও নীচের বা পশ্চিমদিকের অংশ পাকিস্তানের অন্তর্গত। শতদ্রুর **ভাকরা-**

* শীত কালে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা থাকে অত্যন্ত শীর্ণ ও প্রায় শুষ্ক। অথচ বর্ষা কালে ইহা পার্বত্য অঞ্চলের প্রবল বৃষ্টির জল প্রচুর পরিমাণে লাভ করে। তখন ইহার উপত্যকা থাকে ৭-৮ কিঃ মিঃ পর্যন্ত প্রশস্ত। ঐ সময় তথাকার বন্যা দ্বারা আশপাশের বিস্তর ক্ষতি হয়। এই নদীর মাজুলি পৃথিবীর বৃহত্তম নদীদ্বীপ (River island)।

নাঙ্গল প্রকল্পের অন্তর্গত ভাকরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ নদী-বাঁধ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রচুর জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ ও সেচ কার্য হয়। সিন্ধুর ডান তটের বিভিন্ন উপনদী ও শাখানদী পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। সিন্ধু ও ইহার উপনদী-গুলি যে অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তথায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। তাই সিন্ধুনদের মধ্য দিয়া জল নিকাশের পরিমাণ কম। জম্মু ও কাশ্মীরের **শ্রীনগর** বিতস্তার তীরে অবস্থিত।

হিমালয় হইতে উৎপন্ন উত্তর ভারতের নদীগুলির প্রভাব

এই নদীগুলি দৈর্ঘ্যে বড় (৬৭নং চিত্র) এবং ইহাদের গতিপথে **তিন অবস্থাই** সুস্পষ্ট। তন্মধ্যে গঙ্গা **আদর্শ নদী** রূপে গণ্য। ইহাদের পার্বত্য বা উচ্চ গতিতে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ও বনের কাঠ নিম্নদিকে পরিবহনের সুযোগ প্রচুর। ভারতের নদীসমূহের সাহায্যে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও পরিবহন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবেষণাগার (Central water and power research station) মহা-রাষ্ট্রের পুণেতে অবস্থিত। গঙ্গা ও সিন্ধুর সমভূমি অঞ্চলে কয়েকটি সেচব্যবস্থা বিখ্যাত। তিন নদীরই সমভূমি অঞ্চলে লোকবসতি অধিক এবং কৃষি, শিল্প, যাতা-য়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাদি উন্নত। তবে সিন্ধুর বদ্বীপের তুলনায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মিলিত বদ্বীপ অনেক বেশী বিস্তীর্ণ। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। এই বদ্বীপ অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বও খুব বেশী।

(খ) দক্ষিণ ভারতের নদী

দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ নদী পূর্ববাহিনী। তবে তাপী, নর্মদা ও কয়েকটি ছোট নদী পশ্চিমবাহিনী।

পূর্ববাহিনী বা বঙ্গোপসাগরে পতিত নদী

(৪) **মহানদী** (দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ কিঃ মিঃ)—মধ্যপ্রদেশের মহাকাল বা মাকালা পর্বতের নিকট হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। তারপর ভূমির ঢাল অনুসারে ইহা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। **ব্রাহ্মণী, বৈতরণী** প্রভৃতি ইহার উপনদী। ইহার **বদ্বীপ** যথেষ্ট বিস্তীর্ণ। এই নদীর কেবলমাত্র **বদ্বীপ** অংশ সমভূমিতে। বাকী সমুদয় অংশ মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত। কাজেই এই নদীর সাহায্যে **জলজ বিদ্যুৎশক্তি** উৎপাদনের সুযোগ প্রচুর। এই নদীর **হীরাকুঁদ বাঁধ** পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী-বাঁধ। ইহার জলের সাহায্যে প্রচুর সেচকার্যও হয়। **সম্বলপুর, কটক** প্রভৃতি এই নদীর তীরে এবং চিল্কা হ্রদ ইহার বদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত।

(৫) **গোদাবরী** (দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪৪০ কিঃ মিঃ)—পশ্চিমঘাট পর্বতে নাসিকের নিকট অর্থাৎ আরব সাগর হইতে মাত্র ৮০ কিঃ মিঃ দূরে ইহার উৎস। এখান হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে আসিয়া ইহা বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। **প্রাণহিতা, ইন্দ্রাবতী, শবরী** প্রভৃতি ইহার বাম তটের উপনদী এবং **মঞ্জিরা** ডান তটের উপনদী। **ওয়ার্ধা, পেনগঙ্গা** প্রভৃতি ইন্দ্রাবতীর উপনদী। গোদাবরী নদীর **বদ্বীপও** বিস্তীর্ণ। ভারতের প্রায় ১০% স্থানের জল এই নদীর মধ্য দিয়া নিকাশ হয়। এই নদীর অববাহিকা অঞ্চল কৃষি, শিল্প, লোকবসতি প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত সুবিধা-

জনক। সেজন্য ইহা দক্ষিণ ভারতের প্রধান নদী বা **দক্ষিণের গঙ্গা**। জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও সেচ সম্পর্কে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্ধ্রপ্রদেশের **রাজামান্দ্রী** ইহার ব্দ্বীপের উপর অংশে অবস্থিত।

(৬) **কৃষ্ণা** (প্রায় ৭৫০ কিঃ মিঃ)—পশ্চিমঘাট পর্বতের মহাবালেশ্বরের নিকটবর্তী স্থান ইহার উৎস। অর্থাৎ আরব সাগর হইতে মাত্র ৬৫ কিঃ মিঃ দূরে মহাবালেশ্বরের নিকট হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। তারপর ভূমির ঢাল অনুসারে দক্ষিণ
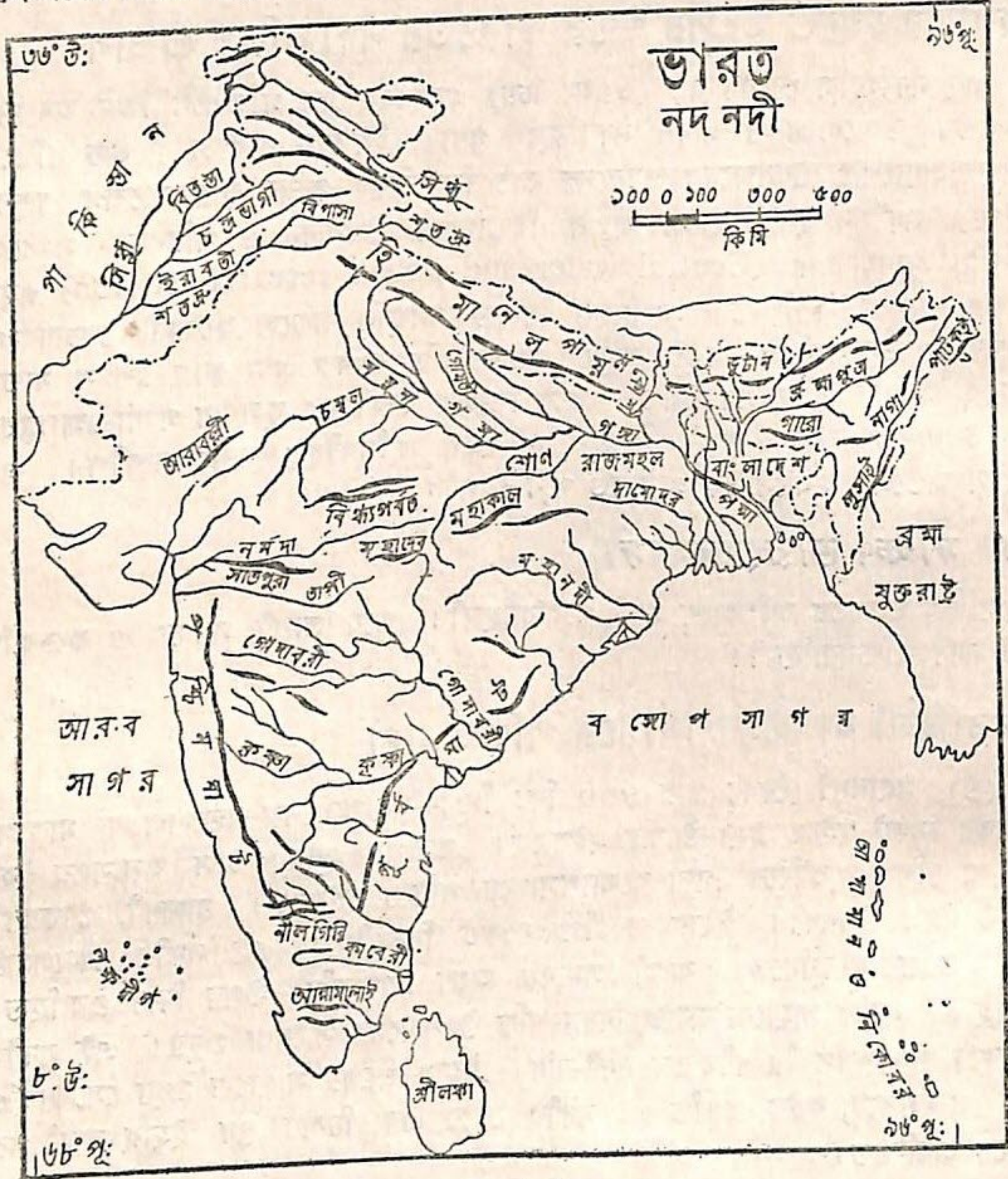
৬৭নং চিত্র।

ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে গিয়া ইহা বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। **তুঙ্গভদ্রা, ঘাটপ্রভা, মালপ্রভা** প্রভৃতি ইহার ডান তটের উপনদী এবং **ভীমা, মুসী** প্রভৃতি ইহার বাম তটের উপনদী। কৃষ্ণার **ব্দ্বীপ** গোদাবরী **ব্দ্বীপের** ঠিক দক্ষিণে। এই নদীও জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও **সেচের** পক্ষে বিশেষ উপকারী। অন্ধ্রপ্রদেশের **বিজয়ওয়াদা** কৃষ্ণার তীরে অবস্থিত। আর **কুর্ণুল** তুঙ্গভদ্রার তীরে এবং **হায়দরাবাদ** মুসীর তীরে অবস্থিত।

(৭) **কাবেরী** (প্রায় ৮০০ কিঃ মিঃ)—পশ্চিমঘাট পর্বতের ব্রহ্মাগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে গিয়া ইহা বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। **সিমসা** ইহার বাম তটের উপনদী এবং **ভবানী** ও **অমরাবতী** ইহার ডান তটের উপনদী। এই নদীর **শিবসমুদ্রম্** জলপ্রপাত, কৃষ্ণরাজা **বাঁধ** ও মেট্টুর **বাঁধ**, শ্রীরঙ্গম্ **দ্বীপ** এবং **কোলেরুন** শাখা নদী প্রসিদ্ধ। এই নদীও জলজ **বিদ্যুৎশক্তি** উৎপাদন ও **সেচের** পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই নদীর **বদ্বীপ খাল** এদেশের প্রাচীনতম সেচ খাল। তামিলনাড়ুর **তিরুচিরাপল্লী** ও **থাঞ্জাভুর** এই নদীর তীরে, আর কর্ণাটকের **শ্রীরঙ্গপত্তনম্** এই নদীর একটি দ্বীপে অবস্থিত। অনেকে এই নদীকেও **দক্ষিণা গঙ্গা** বা **দক্ষিণের গঙ্গা** বলে।

পশ্চিমবাহিনী বা আরব সাগরে পতিত নদী

(৮) **নর্মদা** বা **রেবা** (প্রায় ১৮০০ কিঃ মিঃ)—মহাকাল বা মাকালা পর্বতের অমর-কণ্টক শৃঙ্গ ইহার উৎস। এখান হইতে উৎপন্ন হইয়া বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের মাঝখানের **সঙ্কীর্ণ (গ্রস্ত) উপত্যকার** মধ্য দিয়া পশ্চিমদিকে গিয়া ইহা খামভাট (কাম্বে) উপসাগরে পতিত হইয়াছে। মধ্য প্রদেশের জব্বলপুরের নিকট মার্বেল পাথর অঞ্চলে সৃষ্টি হইয়াছে এই নদীর বিখ্যাত **ধুয়ানধারা জলপ্রপাত**। মধ্য প্রদেশের **জব্বলপুর** ও গুজরাটের **ভারুচ** (ব্রোচ) এই নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীর মোহনাতে **বদ্বীপ নাই**। এই নদীর মোহনা হইতে প্রায় ১০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত দেশের ভিতরদিকে নৌপথে যাতায়াত করা যায়।

(৯) **তাপী** বা **তাপ্তী** (প্রায় ৯৬০ কিঃ মিঃ)—মধ্য প্রদেশে মহাদেব পর্বত হইতে এই নদী উৎপন্ন হইয়াছে। তারপর উত্তরে সাতপুরা ও মহাদেব পর্বতের এবং দক্ষিণে অজন্তা পাহাড়ের মাঝখানের **সঙ্কীর্ণ (গ্রস্ত) উপত্যকার** মধ্য দিয়া পশ্চিম-দিকে গিয়া ইহা খামভাট (কাম্বে) উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহারও মোহনাতে **বদ্বীপ নাই**। ইহার উপনদী পূর্ণা। তাপীর মোহনাতে **সুরাট** বন্দর অবস্থিত।

দক্ষিণ ভারতের নদীর প্রভাব

এই অংশের নদীগুলি দৈর্ঘ্যে ছোট এবং কেবল মাত্র বৃষ্টির জল দ্বারা পুষ্ট। তাই বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে এগুলি থাকে অত্যন্ত ক্ষীণ বা শীর্ণ। তাহাছাড়া এগুলি দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চলের কঠিন শিলার উপর দিয়া প্রবাহিত। এজন্য কৃষিকার্য, যাতায়াত ও পরিবহন প্রভৃতি সম্পর্কে ইহাদের গুরুত্ব কম। তবে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও সেচ সম্বন্ধে ইহাদের গুরুত্ব আছে।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির মধ্যে তুলনা

উত্তর ভারতের নদী	দক্ষিণ ভারতের নদী
১। প্রধানতঃ দক্ষিণবাহিনী।	১। প্রধানতঃ পূর্ববাহিনী।
২। পার্বত্য অঞ্চলের তুষারগলা ও বৃষ্টির জল দ্বারা পুষ্ট।	২। কেবল মাত্র বৃষ্টির জল লাভ করে।
৩। নদীতে সারা বৎসর জল থাকে।	৩। নদীগুলি শীত কালে প্রায় শুকাইয়া যায়।
৪। নদীগুলি দীর্ঘ।	৪। নদীগুলির দৈর্ঘ্য কম।
৫। নদীগুলি নবীন এবং ইহাদের ক্ষয় কার্য অধিক।	৫। নদীগুলি প্রাচীন এবং ইহাদের ক্ষয় কার্য কম।

উত্তর ভারতের নদী	দক্ষিণ ভারতের নদী
৬। পার্বত্য অংশে ইহাদের উপত্যকা গভীর।	৬। মালভূমি বা সমভূমিতে সর্বত্র ইহাদের উপত্যকা অগভীর।
৭। বহু দূর বিস্তীর্ণ সমভূমির কোমল শিলার উপর দিয়া প্রবাহিত।	৭। ইহাদের গতি পথের বেশীর ভাগ মালভূমির কঠিন শিলার উপর দিয়া প্রবাহিত।
৮। উপত্যকা অঞ্চল কৃষিকার্য, শিল্প, যাতায়াত ও পরিবহন সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।	৮। কৃষি, শিল্প, যাতায়াত ও পরিবহন সম্পর্কে এই নদীগুলির গুরুত্ব কম।
৯। ইহাদের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা করা সহজ, কিন্তু জলজ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করা সহজ নয়।	৯। ইহাদের সাহায্যে জলজ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা সহজ, কিন্তু সেচের সুযোগ কম।
১০। ইহাদের উপত্যকা অঞ্চলে লোক-বসতি অধিক, শহর, নগর, গ্রাম প্রভৃতি সবচেয়ে বেশী।	১০। ইহাদের উপত্যকা অঞ্চলে লোক-বসতি কম, শহর, নগর, গ্রামও কম।

(গ) উপকূল অঞ্চলের নদী (Coastal rivers)

ভারতের উপকূল অঞ্চলের নদীগুলির দৈর্ঘ্য খুব কম। তন্মধ্যে দুই একটি বিশেষ কারণে প্রসিদ্ধ। যেমন, পশ্চিমবাহিনী **সরাবতী** নদীর **গারসোপা** এদেশের **উচ্চতম জলপ্রপাত**। তারপর পশ্চিমবাহিনী **পেরিয়ার** নদীর উচ্চ অংশকে **পেরিয়ার-ভাইগাই** প্রকল্প অনুসারে খালের সাহায্যে ভাইগাই নদীর সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। তাহা **পূর্ববাহিনী** ও বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে।

(ঘ) অন্তর্দেশীয় নদী (Inland rivers)

রাজস্থানের মরুপ্রায় অঞ্চলে কয়েকটি ক্ষুদ্র নদী আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি তথাকার কোন হ্রদে পতিত হইয়াছে, কয়েকটি পথেই শুকাইয়া যায়। কোন বৎসর অধিক বৃষ্টি হইলে ইহাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়। এই অঞ্চলের এক মাত্র বড় নদী **লুনি**। তাহা কচ্ছের রনে পতিত হইতেছে।

III. জলবায়ু ও তাহার প্রভাব

ভারতের **আবহাওয়া** ও **জলবায়ু বায়ুমণ্ডলের** কতকগুলি উপাদানের (elements of climate) উপর নির্ভরশীল। যেমন, বায়ুর **উষ্ণতা** ও **চাপ**, **বায়ুপ্রবাহ**, **বায়ুর আর্দ্রতা**, **বৃষ্টিপাত** প্রভৃতি। ইহাদের সম্পর্কে দেশের **অবস্থিতি**, বিশেষতঃ, **অক্ষাংশ**, **সমুদ্র হইতে দূরত্ব**, **আয়তন**, **ভূপ্রকৃতি**, **ভূগঠন** প্রভৃতি বিষয়ের (factors of climate) প্রভাব সুস্পষ্ট। যেমন, অবস্থিতি হিসাবে এদেশের দক্ষিণ অর্ধাংশ (প্রায় ৮° উঃ অঃ হইতে ২৩½° উঃ অঃ) উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত। আর উত্তর অর্ধাংশ (২৩½° উঃ অঃ হইতে প্রায় ৩৭° উঃ অঃ) উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত। কিন্তু দেশের বিভিন্ন অংশে ভূপ্রকৃতির পার্থক্য খুব বেশী। যেমন, দেশের উত্তর অংশ পার্বত্য অঞ্চল, মধ্য অংশ সমভূমি ও দক্ষিণ অংশ মালভূমি। তাহার উপর দক্ষিণ ভারতের আকৃতি প্রায় ত্রিকোণ। ফলে, তথায় পাশের সমুদ্রের প্রভাব খুব

বেশী। দেশের বিভিন্ন অংশে ভূগঠন সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যও খুব বেশী। রাজস্থানে আছে পাথর ও বালুকার প্রাধান্য, অথচ উত্তর ভারতের অন্যত্র পলি মাটির প্রাধান্য সুস্পষ্ট। উত্তর অংশের পার্বত্য অঞ্চলে এবং দক্ষিণে মালভূমি অংশেও কোমল মৃত্তিকার পরিমাণ কম। এসকল কারণে গ্রীষ্ম কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের উষ্ণতা এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। তারপর হিমালয় পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। আর পশ্চিমঘাট উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। কাজেই আর্দ্র মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে ও পশ্চিমঘাটের পশ্চিম ঢালে বাধা পায় সবচেয়ে বেশী। এজন্য হিমালয়ের দক্ষিণদিকে ও পশ্চিমঘাটের পশ্চিমদিকেই বৃষ্টি বেশী। এদেশের জলবায়ু সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের প্রভাবও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দেশে **ঋতু ছয়টি**। তন্মধ্যে **গ্রীষ্ম, বর্ষা** ও **শীত**—এই তিন ঋতুর দৈর্ঘ্য অধিক। এদেশের মানুষের জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে ইহাদের **প্রভাব** বা গুরুত্ব অধিক। আর **শরৎ, হেমন্ত** ও **বসন্ত**—এই তিন ঋতুর দৈর্ঘ্য ও প্রভাব কম। দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ঋতুর বৈচিত্র্য অধিক। প্রধান ঋতুগুলির ভিত্তিতে এদেশের জলবায়ুর বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) উষ্ণতা

গ্রীষ্ম কাল

পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক এই দুই গতির ফলে মার্চ মাসের শেষ হইতে নিরক্ষরেখার ক্রমশঃ অধিক উত্তরে মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হয়। তাহার ফলে এসকল স্থানে দিবা ভাগের দৈর্ঘ্যও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। অবশেষে জুনের শেষ ভাগে সূর্যরশ্মি মধ্যাহ্নে লম্ব ভাবে পতিত হয় কর্কটক্রান্তির উপর। এবং তখনই উত্তর গোলার্ধে দিবা ভাগের দৈর্ঘ্য থাকে সবচেয়ে বেশী। এদিকে আমাদের ভারত প্রায় ৮° উঃ অঃ হইতে প্রায় ৩৭° উঃ অঃ মধ্যে অবস্থিত। তাহার উপর উত্তর ভারতের আকৃতি প্রায় চতুষ্কোণের মত এবং আয়তন অনেক বড়। আর দক্ষিণ ভারতের আকৃতি প্রায় ত্রিকোণ। ফলে, দক্ষিণ ভারতের তুলনায় উত্তর ভারতের অনেক বেশী বিস্তীর্ণ অংশে সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হয়। এসকল কারণে এদেশে ফাল্গুন-চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল) মাস হইতেই উষ্ণতা বাড়িতে থাকে। **বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ** (মে-জুন) মাসে এদেশে উষ্ণতা থাকে বৎসরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। অর্থাৎ তখনই এদেশে **গ্রীষ্ম কাল**। দেশের **উত্তর-পশ্চিম** অংশে রাজস্থান, হরিয়ানা ও পঞ্জাবে তখন উষ্ণতা থাকে দেশের মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** (প্রায় ৩২-৩৫° সেঃ)। কখন কখন দিবা ভাগে রাজস্থানের কতক অংশের (জয়পুরে প্রায় ৪০-৫০° সেঃ) উষ্ণতা থাকে **পৃথিবীর উষ্ণতম স্থানের মত**। তথা হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে উষ্ণতা কমে। ফলে, **দক্ষিণ ভারতের উপকূল** অঞ্চলে তখনকার উষ্ণতা থাকে **যথেষ্ট কম** (প্রায় ২৭-২৮° সেঃ)। অবশ্য উচ্চ ভূপ্রকৃতির জন্য **হিমালয় অঞ্চলের উষ্ণতা** থাকে দেশের মধ্যে **সবচেয়ে কম**। যেমন, সিমলা, শ্রীনগর, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে ১৫-১৬° সেঃ ; ক্রমশঃ উপরে আরও কম (৬৮নং চিত্র)।

বর্ষা কাল

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে জুন মাসের শেষ হইতেই মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি কর্কটক্রান্তি হইতে ক্রমশঃ অধিক দক্ষিণে লম্ব ভাবে পতিত হইতে থাকে। তখন হইতে দিবা ভাগের দৈর্ঘ্যও ছোট হয়। তাহাছাড়া তখনই এদেশে অধিক বৃষ্টি হয়,

উষ্ণতা বেশী। ফলে, দক্ষিণ উপকূল অঞ্চলে তখনকার উষ্ণতা থাকে প্রায় ২৪-২৭° সেঃ। অর্থাৎ তথাকার ডিসেম্বর মাসের উষ্ণতাও প্রায় **গ্রীষ্ম কালের উষ্ণতার** মত। কাজেই এই সময়কে **দক্ষিণ ভারতের** পক্ষে শীত কাল বলা সঙ্গত **নয়**। তখন তথায় উত্তর ভারতের মত শীত কালের পোশাক বা গরম জামা-কাপড় দরকার হয় না। অপরদিকে **হিমালয় অঞ্চলে** তখন রাত্রির উষ্ণতা থাকে হিমাঙ্কের নীচে এবং প্রচুর **তুষারপাত** হয়। বহুদিন পর্যন্ত তথায় ঐ তুষারস্তূপ জমিয়া থাকে।

বসন্ত কাল

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে ডিসেম্বরের শেষ হইতে মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি মকরক্রান্তির ক্রমশঃ উত্তরদিকে লম্ব ভাবে পতিত হইতে থাকে। তখন হইতে দিবা-মানের দৈর্ঘ্যও বাড়ে। **মার্চের শেষ ভাগে** সূর্যরশ্মি মধ্যাহ্নে লম্ব ভাবে পতিত হয় নিরক্ষরেখার উপর (সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগের মত)। তখনই পৃথিবীর সর্বত্র দিবা-রাত্রি প্রায় সমান থাকে। আমাদের দেশের দক্ষিণ অংশ নিরক্ষরেখার খুব কাছে (কন্যাকুমারী বা কুমারিকা অন্তরীপ প্রায় ৮° উঃ অঃ)। এজন্য তখন আমাদের দেশে আর শীত কাল নাই, গ্রীষ্ম কালও অনেক দূরে। ফলে, তখনই এদেশে **আরামদায়ক বসন্ত কাল**। তবে তাহা খুব অল্প কাল স্থায়ী।

(খ) বায়ুপ্রবাহ

গ্রীষ্ম কাল ও বর্ষা কাল

ভারতের **উত্তর-পশ্চিম** অংশে গ্রীষ্ম কালে অধিক উষ্ণতার ফলে বায়ুমণ্ডলের চাপ অত্যন্ত কমিয়া যায়। ক্রমশঃ তথায় **প্রবল** নিম্নচাপ (low pressure) কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের স্থায়ী নিম্নচাপের চেয়ে এখানকার নিম্নচাপ তখন অধিক প্রবল এবং ইহার প্রভাবও বেশী। অপর দিকে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশে মকরক্রান্তির আশপাশে তখন উচ্চচাপ (high pressure) থাকে খুব প্রবল। এজন্য বায়ু প্রবাহের সাধারণ ধর্ম বা রীতি অনুসারে তখন ভারত মহাসাগরের ক্রান্তীয় (মকরীয়) উচ্চচাপ (Tropical high pressure) অঞ্চল হইতে বায়ু উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রবল নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে বেগে আসিতে থাকে। ঐ বায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চল **পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব** দিক্ হইতে আসে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশের নিম্নচাপ আরও প্রবল বলিয়া এই বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চল ছাড়াইয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতের ঐ নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে আসে। তবে নিরক্ষরেখা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে এই বায়ু উত্তর গোলার্ধের উপর দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। এজন্য পৃথিবীর আবর্তন গতি ও ফেরেল সূত্র অনুসারে ঐ বায়ু ডানদিকে বাঁকিয়া যায়। একারণে ঐ বায়ু ভারতের দিকে আসে **দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্** হইতে। ইহাই **গ্রীষ্ম কালীন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু** নামে পরিচিত। নিরক্ষরেখার উত্তরদিকের এই অংশে নিয়ত বায়ুবলয় (Planetary winds) অনুসারে উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রবাহই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে **ঋতু অনুসারে বায়ুপ্রবাহের** দিক্ পরিবর্তন হইতেছে। অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ুর পরিবর্তে দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হয়। এজন্যই ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম **মৌসুমী* বায়ু** নামে পরিচিত।

* মৌসুমী (আরবী শব্দ)=ঋতু। কাজেই মৌসুমী বায়ু=যে বায়ু ঋতু অনুসারে তাহার প্রবাহের দিক্ পরিবর্তন করে।

অর্থাৎ সেই সময়ই বর্ষা কাল। ফলে, এদেশে তখনকার উষ্ণতা গ্রীষ্ম কালের উষ্ণতার চেয়ে কম। সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হয় নিরক্ষ-রেখার উপর (মার্চ মাসের শেষ ভাগের মত)। তখন আবার দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্য থাকে প্রায় সমান। সে-সময় এদেশের অধিকাংশ স্থানেরই উষ্ণতা কম। পাহাড় অঞ্চলে তখন রাত্রে শীত বোধ হয়।

শীত কাল

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ হইতে মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার ক্রমশঃ অধিক দক্ষিণে লম্ব ভাবে পতিত হইতে থাকে। তখন এদেশে উষ্ণতা ক্রমশঃ কমে, দিবামানের দৈর্ঘ্যও কমে, রাত্রির দৈর্ঘ্য বাড়ে। ডিসেম্বরের

৬৮নং চিত্র।

শেষ ভাগে মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হয় মকরক্রান্তির উপর। তখন এদেশে শীত কাল। সে-সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজস্থান হইতে পঞ্জাব পর্যন্ত বায়ুর উষ্ণতা থাকে সাধারণতঃ ১০-১৮° সেঃ। হিমালয় অঞ্চল ভিন্ন দেশের অন্যান্য স্থানের মধ্যে এখানেই তখন উষ্ণতা সবচেয়ে কম। অথচ গ্রীষ্ম কালে এখানেই উষ্ণতা থাকে এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। শীত কালে রাজস্থান হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে

গ্রীষ্ম কালে ভারত মহাসাগরের উপর দিয়া যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা ক্রমশঃ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া ভারতের দিকে আসে। তাহাদের মধ্যে একটি আসে আরব সাগরের উপর দিয়া, অপরটি আসে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া। এজন্য তখন এদেশের দিকে প্রবাহিত মৌসুমী বায়ুর একটি আরব সাগরীয় শাখা ও অন্যটি বঙ্গোপসাগরীয় শাখা। এদেশের বৃষ্টিপাত এবং মানুষের জীবন, জীবিকা অর্জন প্রভৃতি সম্পর্কে এই **বায়ুপ্রবাহের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী।** এই বায়ু প্রবাহের **আরব সাগরীয় শাখা** প্রথমে পেঁছে ভারতের পশ্চিম উপকূলে। এখানে পেঁছিবার পর তাহার উত্তর অংশ পশ্চিমঘাট পর্বতের উত্তর দিক্ দিয়া সোজাসুজি উত্তর-পশ্চিম ভারতের নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে যায়। এই বায়ু প্রবাহের অপর অংশ পশ্চিম ঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে বাধা পায় এবং ক্রমশঃ উপর দিকে উঠে। তারপর ঐ পর্বত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে পেঁছে। আর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর **বঙ্গোপসাগরীয় শাখার** এক অংশ ব্রহ্মদেশের আরাকান য়োমা ও অন্যান্য পাহাড়, পর্বতে বাধা পায়। তাহার কতক অংশ ঐ বাধা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশের ভিতরে প্রবেশ করে। এই বায়ুর অপর কতক অংশ বাঁকিয়া বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া উত্তর দিকে অর্থাৎ **গাঙ্গেয় বদ্বীপ ও নিম্নগঙ্গা সমভূমির দিকে** আসে। তাহাছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখার অপর কতক অংশ বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া সোজাসুজি এই অঞ্চলের দিকে আসে। দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক্ হইতে আগত এই **বায়ু প্রবাহ** প্রবল বেগে নিম্নগঙ্গা সমভূমির (পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা) উপর দিয়া উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে আসে। ক্রমশঃ ইহা গিয়া হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে বাধা পায়। আরও আগাইয়া তাহা মেঘালয়ের গারো, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে এবং আরও পূর্বদিকে নাগা, বরাইল, লুসাই প্রভৃতি পাহাড়ের দক্ষিণ ও পশ্চিম ঢালে বাধা পায়। ইহার **প্রভাবে** এসকল স্থানে প্রচুর বৃষ্টি হয়। এখান হইতে ঐ বায়ু প্রবাহের কতক অংশ বাম দিকে বাঁকিয়া যায়। তারপর উত্তর-পশ্চিম ভারতের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে (প্রায় পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে) অগ্রসর হয়। এই অবস্থা চলে বর্ষা কাল পর্যন্ত (৬৯নং চিত্র)।

এই দীর্ঘ সময়ে এদেশের বিভিন্ন অংশে কতক **স্থানীয় বায়ু প্রবাহেরও** যথেষ্ট গুরুত্ব ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন, গ্রীষ্ম কালে সাধারণতঃ দুপুরের পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয় উত্তপ্ত **'লু'** বায়ু, আর সন্ধ্যায় এই অঞ্চলে প্রবাহিত হয় **আঁধি** বা **ধূলিঝড়**। সন্ধ্যা কালে এরূপ ঝড়ের পরে তথাকার উষ্ণতা কিছু কমে। আর গ্রীষ্ম কালেই গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে সন্ধ্যার দিকে মাঝে মাঝে **কালবৈশাখীর** (Norwester) তাণ্ডব দেখা যায়। প্রবল ঝড় এবং বজ্র-বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি তাহার প্রধান লক্ষণ।

শরৎ কাল ও হেমন্ত কাল

সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি আবার নিরক্ষীয় অঞ্চলে লম্ব ভাবে পতিত হয়। আর প্রায় এই সময় পর্যন্তই এদেশের বর্ষা কাল। কাজেই ইহাদের প্রভাবে এসময়ে এদেশে **উষ্ণতার পরিমাণ কমে।** বিশেষতঃ ইহার ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের **নিম্নচাপ কেন্দ্র প্রায় লুপ্ত হয়।** এজন্য তখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আর এই অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় না। বরং তখন এদেশের উপর দিয়া **উত্তর-পূর্বদিক্ হইতে বায়ু** দক্ষিণে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। কেহ কেহ

ইহাকে **প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমী** (Retreating monsoon) বায়ু বলেন। এই বায়ুর প্রভাবে এসময়ে বৃষ্টি বেশী হয় না। তবে মাঝে মাঝে কালবৈশাখীর মত বা আরও প্রবল ঝড় হয়।

শীত কাল

ডিসেম্বরের শেষ ভাগে **মকরক্রান্তি অঞ্চলে** মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হয়। ফলে, তখন তথাকার বায়ুমণ্ডলে **নিম্নচাপ** কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। অপর দিকে **কর্কটক্রান্তি** অঞ্চলে তখন থাকে উচ্চচাপ। অধিকন্তু ভারতের উত্তর দিকে **হিমালয়** অঞ্চলে তখন প্রচুর তুষারপাত হয়। ফলে, তথায় ক্রমশঃ উঁচু হইয়া তুষার জমে। এজন্য তথায়ও থাকে উচ্চচাপ। এপ্রকার অবস্থার ফলে তখন **উত্তরদিক্ হইতে শীতকালীন উত্তর-পূর্ব মৌসুমী** বায়ু ভারতের উপর দিয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু ছাড়া তখন হিমালয় অঞ্চল হইতে **তীব্র শীতল** বায়ু বা **হিম প্রবাহ** বা **শৈত্য প্রবাহ** মাঝে মাঝে উত্তর ভারতের সমভূমির দিকে প্রবাহিত হয়। ইহার প্রভাবে দক্ষিণদিকের সমভূমিতে গবাদি পশু, এমন কি কতক মানুষও মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(গ) বৃষ্টিপাত

গ্রীষ্ম কাল

এপ্রিল-মে (চৈত্র-বৈশাখ) মাসে **গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে** দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের **সময়ে** মাঝে মাঝে **কালবৈশাখীর** ঝড় এবং সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই সময়ের বৃষ্টিকে **প্রাক্-মৌসুমী** (Pre-monsoon) **বৃষ্টিও** বলা হয়। এই অঞ্চলে পাট, মেস্তা, আউস ধান প্রভৃতির চাষের পক্ষে এই বৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ। **দক্ষিণ ভারতেও** এসময় কিছু বৃষ্টি হয়। তাহার প্রভাবে তথায় আমের ফসল ভাল হয়। সেজন্য সেদিকে ইহাকে **আম্র বৃষ্টি** (Mango shower) বলে।

বর্ষা কাল

গ্রীষ্ম কালে ও তাহার পরে কিছু দিন আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া আর্দ্র **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু** ভারতের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে আসে। এই বায়ু দ্বারা এদেশের অধিকাংশ (৭৫-৯০%) বৃষ্টি হয়। সেজন্য এই বৃষ্টির সময়ই এদেশের পক্ষে **বর্ষা কাল**। এসময়ের বৃষ্টির সহিত **ঘূর্ণবাতের সম্পর্ক** খুব বেশী (cyclonic rain)। তখনকার জলীয় বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর **আরব সাগরীয় শাখার** বৃহৎ অংশ **পশ্চিমঘাট** পর্বতের **পশ্চিম ঢালে** বা প্রতি-বাত পার্শ্বে (windward side) বাধা পায়। তাহার প্রভাবে তথায় অধিক (২০০ সেঃ মিঃ-র অধিক) **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি** (relief rain) হয়। মহাবালেশ্বরের আশ-পাশেই বৃষ্টি হয় ঐ অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। তারপর পশ্চিমঘাট পর্বত পার হইয়া বায়ু প্রবাহ যখন পূর্বদিকে দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে পৌঁছে তখন তাহা থাকে প্রায় শুষ্ক। তাহাছাড়া পশ্চিমঘাট হইতে নীচের দিকে নামিবার সময় এই বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়। এজন্য ঐ পর্বতের **পূর্বদিকের ঢালে** বা অনুবাত পার্শ্বে (leeward side), **পর্বতের** পূর্বদিকের **পাদদেশে** এবং দাক্ষিণাত্য **মালভূমির মধ্য** ভাগে বৃষ্টির পরিমাণ খুব কম বা নামমাত্র। এজন্য এসকল স্থান **বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল**

(rain shadow areas)। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আরব সাগরীয় শাখার যে অংশ পশ্চিমঘাট পর্বতের উত্তরদিক্ দিয়া প্রবাহিত হয় তাহাদ্বারা গুজরাটের **দক্ষিণ-পশ্চিম** অংশে যথেষ্ট **বৃষ্টি হয়**। কিন্তু ক্রমশঃ পূর্বদিকে বৃষ্টি কমে। তাহার কারণ, এখানে এক দিকে সমুদ্র হইতে দূরত্ব বাড়ে, অন্য দিকে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ক্রমশঃ কমে এবং স্থানীয় উষ্ণতা বাড়ে। এসকল কারণে রাজস্থানে বৃষ্টির পরিমাণ খুব কম (২০-২৫ সেঃ মিঃ)। একারণেই এখানকার অধিকাংশ মরুপ্রায় ; কতক স্থানে ৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিও হয় না।

আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর **বঙ্গোপসাগরীয় শাখা দ্বারা** ব্রহ্মদেশের **আরাকান উপকূল** হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত ও বাংলাদেশের **গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চল** পর্যন্ত অধিক (২০০ সেঃ মিঃ'র অধিক) **বৃষ্টি** হয়। তথা হইতে ক্রমশঃ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে বৃষ্টি কমে। গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের সমভূমির উপর দিয়া আসিয়া এই বায়ু প্রবাহ উত্তরে **হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে ও পাদদেশে** এবং **উত্তর-পূর্বদিকের পাহাড়, পর্বতের দক্ষিণ ও পশ্চিম ঢালে** বা প্রতিবাত পার্শ্বে প্রবল বাধা পায়। তখন তাহা উপর দিকে উঠে। তাহার ফলে এসকল স্থানে বৃষ্টি হয় গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের চেয়ে **বেশী** (৩০০-৪০০ সেঃ মিঃ)। মেঘালয়ের শিলং ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশের সবচেয়ে উঁচু (১৯৬১ মিঃ) জায়গা। তাহার দক্ষিণে, অর্থাৎ খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে বৃষ্টি হয় এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এখানকার **চেরাপুঞ্জি** ও **মাসিনরাম** বা **মৌসিমরাম** বা **মৌসমাইতে** বৃষ্টি হয় সম্ভবতঃ **পৃথিবীর** মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** (১২৫০-১৫০০ সেঃ মিঃ)। এই মৌসুমী বায়ু ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়। এজন্য উত্তর ভারতের সমভূমিতে **পূর্ব হইতে পশ্চিমে** বৃষ্টির পরিমাণ কম। আবার হিমালয়ের **পাদদেশ হইতে** ক্রমশঃ **দক্ষিণেও বৃষ্টি কম**। যেমন, দার্জিলিং-এ বৃষ্টি প্রায় ৩০০ সেঃ মিঃ, উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের নিকট বৃষ্টি প্রায় ১০০ সেঃ মিঃ। আরও পশ্চিমে দিল্লীর নিকট বৃষ্টি প্রায় ৫০ সেঃ মিঃ এবং পঞ্জাবে প্রায় ২০ সেঃ মিঃ।

ভারতে বর্ষা কালে **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের** প্রভাবে যে **বৃষ্টি** হয় তাহার গুরুত্ব ও প্রভাব **অতুলনীয়**। এদেশের সর্বপ্রধান খাদ্যশস্য ধান, কম গুরুত্ব-পূর্ণ ফসল ভুট্টা, রাগি, বাজরা প্রভৃতির চাষ এই বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। তাহা-ছাড়া এদেশের নানাপ্রকার সব্জি এবং পাট, কার্পাস, আখ প্রভৃতি বহুবিধ ফসলের উৎপাদনও এই সময়ের বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। আবার এসকল ফসলের উপর নির্ভর করে এদেশের পাট ও কার্পাস বস্ত্র, চিনি প্রভৃতি শিল্পের উন্নতি বা সাফল্য। কাজেই এদেশে মৌসুমী বায়ু দ্বারা বর্ষা কালে **সময় মত** এবং **প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির** সহিত এদেশের মানুষের জীবন-মরণ সম্পর্ক। এদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে বৃষ্টি হয় বৎসরে মাত্র ২-৩ মাস (জুন-আগস্ট) এবং বৃষ্টির পরিমাণও সবচেয়ে কম (২০-৫০ সেঃ মিঃ)। তবে সৌভাগ্য বশতঃ দেশের মোট আয়তনের মাত্র ১০%-এর কম স্থানে বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ ৪০ সেঃ মিঃ-র কম। এদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণ দুইই বেশী। দক্ষিণ ভারতে স্থানে স্থানে ৬-৭ মাস (জুন-ডিসেম্বর) বৃষ্টি হয়, তবে মাঝে মাঝে ফাঁক যায়।

শরৎ ও হেমন্ত কাল

শরৎ ও হেমন্ত কালে এদেশের উপর দিয়া উত্তর-পূর্বদিক্ হইতে প্রায় শুষ্ক বায়ু দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়। কাজেই দেশের অধিকাংশ স্থানে তখন বৃষ্টি হয় খুব কম। ঐ বায়ু যখন বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া দেশের পূর্ব উপকূলে পেঁছে তখন তাহার মধ্যে কিছু জলীয় বাষ্প থাকে। ফলে, তাহা দ্বারা তখন এসকল স্থানে মধ্যম রকম বৃষ্টি হয়। এসময়ের বৃষ্টির সহিতও ঘূর্ণবাতের সম্পর্ক (cyclonic rain) খুব বেশী। তখন ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের অনেক স্থানের বৃষ্টির পরিমাণ জুন-জুলাই মাসের বৃষ্টির চেয়ে কম নয়।

শীত কাল

শরৎ কাল হইতে এদেশের উপর দিয়া উত্তর-পূর্ব বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। শীত কালেও এদেশের উপর দিয়া ঐরূপ বায়ু প্রবাহিত হয়। পথে তাহা বঙ্গো-

৬৯নং চিত্র।

পসাগরের উপর দিয়া আসে। তাই দেশের পূর্ব উপকূলে তাহার প্রভাবে বৃষ্টি বাড়ে। এজন্য এই অংশের করমণ্ডল উপকূলে প্রায় জুন হইতে ডিসেম্বর-জানুয়ারি পর্যন্ত বৃষ্টি চলে। এখানে দেশের অন্যান্য স্থানের মত জুলাই-আগস্ট মাসে এক বার বেশী বৃষ্টি হয়, আর এক বার অধিক বৃষ্টি হয় ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে।

অবশ্য মাঝে মাঝে ফাঁক যায়। শীত কালে দেশের **উত্তর-পশ্চিম** অংশে জম্মু ও কাশ্মীর হইতে হরিয়ানা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে পশ্চিমদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ুর প্রভাবে কিছু বৃষ্টি হয়। ইহার সহিতও ঘূর্ণবাতের সম্পর্ক অধিক।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে দুই অংশে শীত কালে কিছু বৃষ্টি হয়। তাহা তথায় গম, নানারকম ডাল, কার্পাস, তৈলবীজ প্রভৃতি রবি শস্যের চাষের পক্ষে উপকারী। করমণ্ডল উপকূলে ধানেরও চাষ হয়। সেচের ফলে ইহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়।

ভারতের বিভিন্ন অংশে জলবায়ুর পার্থক্য

পৃথিবীর খুব কম দেশেই এদেশের বিভিন্ন অংশের মত **জলবায়ুর বৈচিত্র্য দেখা** যায়। **সাধারণভাবে** এদেশের জলবায়ু **মৌসুমী প্রকৃতির** (Monsoon type of climate)। দেশের **অধিকাংশ স্থানেই** মানুষের জীবন ও জীবিকা অর্জন সম্বন্ধে **মৌসুমী বায়ুর প্রধান্য ও গুরুত্ব খুব বেশী**। তাহা সত্ত্বেও দেশের নানা স্থানে উষ্ণ মরু হইতে প্রায় তুন্দ্রা অঞ্চলের জলবায়ু পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু দেখা যায়। যেমন, উত্তরদিকে **হিমালয়** অঞ্চলের **উপরিভাগে** শীত কালের জলবায়ু প্রায় তুন্দ্রা অঞ্চলের জলবায়ুর মত। যেমন, লেহ-তে তখনকার উষ্ণতা প্রায় -২৮° সেঃ। অথচ তথায় গ্রীষ্ম কালের জলবায়ু আরামদায়ক নাতিশীতোষ্ণ (১০-১৫° সেঃ) প্রকৃতির। তারপর হিমালয়ের পশ্চিম অংশে (জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ব অংশে) লাডাকের অবস্থা প্রায় বৃষ্টিহীন **শীতল মরুর মত**। কিন্তু হিমালয়ের **পূর্ব অংশে বৃষ্টি অত্যন্ত বেশী**। তাহার পাশে মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি ও মসিনরামের বৃষ্টির পরিমাণ পৃথিবীতে সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী। তারপর উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিল্লী-পঞ্জাব-হরিয়ানাতে শীত ও গ্রীষ্ম কালের উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী। যেমন, দিল্লীতে গ্রীষ্ম কালের উষ্ণতা প্রায় ৩৪° সেঃ কিন্তু শীত কালের উষ্ণতা প্রায় ১৪° সেঃ। তাহাছাড়া দিল্লীতে বৃষ্টি কম (বাৎসরিক প্রায় ৬০-৬৫ সেঃ মিঃ)। আবার এখান হইতে জম্মু ও কাশ্মীর পর্যন্ত গ্রীষ্ম কালে বৃষ্টি কম। অথচ এখানকার কতক স্থানে শীত কালে প্রধানতঃ ঘূর্ণবাতের প্রভাবে কিছু বৃষ্টি হয়। তারপর **রাজস্থানের** জলবায়ু **মরুপ্রায়**। যেমন, জয়পুরের গ্রীষ্ম কালের উষ্ণতা কখন কখন ৪০-৫০° সেঃ, কিন্তু শীত কালের উষ্ণতা ১৫-১৬° সেঃ। রাজস্থানের বহু স্থানের বাৎসরিক বৃষ্টি ২০ সেঃ মিঃ-র কম। দক্ষিণ ভারতের মালভূমির মধ্য ভাগে বৃষ্টি মধ্যম রকম। যেমন, ব্যাঙ্গালোরে বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ ১৫০ সেঃ মিঃ। এই মালভূমি অঞ্চলের কতক স্থানে বৃষ্টি আরও কম বা এই অংশ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল। অথচ পশ্চিমঘাটের পশ্চিম ঢালে ও পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টি খুব বেশী। দাক্ষিণাত্যের উপকূলে সমুদ্রের প্রভাবে এবং পর্বতের উপরিভাগে উচ্চতার জন্য উষ্ণতা কম অর্থাৎ প্রায় নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা। যেমন, বোম্বাইতে গ্রীষ্ম কালের উষ্ণতা প্রায় ২৯° সেঃ, কিন্তু শীত কালের উষ্ণতা প্রায় ২৪° সেঃ। এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয় (বাৎসরিক ১৮০-২০০ সেঃ মিঃ)। পূর্ব উপকূলেও উষ্ণতা কম। যেমন, মাদ্রাজে গ্রীষ্ম কালের উষ্ণতা ৩০-৩২° সেঃ, শীত কালের উষ্ণতা ২৪° সেঃ। পূর্ব, উপকূলের **দক্ষিণ অংশে বৎসরে দুই বার অধিক বৃষ্টি হয়**। অর্থাৎ এবিষয়ে কতক পরিমাণে নিরক্ষীয় অঞ্চলের সহিত মিল লক্ষ্য করা যায়।

(iv) স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও বনজ সম্পদ্ এবং তাহাদের প্রভাব

বর্তমান সময় ভারতের মোট আয়তনের প্রায় ২২·৭% **বনভূমি,** অর্থাৎ এদেশের বন অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৭·৫ কোটি হেক্টর। স্পষ্টই বুঝা যায় এদেশের আয়তনের তুলনায় বনভূমির আয়তন যথেষ্ট কম। আর পৃথিবীর মোট বনের সহিত এখানকার বনের তুলনা করিলে দেখা যায় এখানকার বনের অবস্থা আরও খারাপ। কারণ, এদেশে আছে **পৃথিবীর মাত্র ২% বন।** অথচ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫% বাস করে এদেশে। এদেশে বন অঞ্চলে প্রায় ৩০,০০০ **ধরনের গাছপালা** আছে। তাহাদের মধ্যে ৯০%-**এর বেশী প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী** গাছ, আর বাকী ১০%-এর মত সরলবর্গীয় গাছ। এদেশের বনের প্রায় ৯৪% সরকারের সম্পত্তি (state owned)। বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্গত বন অঞ্চলের উন্নতি, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতির দায়িত্ব প্রত্যেক রাজ্যের উপর ন্যস্ত! এদেশের অধিকাংশ বন **মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্য মালভূমির অংশে** এবং মাত্র ২০% বন দেশের **উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অংশের পর্বত অঞ্চলে** অবস্থিত। তবে রাজ্য হিসাবে এদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে অরুণাচল প্রদেশ হইতে মিজোরাম পর্যন্ত রাজ্যসমূহের এবং দক্ষিণে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তনের ৫০-৮০% বনভূমি। এই সকল অঞ্চলে এবং মধ্য প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার বন অঞ্চলে বহু উপজাতির লোক বাস করে। তাহাদের আয়ের বৃহৎ অংশ (১০-৫৫%) বনজ সম্পদ্ সংগ্রহ করার উপর নির্ভর করে। অথচ নানাকারণে গত ৩০ বৎসরে এদেশের বনের আয়তন ৬%-এর বেশী হ্রাস পাইয়াছে। গত ৮-১০ বৎসরেই প্রায় ৩% হ্রাস পাইয়াছে। বন অঞ্চলের আয়তন কমিবার সঙ্গে সঙ্গে বনজ সম্পদ্ এবং প্রাণিজ সম্পদ্ও কমিতেছে। বহু বন্য প্রাণীও নির্বিচারে হত্যা করা হইতেছে। বনের আয়তন বৃদ্ধি ও বন্য পশু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 'Social Forestry', বিশেষতঃ Rural Fuelwood Plantations ও Board of Wild life প্রভৃতির মাধ্যমে সরকার এখন সচেষ্ট। এদেশের বন অঞ্চলের উন্নতি বিধান সম্পর্কে **কেন্দ্রীয় গবেষণাগার** (Central Forest Research Institute) উত্তর প্রদেশের **দেরাদুনে** অবস্থিত। বন অঞ্চলের উন্নতি বিধান ও বনজ সম্পদ্ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি বড় হয় এবং নানা কাজে ব্যবহার করা সম্ভব এমন গাছ অধিক রোপণের ব্যবস্থা হইতেছে। এসম্পর্কে **বন মহোৎসব** অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদ্ অঞ্চল

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও কৃষিজ সম্পদের সহিত ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু প্রভৃতির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। এদেশের বিভিন্ন অংশে ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। সেজন্য এদেশে নিম্নলিখিত উদ্ভিদ্ অঞ্চল বর্তমান।

(ক) ক্রান্তীয় প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য অঞ্চল

দেশের উত্তরদিকে হিমালয়ের নিম্ন অংশে, উত্তর-পূর্ব অংশের পাহাড় অঞ্চলে, দক্ষিণে পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে জলবায়ু প্রধানতঃ **উষ্ণ আর্দ্র** প্রকৃতির। মূলতঃ তাহার প্রভাবে এসকল স্থানে **ক্রান্তীয় প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের** ঘন বন (Tropical evergreen broad

leaved forest) বহু দূর বিস্তৃত। এসকল স্থানে পাহাড়, পর্বতের পাদদেশ হইতে ক্রমশঃ উপর দিকে উচ্চতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির পরিবর্তন হয়। তাহার ফলে ক্রমশঃ উপরদিকে গাছের পার্থক্য সুস্পষ্ট। এজন্য সেখানে, বিশেষতঃ তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে দেখা যায় বহুতল অরণ্য। এসকল বনে আবলুস, মেহগিনি, গর্জন, শিশু, চাপলাস, পুন, গর্জন, তুন, বিশপ উড, রোজ উড, বোগা পোমা, চেষ্টনাট, ওক প্রভৃতি চিরহরিৎ গাছ অধিক। বাঁশ, বেত, লম্বা ঘাসও আছে খুব বেশী।

(খ) প্রশস্ত পত্রযুক্ত মিশ্রবৃক্ষের অরণ্য বা মৌসুমী অরণ্য অঞ্চল

এদেশের বেশীর ভাগ জায়গাতে মৌসুমী বৃষ্টির (১০০-২০০ সেঃ মিঃ) প্রভাব খুব বেশী। এজন্য এদেশের উত্তর-পূর্বদিকে অরুণাচল প্রদেশ হইতে পশ্চিমে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে বৎসরের একটি ঋতুতে অর্থাৎ বর্ষা কালে বৃষ্টি হয়। বাকী সময় এসকল স্থান প্রায় বৃষ্টিহীন।

৭০নং চিত্র।

তাই এসকল স্থানে আছে অসংখ্য প্রশস্ত পত্রযুক্ত পর্ণমোচী গাছ। আবার যেখানে বৃষ্টির জল একটু বেশী পাওয়া যায় সেখানে আছে চিরহরিৎ গাছ। কাজেই প্রকৃত পক্ষে এসকল স্থানে আছে মিশ্র গাছের বন। এসকল বনে শাল, সেগুন, খয়ের, হলদু, লরেল, ম্যাপল, অল্ডার, বার্চ (ভূর্জ পত্র), গাম্ভীর, জারুল, শিমুল, শিরিষ, হরীতকী, ছাতিম প্রভৃতি গাছ অধিক। তার উপরে ছোটনাগপুরে আছে বহু কুল, পলাশ, কুসুম, মহুয়া প্রভৃতি গাছ। আর দক্ষিণ ভারতে আছে অনেক চন্দন গাছ। এরূপ বন অঞ্চলে বাঁশ, বেত, লম্বা ঘাসও প্রচুর (৭০নং চিত্র)।

(গ) পর্বতের উচ্চতা অনুসারে বিভিন্ন জাতীয় গাছের অরণ্য অঞ্চল

এদেশের উত্তরদিকের পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশ হইতে ক্রমশঃ উপরদিকে উষ্ণতা কম। এখানকার বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাত সম্পর্কেও পার্থক্য প্রচুর। ফলে, পর্বতের পাদদেশে আছে প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ গাছের বন (ক)। তাহার উপর আছে শাল, সেগুন, ওয়ালনাট, ম্যাপল, চেরি, ওক, পপলার, সোমাল, হলদু, পিটুলি, বার্চ, লরেল, অল্ডার, কাঞ্জু প্রভৃতি পর্ণমোচী গাছের বন। আরও উপরে যেখানে উষ্ণতা অনেক কম, তথায় আছে নানারকম পাইন, ফার, কাইল, স্প্রুস, জুনিপার, চির, দেবদারু প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছ। আরও উপরে আছে তৃণভূমি ও ম্যাগনোলিয়া, রোডোডেনড্রন প্রভৃতি বিখ্যাত ফুলের গাছ।

(ঘ) লবণাক্ত উপকূলের অরণ্য অঞ্চল

এদেশের উপকূলে, বিশেষতঃ বদ্বীপসমূহের কর্দম ও লোনা মাটিতে উদ্ভিদের উপর মৃত্তিকার প্রভাব অধিক। সেজন্য এসকল স্থানে আছে গরান, কেয়া বা কেওড়া, সুন্দরী বা সোঁদরী, বান, হেতাল বা হন্তাল, পশুর, তাল, সুপারী, নারিকেল প্রভৃতি গাছ। এখানে বাঁশ, বেত এবং লম্বা ঘাসও আছে প্রচুর।

(ঙ) তৃণ ও গুল্ম অঞ্চল

এদেশের পশ্চিমে গুজরাট হইতে পূর্বদিকে মধ্য প্রদেশ পর্যন্ত এবং উত্তরে পঞ্জাব হইতে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৃষ্টি কম (৫০-১০০ সেঃ মিঃ)। কাজেই এসকল স্থানে বড় গাছের বিস্তীর্ণ বন নাই, কিন্তু গুল্ম ও তৃণভূমি বহু দূর বিস্তৃত।

(চ) শুষ্ক ও মরুপ্রায় অঞ্চলের উদ্ভিদ্

রাজস্থান ও আশপাশে বাৎসরিক বৃষ্টি ৫০ সেঃ মিঃ-র কম। কাজেই এখানে আছে নিকৃষ্ট তৃণভূমি ও কাঁটাযুক্ত গুল্ম। তাহা বাগার নামে পরিচিত। বাবলা, ফনিমনসা প্রভৃতি কাঁটাযুক্ত গাছ এখানে অনেক।

উদ্ভিজ্জ সম্পদ্

এদেশের বিভিন্ন বন হইতে (১৯৭৮-৭৯ খ্রীঃ) প্রায় ৮৮ লক্ষ ঘন মিটার (cu. m) শক্ত কাঠ এবং প্রায় ১৪ই লক্ষ ঘন মিটার জ্বালানি কাঠ পাওয়া গিয়াছে। ঐ বৎসরের শক্ত কাঠের মূল্য ছিল প্রায় ২৪৪·৫ কোটি টাকা। আর জ্বালানি কাঠের দাম ছিল প্রায় ৩২·২ কোটি টাকা। এদেশের সেগুন কাঠ (teak wood) বিশেষ মূল্যবান্ সম্পদ্। তাহা দ্বারা নানারকম আসবাবপত্র, রেলগাড়ি ও জাহাজের অংশ প্রভৃতি তৈরী হয়। মেহগিনি ও আবলুস কাঠদ্বারাও সুন্দর আসবাবপত্র তৈরী হয়। শাল ও গর্জন কাঠদ্বারা রেলপথের তক্তা (railway sleeper), ঘরবাড়ি ও সেতু প্রভৃতির অংশ তৈরী হয়। শিশু, চাপলাস, গামর, গরান প্রভৃতি গাছের কাঠদ্বারাও আসবাবপত্র তৈরী হয়। শিমুল, ছাতিম, পিটুলি প্রভৃতি গাছের কাঠদ্বারা দিয়াশলাই তৈরী হয়। পাইন, ফার প্রভৃতি গাছের কাঠদ্বারা খেলার সরঞ্জাম, প্যাকিং বাক্স প্রভৃতি তৈরী হয়। এসকল গাছের কোমল অংশের মণ্ড (pulp) দ্বারা কাগজ, বোর্ড ও প্ল্যাস্টিকের অসংখ্য জিনিস তৈরী হয়। সেগুন, মেহগিনি, চন্দন প্রভৃতি গাছের কাঠদ্বারা তৈরী সুন্দর ও সৌখীন জিনিস বিদেশেও রপ্তানি হয়।

পৃথিবীর যে সকল দেশে সবচেয়ে বেশী বাঁশ পাওয়া যায় ভারত তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এদেশের **বাঁশদ্বারা** কাগজের মন্ড তৈরী হয়। তাহাছাড়া **বাঁশ ও বেত দ্বারা** প্রচুর আসবাবপত্র তৈরী হয়। **কেন্দুপাতা দ্বারা** বিড়ি তৈরী হয়। বিভিন্ন বনে কুল, পলাশ প্রভৃতি গাছের ডালাতে প্রচুর **লাক্ষা** পাওয়া যায়। তাহা দ্বারা গালা, গ্রামোফোন রেকর্ড, বার্নিশ প্রভৃতি তৈরী হয়। এদেশের বিভিন্ন অংশে, বিশেষতঃ হিমালয়ে এমন অনেক ছোট বড় গাছ ও গুল্ম জন্মে, যাহাদের পাতা, শিকড়, ছাল প্রভৃতি দ্বারা নানারকম **ঔষধপত্র** তৈরী হয়। তাহাছাড়া সরলবর্গীয় গাছের রস হইতে পাওয়া যায় রজন, গাম, রং প্রভৃতি তৈরীর উপাদান। এদেশের বিভিন্ন বন ও তৃণভূমিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সাবুই, উলু, নল, খাগড়া প্রভৃতি ঘাস। বিভিন্ন জলাভূমিতে শোলা, হোগলা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ ও প্রচুর পাওয়া যায়। এই জাতীয় বিভিন্ন বনজ সম্পদের মোট মূল্য প্রায় ১১০ কোটি টাকা (১৯৭৮-৭৯ খ্রীঃ)। এগুলিদ্বারা নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরী হয়।

এদেশের বিভিন্ন বনে আছে ৫০টির বেশী **জাতীয় উদ্যান** (National Park) ও ২৫০টির বেশী **অভয়ারণ্য** (Sanctuary)। এসকল স্থানে নানারকম বন্য প্রাণীকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়। যেমন, গুজরাটের গির অরণ্যে দেখা যায় সিংহ, সুন্দরবনে দেখা যায় বাঘ, এখানকার সজনাখালিতে দেখা যায় অসংখ্য পাখী।

(v) *মৃত্তিকা ও তাহার প্রভাব*

এদেশের বিভিন্ন অংশের মৃত্তিকার মধ্যে উপাদান সম্বন্ধে পার্থক্য প্রচুর। নদী ও বৃষ্টির জলস্রোত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি দ্বারা বিভিন্ন উপাদান নিম্নভূমিতে সঞ্চিত হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয় **অপসৃত মৃত্তিকা** (transported soil)। ইহা খুব উর্বর। আর ভূপৃষ্ঠের শিলাসমূহ ক্রমশঃ চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার ফলে ঐ সকল স্থানে ও আশপাশে সৃষ্টি হয় **অবশিষ্ট মৃত্তিকা** (residual soil)। মৃত্তিকার মধ্যে এই দুই বিষয়ে পার্থক্য ছাড়া আছে ভূপ্রকৃতি, ও জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে পার্থক্য। ফলে, ভারতের বিভিন্ন অংশে **মৃত্তিকা নানা প্রকারের**। কৃষি ও অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার **প্রভাব সম্পর্কেও পার্থক্য** খুব বেশী। এদেশের মৃত্তিকা সম্বন্ধে **কেন্দ্রীয় গবেষণাগার** (Central Soil and Materials Research Station) নূতন দিল্লীতে অবস্থিত। এদেশের প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ অনুসারে মৃত্তিকার বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) *পার্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকা*

হিমালয়ের উচ্চতম অংশের মৃত্তিকার উপরিভাগে আছে বিরাট তুষারস্তূপ। এজন্য তথাকার মৃত্তিকা লোকচক্ষুর অগোচর। তথায় হিমরেখার * (snow line-এর) নীচে আছে **হিমবাহ মৃত্তিকা** (glacial soils)। হিমবাহের সহিত প্রবাহিত পাথর, নুড়ি, কাঁকর, বালুকা প্রভৃতি এখানে গ্রাবরেখা (moraine) রূপে সঞ্চিত আছে। সূক্ষ্ম গ্রাবরেখা মিশ্রিত মৃত্তিকা উর্বর। কিন্তু **কাঁকর মিশ্রিত পডসল** (podzolic soil or podsol) মৃত্তিকা অনুর্বর। তবে এই অঞ্চলের কতক অংশে আলু জন্মে। তাহার নীচে আছে **ধূসর অরণ্য মৃত্তিকা** (brown forest soils) অঞ্চল। তাহার

* ইহা একটি কাল্পনিক রেখা। এই রেখার নীচে তুষার গলিয়া যায়। কাজেই এই রেখা শীত কালে যেখানে থাকে গ্রীষ্ম কালে তাহার নীচে নামিয়া আসে।

কতক অংশে আছে আপেল, নেসপাতি, আখরোট, বাদাম প্রভৃতি ফলের বাগান। ধূসর অরণ্য মৃত্তিকা হইতে উপরদিকের মৃত্তিকাকে সাধারণতঃ **পার্বত্য মৃত্তিকা** (mountain soils) বা পার্বত্য অরণ্য অঞ্চলের মৃত্তিকা বলে।

পর্বতের পাদদেশ ও উপত্যকা অঞ্চলের মৃত্তিকা

পর্বতের পাদদেশে ও উপত্যকাতে কয়েক প্রকার মৃত্তিকা (submontane soils) আছে। তাহাদের মধ্যে **কাঁকরযুক্ত ল্যাটারাইট** (laterite) **মৃত্তিকা** ও **লোহিত দো-আঁশ মৃত্তিকা** (red loams) প্রধান। এখানে চাষের সুযোগ কম। তবে হিমালয়ের পূর্ব অংশের পাদদেশে আছে **লৌহমিশ্রিত** ও লতাপাতা পচান **হিউমাস সারযুক্ত মৃত্তিকা** (humous soils)। তাহা চায়ের আবাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আরও নীচে হিমালয়ের পূর্ব অংশে তরাই ও **ডুয়ার্স** অঞ্চলে সমভূমির সংযোগস্থলে আছে নুড়ি, কাঁকর ও কর্দম মিশ্রিত মৃত্তিকা। আর হিমালয়ের পশ্চিম অংশের পাদদেশে আছে বালুকা, কাঁকর ও নুড়ি মিশ্রিত মৃত্তিকা। ইহাকে **ভাবর** বলে। এসকল মৃত্তিকাও চাষের পক্ষে অনুপযোগী। প্রধানতঃ এজন্যই এখান হইতে উপরদিকে পার্বত্য অঞ্চলে বন বহু দূর বিস্তৃত।

(খ) উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা

উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা **উর্বর পলি**। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা **অপসৃত মৃত্তিকার** (transported soils) প্রকৃষ্ট উদাহরণ। **গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র**

৭১নং চিত্র।

ও **সিন্ধু**—ভারতের এই তিন প্রধান নদী ও ইহাদের উপনদীসমূহের জলস্রোতের সহিত প্রবাহিত পলি বহু কাল ধরিয়া এখানকার নিম্নভূমিতে স্তরে স্তরে সঞ্চিত

হইয়াছে। এভাবে এই অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের মধ্য ও পশ্চিম অংশের প্রধানতঃ উত্তর ভাগের মৃত্তিকা **প্রাচীন পলি** (old alluvium)। এখানকার কতক অংশে **কাঁকর ও বালুকা** প্রচুর। এজন্য এরূপ মৃত্তিকা ছিদ্রযুক্ত ও শুষ্ক। হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে এরূপ মৃত্তিকাকে বলে **ভাবর**। কোন কোন নদীর উপত্যকার এপ্রকার অনুর্বর মৃত্তিকাকে বলে **ভুর**। তারপর রাজস্থানে আছে **বালুকাময় মরু মৃত্তিকা**। এসকল মৃত্তিকাতে চাষের সুযোগ খুব কম। তবে সেচের সাহায্যে ক্রমশঃ চাষ-আবাদের পরিমাণ বাড়িতেছে। **গঙ্গা-যমুনার দোয়াবের মৃত্তিকা উর্বর**। তাহাকে বলে **ভাঙ্গর**। আর উত্তর প্রদেশের উত্তর-পূর্ব অংশের প্রাচীন পলি মৃত্তিকাকে বলে **ভাট মৃত্তিকা**। এখানে প্রচুর আখ জন্মে। প্রাচীন পলি অঞ্চলের বাকী অংশে সেচের সাহায্যে গম, ভুট্টা, আলু প্রভৃতি জন্মে (৭১নং চিত্র)। এই অঞ্চলের নদী-উপত্যকার নিম্ন অংশের কর্দমাক্ত মৃত্তিকাকে বলে **খাদর**। ইহা যথেষ্ট উর্বর।

পঞ্জাব হইতে আসাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সমভূমিতে প্রাচীন পলি দ্বারা গঠিত অঞ্চলের দক্ষিণে আছে **আধুনিক** বা **নতুন পলি** (new alluvium) দ্বারা গঠিত অঞ্চল। **প্রতি বৎসর** বর্ষা কালে বিভিন্ন নদীতে বন্যার সময় এখানে **নূতন পলি** জমে। কাজেই ক্রমাগত চাষ করা সত্ত্বেও এসকল জমি উর্বর। এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম অংশে আছে মোটা দানাযুক্ত বা ছিদ্রযুক্ত বেলেমাটি। এখানে তরমুজ জাতীয় ফলের চাষ হয়। তাহার পর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বদিকে আছে বিস্তীর্ণ **দো-আঁশ মৃত্তিকা** (loam or loamy soil) অঞ্চল। এখানে ধান, গম, কার্পাস, তৈল-বীজ, ডাল, আখ প্রভৃতি জন্মে। আরও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে নিম্নগঙ্গা সমভূমি, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও বদ্বীপ অঞ্চলে আছে কর্দমাক্ত **এঁটেল মাটি** (clay or clayey soil)। এখানে জন্মে ধান ও পাট।

(গ) মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা

মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্য মালভূমির অধিকাংশ অতি প্রাচীন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অংশ। এখনকার **উপরিভাগের মৃত্তিকা** (surface soil) বৃষ্টি-পাত, বায়ু প্রবাহ ও নদী দ্বারা অতি প্রাচীন কাল হইতে অনবরত **অপসৃত** হইতেছে। কাজেই এখানকার মৃত্তিকা **অবশিষ্ট মৃত্তিকার** (residual soil) প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর এসকল ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদান বিভিন্ন নদীর উপত্যকা, বদ্বীপ ও অন্য যে সকল নিম্নভূমিতে সঞ্চিত হয় তথাকার পলি মাটি অপসৃত মৃত্তিকার উদাহরণ। এই মালভূমি অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম অংশে আছে **লাভাজাত কৃষ্ণ মৃত্তিকা** বা **রেগার** (black soil or regur)। মধ্য প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে তাহার পরিমাণ অধিক, গুজরাটের দক্ষিণ ও অন্ধ্র প্রদেশের পশ্চিম অংশে তাহার পরিমাণ কম। এখানে অধিক কার্পাস জন্মে বলিয়া এই মৃত্তিকাকে **কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকাও** (black cotton soil) বলে। তবে এখানে গমও জন্মে প্রচুর। অন্ধ্র প্রদেশ হইতে কেরালা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে আছে **লাল** বা **লোহিত মৃত্তিকা** (red soil)। তাহা দো-আঁশ, কিন্তু অধিক ছিদ্রযুক্ত। সেজন্য কম উর্বর। এখানকার উপত্যকা অঞ্চলের মৃত্তিকা পলিমিশ্রিত। তবে রঙ লালচে। তথায় সেচের সাহায্যে ধান, আখ, তামাক, কার্পাস প্রভৃতি জন্মে। **নীলগিরি অঞ্চলে আছে হিউমাস সারযুক্ত লোহিত মৃত্তিকা**। এখানে এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কফি ও দেশের প্রায় ⅕ অংশ চা জন্মে। এখানকার মৃত্তিকাকে **কফি**

মৃত্তিকাও (coffee soil) বলে। আর পশ্চিমঘাটের পাদদেশ হইতে ছোটনাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে আছে অনুর্বর কাঁকরময় লাল ল্যাটারাইট (laterite) **মৃত্তিকা**। এখানে সামান্য রাগি, বাজরা প্রভৃতি ও পাহাড়ের ঢালে চা জন্মে।

(ঘ) উপকূলের মৃত্তিকা

পূর্ব উপকূলের **ব-দ্বীপসমূহের** ও আশপাশের মৃত্তিকা **দো-আঁশ** এবং অত্যন্ত উর্বর। এসকল স্থানে প্রচুর ধান, তামাক, তৈলবীজ প্রভৃতি জন্মে। পশ্চিম উপকূলে এরূপ পলি মৃত্তিকা কম। বরং উভয় উপকূলের অনেক জায়গার মৃত্তিকা **কাঁকর ও বালুকাযুক্ত** এবং অনুর্বর। স্থানে স্থানে আছে **বালিয়াড়ি**। সমুদ্রের ধারে, বিশেষতঃ জলাভূমিতে আছে **লবণাক্ত কর্দম**। এখানে সোঁদরী, গরান ও গেঁওয়া প্রভৃতি গাছের বন (mangrove vegetation) আছে। আর উপকূলের **লোনা মাটিতে** আছে তাল, সুপারী ও নারিকেল গাছ।

মৃত্তিকার ক্ষয় ও সংরক্ষণ

এদেশের বিভিন্ন অংশের পাহাড়, পর্বত ও **সমভূমির** মৃত্তিকা প্রবল বৃষ্টিপাত, বন্যা প্রভৃতি দ্বারা খুব বেশী **ক্ষয়** (soil erosion) হয়। মরুপ্রায় অংশের মৃত্তিকা ক্ষয় হয় প্রবল বায়ু প্রবাহ দ্বারা। বন অঞ্চলের গাছ নির্বিচারে কাটিবার ফলে মৃত্তিকার অনেক বেশী ক্ষয় হয়। এরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত মৃত্তিকা প্রধানতঃ নদীর জলস্রোত দ্বারা প্রবাহিত হয় এবং নিম্ন অঞ্চলসমূহে পলিরূপে সঞ্চিত হয়। ফলে, যে সকল স্থান আগে নিম্নভূমি ছিল, তাহাদের উপকার হয়। কিন্তু উর্বর জমিতে বালুকা ও কাঁকর সঞ্চিত হইলে তথাকার ক্ষতি হয় অপূরণীয়। এদেশে **মৃত্তিকা সংরক্ষণের** (soil conservation) উদ্দেশ্যে **নিম্নলিখিত ব্যবস্থা** করা হইতেছে। (১) নদী ও বৃষ্টির জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ (control) করিবার উদ্দেশ্যে ঢালু **জমিতে ধাপ** (terrace) তৈরী করা হইতেছে। আর **কন্টুর** (contour) **পদ্ধতিতে জমি চাষের** ব্যবস্থা হইতেছে। (২) উত্তপ্ত বায়ুর প্রবল গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য **বায়ু প্রবাহের পথে উঁচু বাঁধ** তৈরী করা হইতেছে। ইহাদ্বারা বালিয়াড়ির অগ্রগতিও রোধ করা হইতেছে। (৩) স্থানে স্থানে **নূতন বন সৃষ্টি** ও প্রয়োজনমত অন্যান্য ব্যবস্থা হইতেছে।

vi. *সেচ ব্যবস্থা ও তাহার প্রভাব*

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। অথচ এদেশের **বৃষ্টিপাত** অনেক ক্ষেত্রেই **চাষের সাফল্যের পক্ষে** নির্ভরযোগ্য নয়। এজন্য পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের চেয়ে আগে এদেশে **সেচ ব্যবস্থা** প্রচলিত হয়। প্রাচীন **মহেঞ্জোদড়োর** ধ্বংসাবশেষ তাহার প্রমাণ। তারপর খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে কাবেরী **নদীর ব-দ্বীপে বাঁধ দিয়া** ঐ নদীর জলের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ আরও নানা উপায়ে সেচ কার্য (irrigation) হইতেছে।

১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত সেচব্যবস্থা

কূপ

এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে ইঁদারা বা **কাঁচা কূপের** (wells) সাহায্যে সেচ কার্য হইতেছে। ক্রমশঃ **বাঁধান কূপ, নলকূপ** (tube well) প্রভৃতির সাহায্যে আরও

বেশী জমিতে সেচ কার্য চলিতেছে। সেচের উদ্দেশ্যে এদেশে কপিকল (pulley) ও গরু, উট প্রভৃতি পশুর সাহায্যও গ্রহণ করা হইতেছে। স্থানে স্থানে জলচক্র (Persian wheel) পদ্ধতিতেও সেচ কার্য হয়। ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে **বিদ্যুৎশক্তি ও পাম্পের** সাহায্যে গভীর কূপের জল দ্বারা আরও বেশী জমিতে সেচ কার্য হইতেছে। সেচের উদ্দেশ্যে নলকূপের ব্যবহার হয় এদেশের মধ্যে উত্তর প্রদেশে সবচেয়ে বেশী।

জলাশয়

এদেশের বিভিন্ন অংশে অসংখ্য বিল, হ্রদ প্রভৃতি **স্বাভাবিক জলাশয়** এবং ছোট, বড় পুকুর, দীঘি প্রভৃতি **কৃত্রিম জলাশয়** আছে। ইহাদের জলের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থাও বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাটক রাজ্যের **কৃষ্ণরাজা সাগর,** অন্ধ্র প্রদেশের **নাগার্জুন সাগর** প্রভৃতি বৃহৎ
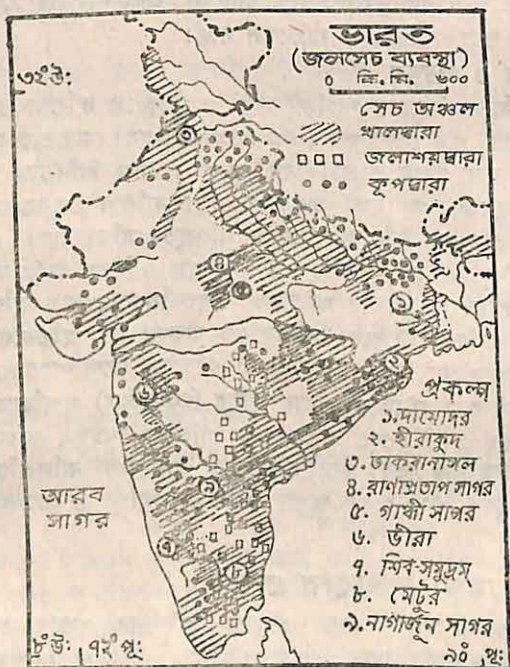
৭২নং চিত্র।

জলাশয়ের (storage tank) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ অঞ্চলের জলাশয়গুলির তলদেশে আছে ছিদ্রহীন এঁটেল মাটি। এজন্য এরূপ জলাশয় জল সঞ্চয়ের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

সেচখাল

বর্ষা কালে বহু নদীতে বন্যা হয়। এজন্য অনেক নদীতে বাঁধ দিয়া বর্ষা কালে জলাধারে জল সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। পরে প্রয়োজন অনুসারে ঐ জল খালের

সাহায্যে চাষের জমিতে নিয়া বহু প্রাচীন কাল হইতে এদেশে সেচ কার্য হইতেছে। এরূপ খালকে বলা হয় **প্লাবন খাল** (Innundation canals)। মধ্য প্রদেশের **রামটেক বাঁধ**, মহারাষ্ট্রের **লোনাভলা বাঁধ**, কর্ণাটকের **কৃষ্ণরাজা বাঁধ**, তামিলনাড়ুর **মেট্টুর বাঁধ** প্রভৃতির সহিত যুক্ত খাল সুপরিচিত। পরবর্তী সময়ে এরূপ কতক পুরাতন বাঁধের পাশে বড় জলাশয় তৈরী করা হইয়াছে। বহু **নূতন বাঁধ** এবং **জলাশয়ও** তৈরী করা হইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে বৎসরের **যে-কোন সময়ে** চাষের জমিতে প্রয়োজনমত **সেচের** ব্যবস্থা হইতেছে। এরূপ খালকে বলে **স্থায়ী** বা **নিত্যবহ** খাল (Perennial canals)। এজাতীয় স্থায়ী খালের মধ্যে পঞ্জাবের **উচ্চ বারিদোয়াব খাল**, **শতদ্রু** (সিরহিন্দ) **খাল**, ঐ রাজ্য ও উত্তর প্রদেশের **পূর্ব ও পশ্চিম যমুনা খাল**, উত্তর প্রদেশের আগ্রা খাল, গঙ্গা খাল, শোণ খাল ও সারদা খাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ ভারতে **গোদাবরী রামপদ সাগর বাঁধ ও জলাশয়ের** সহিত যুক্ত খাল, গোদাবরীর **বদ্বীপ খাল**, **মঞ্জিরার নিজাম সাগর জলাশয়ের** সহিত যুক্ত খাল, কৃষ্ণার **নাগার্জুন সাগরের** সহিত যুক্ত খাল, ঐ নদীর বাকিংহাম ও **বদ্বীপ খাল**, **কাবেরীর বদ্বীপ খাল**, **মেট্টুর বাঁধের সহিত যুক্ত খাল** প্রভৃতি প্রসিদ্ধ (৭২নং চিত্র)। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশের **হিজলি খাল**, **ইডেন খাল** প্রভৃতির সাহায্যে কিছু কিছু সেচ কার্য হইত।

১৯৪৭ খ্রীঃ হইতে পরবর্তী সেচব্যবস্থা

১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় হইতেই এদেশের সকল বিষয়ে উন্নতি বিধানের কাজ আরম্ভ হয়। তখন এদেশে **কৃষি কার্যের অসামান্য গুরুত্বের** কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা হয়। এবং তদনুসারে **প্রথম পঞ্চবার্ষিক** প্রকল্পে (১৯৫১-৫৬) **মোট প্রকল্পের** প্রায় ৩৭% **টাকা সেচ ও কৃষির উন্নতির উদ্দেশ্যে বরাদ্দ** করা হয়। তখন হইতে এই দুই উদ্দেশ্যে টাকার পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে (অবশ্য শতাংশ হিসাবে কম)। এসকল ব্যবস্থার ফলে ১৯৪৭ খ্রীঃ হইতে ১৯৮১-৮২ খ্রীঃ মধ্যে ২০০-এর বেশী বৃহৎ সেচ প্রকল্প (major irrigation scheme), প্রায় ১০০০ মধ্যম (medium) প্রকল্প এবং বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র (minor) প্রকল্পের মাধ্যমে এদেশে সেচের কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে। আগেকার কতক সেচ ব্যবস্থার সংস্কার এবং উন্নতি বিধানও এই ব্যবস্থার অন্তর্গত। ১৯৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত এসকল প্রকল্পের মধ্যে প্রায় ৩০টি বৃহৎ প্রকল্প ও প্রায় ৫০০টি মধ্যম প্রকল্পের কাজ শেষ হইয়াছে। আরও কতক প্রকল্পের সাহায্যে আংশিক সেচ কার্য হইতেছে। ফলে, ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে সেচের সাহায্যে চাষের জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ২·৩ কোটি হেক্টর (এক হেক্টর=১০,০০০ বর্গ মিটার)। তখন হইতে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ সম্ভবতঃ ৬·৩ কোটি হেঃ জমিতে অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ তুলনায় প্রায় তিন গুণ জমিতে সেচ কার্য হইয়াছে। এখন এদেশের মোট চাষের জমির পরিমাণ প্রায় ১৭·৫ কোটি হেক্টর। তাহার প্রায় ৪০% **জমিতে উপরিলিখিত ভাবে সেচ কার্য** হয়। এসকল বিষয়ে উন্নতি বিধানের জন্য **কেন্দ্রীয় সংস্থা** (Central Board of Irrigation and Power) নূতন দিল্লীতে অবস্থিত।

বর্তমানে এদেশের সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে **বহুমুখী নদী উপত্যকা প্রকল্পের** (Multipurpose river valley projects) **গুরুত্ব** সবচেয়ে বেশী। এই সকল প্রকল্পের

উদ্দেশ্য অনেক। যেমন, (১) নদীতে বাঁধ দিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ (flood control)। (২) তাহার পাশে বৃহৎ জলাশয় তৈরী করিয়া তথায় জল সঞ্চয় করিয়া রাখার ব্যবস্থা। (৩) ঐ জল নির্দিষ্ট পথে প্রবল বেগে প্রবাহিত করাইয়া বা কৃত্রিম জল-প্রপাতের সৃষ্টি করিয়া তাহার সাহায্যে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন। (৪) পরে খালের মধ্য দিয়া ঐ জল চাষের জমিতে নিয়া চাষের কাজে সাহায্য করা। (৫) জলাশয়ে ও খালে মাছের চাষ। (৬) খালের মধ্য দিয়া যাতায়াত ও পরিবহনের কাজে সাহায্য করা। (৭) জলজ বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে শিল্পের উন্নতি বিধান। এরূপ কয়েকটি প্রধান প্রকল্পের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল।

(ক) গঙ্গা ও ইহার উপনদীসমূহের সহিত যুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প

দামোদর উপত্যকা প্রকল্প (D.V.C.)

গঙ্গার অন্যতম প্রধান শাখানদী ভাগীরথী। ইহার এক উপনদী **দামোদর**। ইহার প্রবল বন্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অপূরণীয় ক্ষতি হইত। ইহার প্রতিকার এবং এই রাজ্য সহ আশপাশের নানা ভাবে উন্নতির উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ খ্রীঃ হইতে দামোদর প্রকল্প অনুসারে কাজ হইতেছে (৭৩নং চিত্র)। তদনুসারে দামোদরের ও ইহার বিভিন্ন উপনদীর উপর ছোটনাগপুরের প্রায় মধ্য ভাগ হইতে পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত কয়েকটি বাঁধ তৈরী হইয়াছে। যেমন, ইহার উপনদী বরাকরের উপর তৈরী হইয়াছে (প্রায় ৩৭০ মিঃ দীর্ঘ) **তিলাইয়া বাঁধ** ও (প্রায় ৩৬০০ মিঃ দীর্ঘ) **মাইথন বাঁধ**। দামোদরের অপর উপনদী কোনারের উপর তৈরী হইয়াছে (প্রায় ৩৯২০ মিঃ দীর্ঘ) **কোনার বাঁধ**। তাহাছাড়া মূল নদী দামোদরের উপর তৈরী হইয়াছে **পাঞ্চেত বাঁধ ও তেনুঘাট বাঁধ**। বর্ধমান জেলার **দুর্গাপুরের** নিকট তৈরী হইয়াছে দীর্ঘ (প্রায় ৬৭২ মিঃ দীর্ঘ) **ব্যারেজ বা সেচ বাঁধ**। এই প্রকল্প অনুসারে বর্ধমান হইতে হাওড়া জেলা পর্যন্ত প্রায় ৫·২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইবে। এখনই তাহার প্রায় ৮০% জমিতে সেচ কার্য হইতেছে।

ময়ূরাক্ষী প্রকল্প

ভাগীরথীর এক উপনদী ময়ূরাক্ষী। বিহারের **মেসাঞ্জোরে** ময়ূরাক্ষী নদীর উপর তৈরী হইয়াছে (প্রায় ৬৪০ মিঃ দীর্ঘ) **ক্যানাডা বাঁধ**। ইহা সেদেশের সহায়তায় তৈরী হইয়াছে। তাহাছাড়া বীরভূম জেলার সিউড়ির পাশে তৈরী হইয়াছে **তিলপাড়া ব্যারেজ**। এই প্রকল্প অনুসারে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে প্রায় ২·৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইতেছে।

কংসাবতী প্রকল্প

ভাগীরথীর এক উপনদী হলদি। হলদির উপনদী কংসাবতী বা কাঁসাই। এই (কাঁসাই) নদী ও ইহার উপনদী কুমারী নদীতে বাঁধ দিয়া পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলাতে প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে। শিলাবতী, ভৈরোবাঁকী ও তেরাফেণী নদীর উপর ব্যারেজ তৈরী করিয়া ব্যারেজের উপর দিয়া কংসাবতী প্রকল্পের সেচ খাল বিস্তৃত করা হইবে। কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রকল্প অনুসারে এখনই এক লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইতেছে।

ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প

ইহা সেচ প্রকল্প নহে। গঙ্গা নদীর উপর মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কাতে পৃথিবীর দীর্ঘতম (প্রায় ২২৪০ মিঃ দীর্ঘ) ব্যারেজ তৈরী হইয়াছে। আর ভাগীরথীর উপর জঙ্গীপুরে তৈরী হইয়াছে একটি ছোট ব্যারেজ। এই দুই ব্যারেজের মধ্যে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে প্রায় ৪০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ খাল (feeder canal) তৈরী হইয়াছে। তাহাছাড়া ফরাক্কা ব্যারেজের উপর দিয়া ইস্টার্ন রেলওয়ে, ৩৪নং জাতীয় সড়ক প্রভৃতি তৈরী হইয়াছে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভাগীরথীর মধ্য দিয়া নৌপথে যাতায়াত ও পরিবহনের সুযোগ বৃদ্ধি এবং কলিকাতা বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের উন্নতি সাধন। এখন পর্যন্ত সেই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

৭৩নং চিত্র।

তেহরী বাঁধ প্রকল্প

হিমালয় অঞ্চলে গোমুখ বা গোমুখী হইতে গঙ্গার যে উপনদীটি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার নাম ভাগীরথী। তেহরি বাঁধ প্রকল্প অনুসারে এই নদীর উপর বাঁধ তৈরী হইয়াছে। তথা হইতে কাটা খালের সাহায্যে উত্তর প্রদেশে প্রায় ৬·৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে।

কোশী প্রকল্প

কোশী গঙ্গার একটি উপনদী। এই নদীর উপর বিহার ও নেপালের সীমাতে হনুমান নগরে ব্যারেজ তৈরী হইয়াছে। এই ব্যারেজ ও ইহার সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে বিহারে প্রায় ৪·৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইতেছে। এই নদীর সেচ ব্যবস্থা দ্বারা নেপালও উপকৃত হইতেছে। ভবিষ্যতে ভারতে ৮·৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইবে।

মধ্য গঙ্গা খাল প্রকল্প

এই প্রকল্প অনুসারে গঙ্গার মধ্য অংশে এই নদীর উপর বাঁধ তৈরী করিয়া উত্তর প্রদেশে প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে।

গণ্ডক প্রকল্প

গঙ্গার এক উপনদী গন্ডক। এই নদীর উপর বিহার, উত্তর প্রদেশ ও নেপালের সীমাতে বাল্মীকি নগরে (প্রায় ৭৪০ মিঃ দীর্ঘ) ব্যারেজ তৈরী হইয়াছে। ইহার সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে বিহার ও উত্তর প্রদেশে প্রায় ১৪·৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে। এখন প্রায় ১১·৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হয়। এই প্রকল্প অনুসারে সেচের ব্যবস্থা দ্বারা নেপালও উপকৃত হইতেছে।

সারদা সহায়ক প্রকল্প

সারদা, ঘাঘরা, গোমতী প্রভৃতি গঙ্গার উপনদী। সারদা সহায়ক প্রকল্প অনুসারে পর্যায়ক্রমে **সারদা** ও **ঘাঘরা** নদীর উপর ব্যারেজ এবং **গোমতী** ও **সাই** নদীর উপর বাঁধ তৈরীর ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাছাড়া ২৫০০ কিমির অধিক নূতন খাল তৈরী ও প্রায় ৬৫০০ কিঃ মিঃ পুরাতন খালের সংস্কারের ব্যবস্থা হইতেছে। এই প্রকল্পের সাহায্যে **উত্তর প্রদেশে** প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে। এখন প্রায় ১৪ই লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইতেছে।

ঘাঘরা প্রকল্প

এই প্রকল্প অনুসারে ঘাঘরা নদীকে সরযূর সহিত খাল দ্বারা যুক্ত করিয়া উত্তর প্রদেশে প্রায় ১৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে।

রামগঙ্গা প্রকল্প

গঙ্গার এক উপনদী রামগঙ্গা। এই নদীর উপর প্রায় ৬২৫ মিঃ দীর্ঘ বাঁধ তৈরী করিয়া **উত্তর প্রদেশে** প্রায় ৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইতেছে।

চম্বল প্রকল্প

গঙ্গার সর্বপ্রধান উপনদী যমুনা। ইহার এক উপনদী চম্বল। এই নদীর উপর **গান্ধী সাগর বাঁধ, রাণা প্রতাপ সাগর বাঁধ** ও **জওহর সাগর বাঁধ** এবং **কোটা ব্যারেজ** প্রভৃতি তৈরী হইয়াছে। ইহাদের সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে প্রচুর জলজ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। তাহাছাড়া **মধ্য প্রদেশ** ও **রাজস্থানে** প্রায় ৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইতেছে। এই প্রকল্প অনুসারে ভবিষ্যতে আরও বেশী জমিতে সেচ কার্য হইবে।

শোণ প্রকল্প

গঙ্গার এক উপনদী শোণ। শোণ ব্যারেজ প্রকল্পের উন্নতি বিধান করিয়া বিহারে প্রায় ১·৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে।

(খ) সিন্ধু ও ইহার উপনদীসমূহের সহিত যুক্ত প্রকল্পসমূহ

ভাকরা-নাঙ্গল প্রকল্প

শতদ্রু (Sutlej) সিন্ধুর একটি উপনদী। এই নদীর সহিত যুক্ত ভাকরা-নাঙ্গল প্রকল্প এদেশের **বৃহত্তম নদী প্রকল্প**। এই নদীর উপর পঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের সীমাতে **ভাকরাতে** যে বাঁধ তৈরী হইয়াছে তাহা **পৃথিবীর উচ্চতম** বাঁধ-গুলির মধ্যে অন্যতম (প্রায় ২২৬ মিঃ উচ্চ ও ৫১৮ মিঃ দীর্ঘ)। তাহার পাশে **গোবিন্দ সাগর** নামে বৃহৎ জলাশয় ও দক্ষিণে **নাঙ্গল বাঁধ** তৈরী হইয়াছে। ইহাদের সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে **পঞ্জাব, হরিয়ানা** ও **রাজস্থানে** ১৪ই লক্ষ হেক্টরের অধিক জমিতে সেচ কার্য হইতেছে। ভবিষ্যতে ইহার দ্বিগুণ জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইবে।

বিপাসা প্রকল্প

সিন্ধুর আর এক উপনদী বিপাসা (Beas)। এই নদীর উপর **পঙ্গ** নামক স্থানে বাঁধ দিয়া বিভিন্ন খালের সাহায্যে পঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে রাজস্থান ক্যানেল **দীর্ঘতম**।

রাজস্থান ক্যানেল প্রকল্প

এই প্রকল্প অনুসারে **বিপাশা (পঙ্গ) প্রকল্পের** সহিত যোগ সাধন করিয়া **পৃথিবীর দীর্ঘতম সেচখাল** তৈরী হইতেছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় ৪৪০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ প্রধান খাল (main canal), ২০০ কিঃ মিঃ-র অধিক সংযোগ খাল (feeder canal) ও ৩৫০০ কিঃ মিঃ-র অধিক সরবরাহ (distribution) খাল। এই ব্যবস্থা দ্বারা রাজস্থানের **থর মরুভূমির** প্রায় ১২½ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে। এখন তাহার অর্ধেকের বেশী জমিতে সেচ কার্য হইতেছে। এদেশের মরু অঞ্চলের উন্নতি সম্পর্কে এই প্রকল্পের গুরুত্ব অসামান্য।

তাওয়া প্রকল্প

তাওয়া নর্মদার একটি উপনদী। এই নদীতে প্রায় ১৬৩০ মিঃ দীর্ঘ বাঁধ দিয়া মধ্য প্রদেশে প্রায় ২১·৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইতেছে। ভবিষ্যতে প্রায় ৩·৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইবে।

তাপী প্রকল্প

তাপী নদীর উপর **গুজরাটের কাকরাপাড়াতে** বাঁধ দিয়া প্রায় ২·৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইতেছে। তাহাছাড়া এই নদীর উপর উকাইতে ৪৯০০ মিঃ-র অধিক দীর্ঘ বাঁধ দিয়া প্রায় ১·৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইতেছে।

মাহী প্রকল্প

মাহী নদীর উপর **গুজরাটের ওয়ানাকবরিতে** প্রায় ৮০০ মিঃ দীর্ঘ এবং কাদানাতে প্রায় ১৪৩০ মিঃ দীর্ঘ বাঁধ দিয়া ২·৭ লক্ষ হেক্টরের অধিক জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে।

কৃষ্ণা প্রকল্প

কৃষ্ণা নদীর উপর **অন্ধ্র প্রদেশের নন্দীকোণ্ডাতে** বাঁধ দিয়া **নাগার্জুন সাগর প্রকল্প** অনুসারে প্রায় ৬·৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইতেছে। ভবিষ্যতে প্রায় ৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইবে। কৃষ্ণার উপনদী তুঙ্গভদ্রার উপর **তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প** অনুসারে ২৪৪০ মিঃ-র অধিক দীর্ঘ বাঁধ তৈরী করিয়া **অন্ধ্র প্রদেশ** ও **কর্ণাটকে** প্রায় ৩·২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইতেছে। কৃষ্ণার উপনদী **ভদ্রার** উপর বাঁধ তৈরী করিয়া প্রায় এক লক্ষ হেঃ জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে। **উচ্চ** বা **আপার কৃষ্ণা প্রকল্প** অনুসারে কৃষ্ণার উপর **নারায়ণপুরে** ও **আলমাট্টিতে** বাঁধ দিয়া প্রায় ৪·২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে। কৃষ্ণার উপনদী **ঘাটপ্রভার** উপর **ঘাটপ্রভা প্রকল্প** অনুসারে হিডকালে প্রায় ৫২৭৫ মিঃ দীর্ঘ বাঁধ ও ধুপডালে প্রায় ২০৮৫ মিঃ দীর্ঘ বাঁধ তৈরী করিয়া প্রায় ৩·২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে। আর কৃষ্ণার উপনদী মালপ্রভার উপর **মালপ্রভা প্রকল্প** অনুসারে বাঁধ দিয়া প্রায় ২·১ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে। এখন এই সকল ক্ষেত্রে তাহার তুলনায় অর্ধেক জমিতে সেচ কার্য হইতেছে। কৃষ্ণার **শ্রীশৈলম্** ও **সঙ্গমেশ্বরম্** প্রকল্প অনুসারেও সেচ কার্য হইতেছে। তাহাছাড়া কৃষ্ণার উপর উজ্জয়িনীর নিকট প্রায় ২৪৬৭ মিঃ দীর্ঘ বাঁধ তৈরীর কাজ প্রায় সমাপ্ত। কৃষ্ণার উপনদী ভীমার উপরও ১৩০০ মিঃ-র অধিক দীর্ঘ বাঁধ তৈরী হইয়াছে।

এসকল বাঁধের সাহায্যে প্রায় ২·৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইবে। ঢোম, কানহার প্রভৃতি প্রকল্প অনুসারেও কৃষ্ণা নদীর সাহায্যে যথেষ্ট সেচ কার্য হইতেছে।

গোদাবরী প্রকল্প

গোদাবরী নদীর উপর **পোচাম্পদ** প্রকল্প অনুসারে বাঁধ দিয়া **অন্ধ্র প্রদেশে** প্রায় ১·৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইতেছে। ভবিষ্যতে প্রায় ২·২ লক্ষ হেঃ জমিতে সেচ কার্য হইবে। তাহাছাড়া এই নদীতে **জয়াকোয়াদি প্রকল্প** অনুসারে বাঁধ দিয়া **মহারাষ্ট্রে** প্রায় ২·৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে। গোদাবরীর উপনদী **পেনগঙ্গার প্রকল্প** অনুসারে প্রায় ১·১ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে। **কুকাদি** প্রকল্প অনুসারেও **মহারাষ্ট্রে** প্রায় ১·৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে।

হাসদেও বাঙ্গো প্রকল্প—মধ্য প্রদেশে হাসদেও নদীর উপর বাঁধ দিয়া প্রায় ৩·৩ লক্ষ হেঃ জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে।

মহানদী প্রকল্প

মহানদীর উপর **পৃথিবীর দীর্ঘতম** বাঁধ (৪৮০১ মিঃ দীর্ঘ) তৈরী হইয়াছে। ইহার নাম **হীরাকুদ বাঁধ**। এই বাঁধের সাহায্যে **উড়িষ্যাতে** প্রায় ২·৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইতেছে। তাহাছাড়া এই নদীর **বদ্বীপে বাঁধ** দিয়া আরও প্রায় ৫·৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইতেছে। **মধ্য প্রদেশে** এই নদীর উপর **রবিশঙ্কর সাগর প্রকল্প** অনুসারে এবং ইহার উপনদীর উপর **সান্দুর প্রকল্প** অনুসারে বাঁধ তৈরী করিয়া তাহাদের সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে প্রায় ৩·৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে।

অন্যান্য প্রকল্প

সবরমতী, পানাম প্রভৃতি নদীর উপর পৃথক্ পৃথক্ প্রকল্প অনুসারে বাঁধ তৈরী করিয়া গুজরাটে প্রায় ১·৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য হইতেছে।

পরাম্বিকুলম্ আলিয়ার প্রকল্প অনুসারে ৮টি ছোট নদীর সাহায্যে **তামিলনাড়ুতে ও কেরালাতে** প্রায় ১·১ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে। **পেরিয়ার-ভাইগাই** প্রকল্প অনুসারেও **তামিলনাড়ুতে** সেচের ব্যবস্থা হইতেছে।

জাতীয় নদী উন্নয়ন সংস্থা

এদেশের বিভিন্ন নদীর সাহায্যে দেশের সেচকার্য সম্পর্কে উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে এই সংস্থা গঠিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য—(১) নদীসমূহের গতিপথের সংস্কার, (২) উহাদের জলস্রোতের সাহায্যে আশপাশে সেচ কার্য এবং (৩) নদীর জল স্থানান্তরিত করিয়া খরাক্লিষ্ট অঞ্চলে প্রয়োজন মত সেচের ব্যবস্থা।

vii. ভূমির ব্যবহার ও প্রধান কৃষিজ সম্পদ
(Land utilisation and major agricultural crops)

ভারত কৃষি প্রধান দেশ

পৃথিবীতে ভারত সহ বহু দেশ কৃষিপ্রধান। তাহাদের মধ্যে এদেশে **কৃষি কার্য ও কৃষিজ সম্পদের মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম**। এদেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু, ভূমির ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কে পার্থক্য খুব বেশী। ইহাদের স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায় এদেশের বিভিন্ন অংশের কৃষিজ সম্পদ সম্বন্ধে।

এদেশের ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা ও জলবায়ুর বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। **ভূমির ব্যবহার** সম্বন্ধে দেখা যায়, এদেশের **অর্ধেকের কিছু বেশী** জমিতে **চাষ-আবাদ** হয়। তন্মধ্যে মাত্র প্রায় ১/৬ অংশ জমিতে প্রতি বৎসর **দুই** বা **তিন বার ফসল** জন্মে। এদেশে অনাবাদী জমি ও ভবিষ্যতে চাষের কাজে ব্যবহার করা **সম্ভব** এমন জমির পরিমাণও নিতান্ত কম। সুতরাং যদিও এদেশের মোট **চাষের জমি পৃথিবীতে** তৃতীয় অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের পরে, তবু এদেশে ঐ দুই দেশের মত **চাষের জমি** খুব বেশী বাড়াইবার **সুযোগ নাই**। কাজেই অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য এদেশে **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চাষের ব্যবস্থা** করা **অবশ্য কর্তব্য**। বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্যেই ১৯৪৭ খ্রীঃ-এর পর হইতে এদেশে **কৃষি বিপ্লব** বা **সবুজ বিপ্লব**, কোথাও কোথাও **গম বিপ্লব** ইত্যাদির ব্যবস্থা হইতেছে। আর এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগার (Indian Agricultural Research Institute) নূতন দিল্লীতে **স্থাপিত** হইয়াছে।

ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ এলাকায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া **ভূমির অবস্থা** ও **ব্যবহার** লক্ষ্য করিবে। তাহারা দেখিবে কত জমি ডাঙ্গা, কত জমি জলা, কত জমি অনাবাদী, কত জমিতে পশু পালন হয়, কত জমিতে চাষ হয়, কত জমিতে চাষের সাহায্যের জন্য সেচ দরকার হয়, কত জমি দোফসলী ইত্যাদি। আরও দেখিবে কোথায় মাটি এঁটেল, কোথায় মাটি দো-আঁশ, কোথায় মাটি বেলে, কোথায় মাটি কাঁকুরে ইত্যাদি। কোন্ প্রকার জমিতে ও কত পরিমাণ জমিতে কোন্ ফসল জন্মে, তাহাদের কোন্‌টির জন্য কি পরিমাণ সার ও সেচের ব্যবস্থা হয়। তারপর কোন্ অঞ্চলে কত জমিতে কোন্ ফসল জন্মে, তাহার উৎপাদনের পরিমাণ কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ও লক্ষ্য করিবে। এসকল বিষয়ে অভিজ্ঞতার ফলে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে ধান, পাট প্রভৃতি **উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলের** ফসল (humid crops) ও রাগি, জোয়ার, বাজরা **শুষ্ক উষ্ণ অঞ্চলের** ফসল। তাহাছাড়া তাহারা জানিবে যে গম, কার্পাস প্রভৃতি **নাতি-শীতোষ্ণ অঞ্চলের** ফসল। এগুলি সেচের সাহায্যে জন্মে বা সেচ-কৃষি (irrigated crops)। তাহারা আরও জানিবে চাষের **সময়** হিসাবে ধান, ভুট্টা প্রভৃতি **খারিফ ফসল** অর্থাৎ হেমন্ত কালে এসকল ফসল সংগ্রহ করা হয়। গম, যব, ডাল, তৈল-বীজ প্রভৃতি **রবি শস্য** অর্থাৎ এগুলি শীত কালে জন্মে। আরও জানিবে ব্যবহার হিসাবে ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি **খাদ্য শস্য,** কার্পাস, পাট, তামাক, চা প্রভৃতি শিল্পের উপাদান বা **বাণিজ্যিক ফসল**।

এদেশের কয়েকটি প্রধান ফসল

(ক) *খাদ্য দ্রব্য*

ভারতে ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ ৯·৭৩ কোটি হেক্টর জমিতে খাদ্য দ্রব্যের চাষ হইয়াছিল এবং ৫·১ কোটি টন খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন (১৯৮২-৮৩ খ্রীঃ) এদেশে ঐ সময়ের তুলনায় প্রায় ১/৩ অংশ অধিক জমিতে অর্থাৎ প্রায় ১২·৩ কোটি হেক্টর জমিতে খাদ্য দ্রব্যের চাষ হয়। তবে **কৃষি বিপ্লবের** বা **কৃষি সম্পর্কে নানাপ্রকার উন্নতির ফলে** এখন (১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ) এদেশে খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ ঐ সময়ের প্রায় ৩ গুণ অর্থাৎ মোট প্রায় ১৫·১৫ কোটি টন। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ৭·৮ কোটি হেঃ জমিতে খাদ্য শস্যের (cereals) চাষ হয় এবং প্রায় ৪·২ কোটি টন খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়। অপর দিকে ১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ

এদেশে প্রায় ১০·৭ কোটি হেঃ জমিতে খাদ্য শস্যের চাষ হয় ও প্রায় ১৩·৯ কোটি টন খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ এই কয় বৎসরে জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে প্রায় ১/৩ গুণ, কিন্তু ফসলের উৎপাদন বাড়িয়াছে ২·৩ গুণ।

(১) ধান

ইহা এদেশের **সর্বপ্রধান খাদ্যশস্য** (cereal) ও **সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষিজ সম্পদ্**। ইহা-দ্বারা ভাত, খই, চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, শ্বেতসার (starch) প্রভৃতি তৈরী হয়। ধানের খোসা, খড় বা বিচালি প্রভৃতিও নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। এদেশের যত জমিতে (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) মোট খাদ্য শস্যের চাষ হয়, তাহার প্রায় ৩৮% জমিতে ধান জন্মে। আর চালও উৎপন্ন হইয়াছে এদেশের মোট খাদ্যশস্যের প্রায় ৩৮%।

৭৪নং চিত্র।

বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনের হার ক্রমশঃ বাড়াইবার জন্য এদেশে চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে, উৎকৃষ্ট বীজ (high yielding variety of seeds) ব্যবহার করা হইতেছে। জমিতে সার দেওয়া হইতেছে ও কীট, পোকা প্রভৃতির উৎপাত হইতে ফসলকে রক্ষা করা হইতেছে। প্রয়োজনমত আরও নানা ধরনের ব্যবস্থা হইতেছে। ইহার ফলে উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহাই **কৃষি বিপ্লব** নামে পরিচিত।

এদেশে ধানের চাষ সম্পর্কে আরও জানা যায় যে ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ ৩ কোটি হেঃ-র অধিক জমিতে চাষ হয় এবং ২ কোটি টনের অধিক চাল উৎপন্ন হয়। আর ১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ এদেশে ৪ কোটি হেঃ-র অধিক জমিতে ধানের চাষ হয় এবং ৬ কোটি টন চাল উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে এই কয় বৎসরে ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ তুলনায় এদেশে ধান চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে প্রায় ৩৩%, অথচ চাল উৎপন্ন হইয়াছে প্রায় ৩ গুণ। এখন ধান উৎপাদনের পরিমাণ সম্বন্ধে ভারতের স্থান পৃথিবীতে **দ্বিতীয়**। একমাত্র চীন দেশে ধান, চালের উৎপাদনের পরিমাণ ভারতের চেয়ে বেশী। আমাদের দেশে ধান উৎপাদন (৭৪নং চিত্র) বৃদ্ধির ফলে এখন (১৯৭৯ হইতে) কিছু চাউল **রপ্তানিও** করা হইতেছে।

ভারতের প্রায় ৯৯% **ধান নিম্নভূমিতে উর্বর দো-আঁশ ও এঁটেল পলি মাটিতে** জন্মে (low land rice)। আর মাত্র ১% ধান জন্মে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে (in terraces) ও উপত্যকাতে (upland or hill rice)। ধান উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলের ফসল। এদেশে ইহার চাষের জন্য ২৪-২৭° সেঃ **উষ্ণতা** ও ১০০-২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টি প্রয়োজন। প্রধানতঃ অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে বৃষ্টি কিছু কম বলিয়া সেচের সাহায্যে ধান চাষ হয়। এদেশে **তিন রকম ধান** জন্মে। (i) তন্মধ্যে বেশীর

ভাগ **আমন ধান**। আষাঢ় মাসে নিয়মিত বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কতক জমিতে (nursery) উৎকৃষ্ট বীজ ধান বপন করা হয়। এদিকে অন্যান্য জমি চাষ করিয়া রাখা হয়। তারপর **চারাগুলি** একটু বড় হইলে তাহাদিগকে তুলিয়া অন্য জমিতে বিভিন্ন সারিতে যথেষ্ট ফাঁক দিয়া **রোপণ** করা হয়। ইহাই ধান চাষের **রোপণ** (transplantation) **পদ্ধতি** নামে পরিচিত। কতক জমিতে এসময় আগেকার ফসল অর্থাৎ আউস ধান কাটিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমন ধানের চারা রোপণ করা হয়। আমন ধান কাটা হয় হেমন্ত কালে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে। এজন্য এই জাতীয় ধানকে **আঘনী ধান** বলে। ইহাকে কর্ণাটকে **কার্তিকী** বা হৈমন্তিক ফসল বলে। আসামে ইহাকে বলে **বাও** বা **শালি ধান**। (ii) এদেশের দ্বিতীয় প্রকার ধানকে বলে **আশু** বা **আউস ধান**। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বৎসরের প্রথম বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কতক জমি চাষ করিয়া জমিতে আউস ধানের **বীজ বপন** করা হয়। **অর্থাৎ** এরূপ ধানের বীজ জমিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহাকে বলে ধান চাষের **বপন** (broadcast) **পদ্ধতি**। তামিলনাড়ুতে এক একটি **বীজ পুতিয়া** দেওয়া (drilling) হয়। আউস ধানের ফসল কাটা হয় ভাদ্র মাসে। সেজন্য ইহাকে বলে **ভাদই** ফসল, আসামে ইহাকে **আহু** বলে। ইহা তাড়াতাড়ি জন্মে বলিয়াই ইহাকে আশু বা আউস ধান বলে। (iii) এদেশের তৃতীয় প্রকার ধান হইল **বোরো ধান**। শীত কালের প্রারম্ভে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে কতক **নীচু জমিতে** অল্প জল জমিয়া থাকা অবস্থায় বোরো ধানের **বীজ বপন** করা হয়। এই ফসল কাটা হয় গ্রীষ্ম কালে। বোরো ধান চাষের জন্য উৎকৃষ্ট ধানের বীজ অর্থাৎ তাইচুং, তাইনান, ইরি ইত্যাদি বীজ ব্যবহার করা হয়। আর প্রচুর সেচেরও ব্যবস্থা করা হয়। ফলে, এখন এদেশে বোরো ধানের **উৎপাদনের হার খুব বেশী**। এজন্য ইহার চাষের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

এদেশের অধিকাংশ স্থানে ধান চাষ হয়। কেবল পার্বত্য ও মালভূমি অঞ্চল এবং সমভূমির মধ্যে রাজস্থানের মরুপ্রায় অঞ্চল, কচ্ছের রন প্রভৃতি স্থানে ধান চাষ করা সম্ভব হয় না। ধান উৎপাদন সম্পর্কে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে **পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম,** অন্ধ্র প্রদেশের স্থান দ্বিতীয়, বিহারের স্থান তৃতীয়।

(২) গম

ইহা উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রথম ও সমগ্র **দেশের দ্বিতীয় খাদ্য শস্য**। গমের গুঁড়া অর্থাৎ আটা, ময়দা, সুজি দ্বারা রুটি, পাওরুটি, বিস্কুট, কেক, শ্বেতসার, গ্লুকোজ, আঠা প্রভৃতি তৈরী হয়। গমের খড়ও নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। এদেশের যত জমিতে খাদ্য শস্যের চাষ হয় (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ), তাহার প্রায় ২৩% জমিতে গম জন্মে। অথচ কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির বা **গম বিপ্লবের** ফলে ঐ বৎসর (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশে গম উৎপন্ন হইয়াছে মোট খাদ্য শস্যের ৩২%। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ৯৭·৫ লক্ষ হেঃ জমিতে গমের চাষ হয় এবং প্রায় ৬৪·৬ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয়। আর ১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ২·৪৪ কোটি হেঃ জমিতে গমের চাষ হয় এবং প্রায় ৪·৫২ কোটি টন গম উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ তুলনায় এই কয় বৎসরে গমের চাষের জমি বাড়িয়াছে প্রায় ১½ গুণ। অথচ এদেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গম চাষের ফলে অর্থাৎ ইহার চাষের জন্য উৎকৃষ্ট বীজ, সার, সেচ প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ তুলনায়

১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ গম উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়াছে ৬ গুণের বেশী। এরূপ ব্যবস্থাই **গম বিপ্লব** নামে পরিচিত। গম চাষ সম্পর্কে এদেশের **কেন্দ্রীয় গবেষণাগার** দিল্লীতে অবস্থিত। এখন গম উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে চতুর্থ, অর্থাৎ সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরে (৭৫নং চিত্র)।

এদেশে উর্বর **দো-আঁশ** বা হাল্কা **এ'টেল** মাটিতে ও **লাভাজাত কৃষ্ণ মৃত্তিকাতে** গম জন্মে। ইহা প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল ও **শীত কালে জন্মে।** ইহার জন্য ১২-১৮° **সেঃ উষ্ণতা** ও ৬০-১০০ **সেঃ মিঃ বৃষ্টি** প্রয়োজন। তবে গম চাষের বিভিন্ন অবস্থায় জলবায়ু সম্পর্কে যথেষ্ট পার্থক্য গমের উত্তম ফলনের জন্য আবশ্যক। যেমন, গমের চারা অবস্থায় প্রয়োজন আর্দ্র শীতল আবহাওয়া। তারপর শীষ বাহির হওয়ার সময় দরকার শুষ্ক ও উষ্ণ অবস্থা। পরে গমের পুষ্টির জন্য দরকার কিছু বৃষ্টি। সকলের শেষে গম পাকিবার জন্য দরকার উজ্জ্বল সূর্যকিরণ ও প্রচুর উষ্ণতা এদেশের অর্ধেক গম **সেচের সাহায্যে** জন্মে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে **সেচের ব্যবস্থা** করিলে ফসল ভাল হয়। শীত কালে গমের চাষ হয় ও গ্রীষ্ম কালে ফসল কাটা হয়। **হরিয়ানা, পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের** মৃত্তিকা, সেচ ব্যবস্থা, জলবায়ু প্রভৃতি গম চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এই তিন রাজ্যে **এদেশের ৭৫% গম জন্মে।** তন্মধ্যে **উত্তর প্রদেশের স্থান প্রথম,** পঞ্জাবের স্থান দ্বিতীয়। এক বার গম চাষের পর জমিতে প্রচুর সার না দিলে তথায় দ্বিতীয় বার গমের ফলন ভাল হয় না। এজন্য গম চাষের এই অঞ্চলে দুই বার গম চাষের মাঝখানে কার্পাস বা আখের চাষ হয়। আর মধ্য প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে দুই বার গম চাষের মাঝখানের ঐ সময়ে তৈলবীজের অর্থাৎ চীনাবাদাম বা তিসির চাষ হয়। ঐ সময়ে প্রচুর সারও দেওয়া হয়। মহারাষ্ট্রে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। **পশ্চিমবঙ্গের** পশ্চিমদিকের কতক অংশ সহ ভারতের যেখানেই গমের চাষ করা সম্ভব, সেখানেই গমের চাষ বাড়িতেছে। তবে দেশের দক্ষিণ ও পূর্বদিকের উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলে বেশী গম চাষ সম্ভবপর নয়।
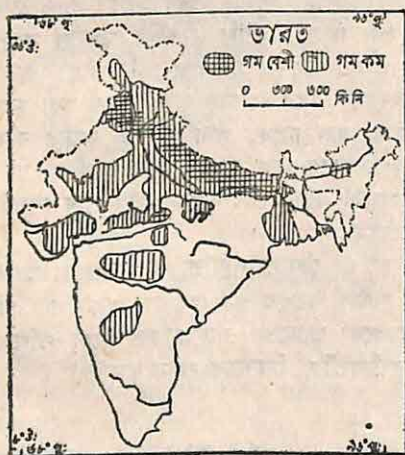
৭৫নং চিত্র।

(৩) জোয়ার, বাজরা, রাগি (Millets)

এগুলি **নিকৃষ্ট খাদ্য শস্য** এবং **শুষ্ক ও মরুপ্রায় অঞ্চলে** অধিক জন্মে। ইহাদের গুঁড়া সাধারণতঃ তথাকার গরীব লোকের খাদ্য। তবে অধিক খরা ও দুর্ভিক্ষের সময় অন্য স্থানেও ইহাদের চাহিদা বাড়ে। ধান ও গম চাষের জমির তুলনায় নিকৃষ্ট জমিতে ইহাদের চাষ হয়। ইহাদের জন্য প্রায় **ধান চাষের মত** (২৪-২৭° সেঃ) **উষ্ণতা,** কিন্তু **অনেক কম** (৫০ সেঃ মিঃ) **বৃষ্টি** প্রয়োজন। ইহাদের জন্য সেচের

দরকার প্রায় হয় না। ইহাদের উৎপাদনের হারও খুব কম। রাজস্থান হইতে দাক্ষিণাত্য মালভূমির মধ্য ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ইহাদের চাষ হয়। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ২·৫ কোটি হেঃ জমিতে ইহাদের চাষ হয় এবং প্রায় ৮০ লক্ষ টন ফসল উৎপন্ন হয়। আর ১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ২·৮ কোটি হেঃ জমিতে ইহাদের চাষ হয় এবং প্রায় ২ কোটি টন ফসল উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ঐ বৎসর (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশে যে পরিমাণ জমিতে মোট খাদ্য শস্যের চাষ হয় তাহার প্রায় সিকি ভাগ জমিতে ইহাদের চাষ হয়। কিন্তু ইহাদের উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র প্রায় দুই কোটি টন, অর্থাৎ এদেশে মোট খাদ্য শস্যের মাত্র ১৪%। ইহাদের মধ্যে জোয়ারের পরিমাণ ২/৩ অংশের বেশী, রাগির পরিমাণ সবচেয়ে কম। মহারাষ্ট্রে জোয়ারের উৎপাদন এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী (৭৬নং চিত্র)। রাজস্থানে প্রচুর বাজরা জন্মে।

৭৬নং চিত্র।

(খ) শিল্পের উপাদান বা বাণিজ্যক ফসল

এদেশে আখ, কার্পাস, পাট, নানাপ্রকার তৈলবীজ প্রভৃতি **অর্থকরী** বা **বাণিজ্যিক ফসলের** (commercial crops) চাষ হয়। ইহাদের মধ্যে আখের সাহায্যে চিনি, মিছরি প্রভৃতি এবং নানা রকম তৈলবীজের সাহায্যে বনস্পতি, দালদা প্রভৃতি তৈরী হয়। আর কার্পাসের সাহায্যে নানারকম বস্ত্র ও পাটের সাহায্যে চট, থলে, দড়ি প্রভৃতি তৈরী হয়। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে যত জমিতে (প্রায় ৯·৭৩ কোটি হেঃ) মোট খাদ্য দ্রব্যের চাষ হইয়াছিল তাহার তুলনায় মাত্র প্রায় ২৫% জমিতে (২·৪ কোটি হেঃ) ইহাদের চাষ হইয়াছিল। এখনও (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশে যত জমিতে (১২·৩ কোটি হেঃ) খাদ্য দ্রব্যের চাষ হয়, তাহার তুলনায় ইহাদের চাষের জমির পরিমাণ (৩·০৬ কোটি হেঃ) মাত্র ২৫%। তবে উভয় প্রকার ফসলের **চাষের জমিই** এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ হইতে ১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ২৫% বাড়িয়াছে। তবে কৃষি বিপ্লবের ফলে এখন ইহাদের মধ্যে অনেক ফসলের উৎপাদনের **পরিমাণ** ঐ সময়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হইতে তিন গুণ।

(৪) কার্পাস

এদেশের অর্থকরী বা **বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে কার্পাস সর্বপ্রধান**। এদেশের শিল্পসমূহের মধ্যে **কার্পাস বস্ত্র শিল্প** অর্থাৎ তাঁত ও মিলের কাপড়, হোসিয়ারী শিল্প প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই **শিল্পের** জন্য **প্রয়োজনীয়** প্রায় যাবতীয়

কার্পাস দেশেই জন্মে। এদেশ হইতে প্রচুর কার্পাস (তুলা) বিদেশে রপ্তানিও হয়। এখন এদেশে উৎপন্ন কার্পাসের প্রায় ৯০% **দীর্ঘ ও মধ্যম আঁশযুক্ত** (long and medium staple) এবং মসৃণ **কার্পাস**। কর্ণাটকে সেচের সাহায্যে উৎকৃষ্ট সাগর দ্বীপীয় কার্পাসও (Sea Island cotton) জন্মে। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ৫৯ লক্ষ হেঃ জমিতে কার্পাসের চাষ হইত। আর এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) তাহার তুলনায় ৩০%-এর বেশী (প্রায় ৭৮ লক্ষ হেঃ) জমিতে কার্পাসের চাষ হয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে এদেশে চাষ-আবাদের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। তার উপর আগেকার ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত কার্পাসের পরিবর্তে এখন এদেশে উৎপন্ন হয় দীর্ঘ ও মধ্যম আঁশযুক্ত কার্পাস। ফলে, এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশে কার্পাস **উৎপাদনের পরিমাণ** ঐ সময়ের তুলনায় **দ্বিগুণের বেশী**। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে ৩০ লক্ষ বেলের বেশী কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছিল। আর এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) উৎপন্ন হয় প্রায় ৭৮ লক্ষ বেল কার্পাস। (এক বেল=১৭০ কেজি)। এদেশে এখন কার্পাস উৎপাদনের পরিমাণ **পৃথিবীতে চতুর্থ** অর্থাৎ যুক্ত-রাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র ও চীনের পরে। এখন এদেশে উৎপন্ন কার্পাসের গুণ (quality) আগেকার চেয়ে ভাল এবং উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশী। এখন এদেশে কার্পাস বস্ত্র শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়েও বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। এজন্য ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক যে এদেশে কার্পাস বস্ত্র শিল্পেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এবিষয় পরে আলোচনা করা হইবে।

এদেশে উর্বর **দো-আঁশ ও কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে কার্পাস জন্মে**। ইহার চাষের জন্য প্রচুর (২৪-২৭° সেঃ) **উষ্ণতা** এবং কার্পাসের গুটি পাকিবার সময় প্রখর ও উজ্জ্বল সূর্যরশ্মি আবশ্যক। কার্পাস চাষের জন্য **বৃষ্টির প্রয়োজন কম** (৫০-১০০ সেঃ মিঃ); কিন্তু সেচ আবশ্যক। এদেশে **সেচ ব্যবস্থার** উন্নতির ফলে কার্পাসের চাষ সম্পর্কে **বিশেষ উন্নতি** হইতেছে। উত্তরে পঞ্জাব হইতে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত দেশের ৭৫-৮০% কার্পাসের (৭৭নং চিত্র) চাষ হয়। এদেশের রাজ্যসমূহের মধ্যে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশে ইহার উৎপাদনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। ইহাদের বাহিরে পশ্চিমে রাজস্থান এবং দক্ষিণ-পূর্বে অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ুতেও প্রচুর কার্পাস জন্মে।

(৫) পাট

বস্ত্র শিল্পের উপাদান হিসাবে কার্পাসের চেয়ে পাট সস্তা অথচ টেকসই। কাজেই বস্ত্র শিল্পের উপাদান হিসাবে পাটের আঁশ (jute fibre) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর **ভারতের ক্ষেত্রে** ইহার গুরুত্ব আরও বেশী। কারণ, ইহার সাহায্যে তৈরী চট, থলে, দড়ি, ত্রেপল প্রভৃতির রপ্তানির পরিমাণ ছিল বহু কাল **ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের** বা বিদেশ হইতে স্বর্ণমুদ্রা উপার্জনের **সর্বপ্রথম** উপাদান। অবিভক্ত বঙ্গদেশে উৎপন্ন হইত পৃথিবীর প্রায় ৯০% পাট। তারপর দেশ বিভাগের **সময়** ভারতের অংশে ছিল মাত্র ২½ লক্ষ হেক্টর পাট চাষের জমি। তাহার অধিকাংশ ছিল পশ্চিমবঙ্গে। ক্রমশঃ এদেশে **পাট চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি** হইতেছে। ফলে, ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট ও মেস্তার চাষ হইয়াছিল। তখন তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৩ লক্ষ বেল বা গাঁট (এক বেল=১৭০ কেজি)। বর্তমানে (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশে ১০½ লক্ষ হেক্টর জমিতে

ইহাদের চাষ হয় এবং ইহাদের **উৎপাদনের পরিমাণ** ৭৪ লক্ষ গাঁটের অধিক। অর্থাৎ এখন এদেশে মেস্তা সহ পাট চাষের জমির পরিমাণ ১৯৫০ খ্রীঃ ইহাদের চাষের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু এখন ইহাদের উৎপাদনের পরিমাণ ঐ সময়ের উৎপাদনের ২½ গুণ (৭৭নং চিত্র)। ১৯৮১-৮২ উৎপাদনের পরিমাণ আরও বেশী ছিল।

নদীর **উপত্যকা ও বদ্বীপের উর্বর পলি মাটিতে,** যেখানে প্রতি বৎসর বন্যার সময় **নূতন পলি জমে,** তথায় পাট অধিক পরিমাণে জন্মে। এরূপ জমির পাশে খাল, বিলে পাট গাছ কাটিয়া পচান হয়। পরে তাহার আঁশ ধুইয়া ও শুকাইয়া শিল্পের উপযোগী পাটের আঁশ পাওয়া যায়। পাট চাষের জন্য প্রয়োজন অধিক (২৫-২৮° সেঃ) **উষ্ণতা** ও **অধিক** (২০০-২৫০ সেঃ মিঃ) **বৃষ্টিপাত।** ভারতে পাট উৎপাদনের পরিমাণ সাধারণতঃ **পৃথিবীতে দ্বিতীয়** অর্থাৎ বাংলাদেশের পরে। তবে কোন কোন বৎসর এদেশে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন হয়। এদেশ হইতে পাটের তৈরী চট, থলে প্রভৃতির রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশঃ কমের দিকে। ফলে, এদেশে পাট শিল্পের অবস্থা খারাপ। তাহার জন্য পাটের বাজারও মন্দা। এজন্য এদেশের কতক পাট চাষের জমিতে পাট চাষের পরিবর্তে ঐ সময়ই আউস ধানের চাষ হয়। এদেশের প্রায় **অর্ধেক পাট** ও প্রচুর **মেস্তা** জন্মে **পশ্চিমবঙ্গে।** তাহার পর আসামের স্থান। তবে আসাম হইতে পশ্চিমে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত কিছু কিছু পাট ও মেস্তা জন্মে। উড়িষ্যা হইতে পশ্চিমে মহারাষ্ট্র পর্যন্তও কিছু কিছু মেস্তার চাষ হয়। মেস্তার নাম মহারাষ্ট্রে আম্বাদী, মধ্য প্রদেশে বিমলি, বিহারে পুষার শণ ইত্যাদি।

৭৭নং চিত্র।

(৬) আখ

গুড়, চিনি, মিছরি এবং অন্য নানাপ্রকার মিষ্টদ্রব্য তৈরীর সর্বপ্রধান উপাদান আখ। কাজেই **খাদ্য দ্রব্য হিসাবে** ইহার **গুরুত্ব** খুব বেশী। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে ১৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে আখের চাষ হইয়াছিল এবং ঐ বৎসর এদেশে ৫·৭ কোটি টন আখ উৎপন্ন হয়। তাহার সাহায্যে ১৩৮টি চিনির কলে ঐ বৎসর ১১·৩ লক্ষ টন চিনি তৈরী হইয়াছিল। এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশে প্রায় ৩২ লক্ষ হেক্টর জমিতে আখের চাষ হয় এবং প্রায় ১৮ কোটি টন আখ উৎপন্ন হয়। ১৯৮২-৮৩ খ্রীঃ ১৯ কোটি টনের অধিক আখ উৎপন্ন হইয়াছিল। এদেশে এখন (১৯৮১-৮২ খ্রীঃ) ৩১৫টি চিনির কলে ৫১·৪ লক্ষ টন চিনি তৈরী হয়। স্পষ্ট দেখা যায় গত ৩৩-৩৪ বৎসরে এদেশে **আখ চাষের জমির পরিমাণ** বাড়িয়াছে প্রায় ৮৮%

কিন্তু আখ উৎপন্ন হইয়াছে ঐ সময়ের তিন গুণের বেশী। আর এখন চিনির কলের সংখ্যা হইয়াছে ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ তুলনায় ২২ গুণ এবং চিনি উৎপাদনের পরিমাণ হইয়াছে ঐ সময়ের প্রায় ৪২ গুণ। ৮-৯ বৎসর পূর্বে (১৯৭৭-৭৮ খ্রীঃ) এদেশে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল অনেক বেশী অর্থাৎ ৬৪·৬ লক্ষ টন। এখনও **আখ** এবং **চিনি** উৎপাদন সম্পর্কে **ভারতের স্থান পৃথিবীতে প্রথম।**

আখ চাষের জন্য **উর্বর দো-আঁশ** মাটি প্রয়োজন। উত্তর প্রদেশের গঙ্গা-সমভূমির **ভাট মৃত্তিকা** এসম্পর্কে বিশেষ উপযোগী। **মাটি একটু লোনা** হইলে, অথবা আখ চাষের জমিতে ও গাছে সমুদ্রের লোনা হাওয়া লাগিলে আখের রসে বেশী গুড়, চিনি তৈরী হয়। ইহার চাষের জন্য **২১-২৭° সেঃ উষ্ণতা** ও মধ্যম রকম (১০০-২০০ সেঃ মিঃ) **বৃষ্টিপাত** প্রয়োজন। বৃষ্টি কম হইলে সেচ আবশ্যক। অপর দিকে বৃষ্টি বেশী হইলে অথবা আখ চাষের জমিতে কোন কারণে জল জমিলে বা তথায় বায়ুর উষ্ণতা কম থাকিলে আখের রসে জলের ভাগ বেশী থাকে। তাহা হইলে আখের রসে মিষ্টির ভাগ কমিয়া যায়। প্রতি দুই বৎসর অন্তর আখ চাষের জমি হইতে আগেকার আখের গোড়া (root) তুলিয়া ফেলিয়া **নূতন চারা** বা **পাব** লাগান দরকার। তাহা হইলে আখের **ফলন** ভাল হয়। আখ চাষের উন্নতি সম্পর্কে তামিলনাড়ুর কয়েম্বেটোর গবেষণাগারের বিশেষ খ্যাতি আছে। তথাকার আখের চারা প্রসিদ্ধ। ভারতের প্রায় **অর্ধেক** আখ জন্মে **উত্তর প্রদেশে।** তথা হইতে পশ্চিমে পঞ্জাব ও পূর্বদিকে বিহার পর্যন্ত ভারতের আখ **চাষের প্রধান অঞ্চল** (৭৮নং চিত্র)। এখানে দেশের ৭০% আখ জন্মে। দাক্ষিণাত্যের সেচখালগুলির ধারে হেক্টর প্রতি আখ উৎপাদনের হার উত্তর ভারতের উৎপাদনের হারের চেয়ে বেশী। এবিষয়ে **মহারাষ্ট্রের** স্থান এদেশের মধ্যে **প্রথম।** দাক্ষিণাত্যের মৃত্তিকা কার্পাস, তামাক, চীনাবাদাম, গম প্রভৃতি চাষের পক্ষে অনুকূল। তাই এখানে ইহাদের চাষই বেশী। এখানে আখের ব্যাপক চাষ সম্ভব নয়।
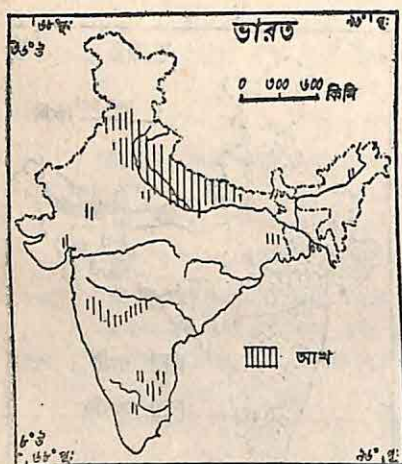
৭৮নং চিত্র।

(৭) চা

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের **প্রিয় পানীয় চা।** ভারতের ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব আরও বেশী। কারণ, ইহা এদেশের **অন্যতম প্রধান রপ্তানিদ্রব্য।** বর্তমানে এদেশ হইতে পাটজাত দ্রব্যের চেয়েও চা রপ্তানির মূল্য বেশী। ১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ এদেশ হইতে ৫০০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের চা রপ্তানি হইয়াছে। এদেশ হইতে **সাধারণ** চা বা **কাল** চা ছাড়া **ইনস্ট্যান্ট টি**-এর রপ্তানিও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। চা ও কফি এদেশের অন্যতম **আবাদী ফসল** বা **বাগিচা ফসল** (plantation

crop)। ইহাদের জন্য পাহাড়, পর্বতের ঢালের ও উপত্যকার বন পরিষ্কার করিয়া এসকল গাছের চারা রোপণ করা হয়। এবং পাশেই চা বা কফি তৈরীর কারখানা বা শিল্পকেন্দ্র, কর্মীদের বাসগৃহাদি তৈরী করা হয়। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে ৩ লক্ষ হেক্টরের অধিক জমিতে চা-এর আবাদ ছিল এবং ঐ বৎসর উৎপন্ন হইয়াছে প্রায় ২৭·৭ কোটি কেজি চা। এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশে চা-এর আবাদের আয়তন সামান্য অর্থাৎ ঐ সময়ের তুলনায় প্রায় ১০% বাড়িয়াছে। কিন্তু এখন এদেশে চা **উৎপাদনের পরিমাণ** প্রায় ৬০ কোটি কেজি, অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ চা উৎপাদনের তুলনায় দ্বিগুণ বা কোন কোন বৎসর তাহার চেয়ে বেশী। চা উৎপাদন সম্পর্কে **ভারতের স্থান পৃথিবীতে প্রথম** (৭৯নং চিত্র), চা **রপ্তানি** সম্পর্কেও ভারত পৃথিবীতে **প্রথম**।

চা-এর আবাদ করা হয় **পাহাড়, পর্বতের ঢালে** ও উপত্যকাতে। কারণ, সেখান হইতে বৃষ্টির জল সহজে গড়াইয়া পড়ে। তাহাছাড়া উঁচু জায়গাতে উৎপন্ন চায়ের স্বাদ ও গন্ধ দুইই উৎকৃষ্ট। লতাপাতা পচান **হিউমাস সারযুক্ত উর্বর মৃত্তিকা** চা-এর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাহাছাড়া চায়ের আবাদে মাঝে মাঝে সার দেওয়া দরকার। ইহার চাষের জন্য প্রচুর (২৪-২৭° সেঃ) **উষ্ণতা** ও অধিক (২০০-২৫০ সেঃ মিঃ) **বৃষ্টিপাত** প্রয়োজন। বায়ুতে অধিক আর্দ্রতা এবং প্রচুর শিশির ও কুয়াশা ইহার চাষের পক্ষে উপকারী। চায়ের আবাদে **বৎসরের অধিকাংশ সময় কিছু কিছু বৃষ্টি** হইলে চা গাছ হইতে সবচেয়ে বেশী **কুঁড়ি ও কচি-পাতা** পাওয়া যায়। তাহা সংগ্রহের কাজে মেয়েরা বিশেষ দক্ষ। এদেশে প্রায় **অর্ধেক চা** উৎপন্ন হয় **আসামের** দারাং, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, কাছাড়, লখিমপুর প্রভৃতি জেলাতে। এদেশের প্রায় সিকিভাগ চা পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের **দার্জিলিং** ও **জলপাইগুড়িতে**। এদেশের বাকী প্রায় সিকিভাগ চা পাওয়া যায় কেরালা, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের সংযোগস্থল **নীলগিরি অঞ্চলে**। ত্রিপুরা, ছোটনাগপুর, দেরাদুন (উত্তর প্রদেশ), কাংড়া উপত্যকা (হিমাচল প্রদেশ) প্রভৃতি স্থানেও সামান্য চা উৎপন্ন হয়।

৭৯নং চিত্র।

(৮) কফি

চকোলেট তৈরী ও **পানীয়** হিসাবে কফির জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ইন্‌সট্যান্ট টি-র মত **ইন্‌সট্যান্ট কফিরও** সমাদর খুব বেশী। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ৮৩,০০০ হেক্টর জমিতে কফির চাষ হইয়াছিল এবং প্রায় ২১,০০০ টন কফি উৎপন্ন হইয়াছিল। আর এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশে ঐ সময়ের ২½ গুণ জমিতে অর্থাৎ প্রায় ২·১৫ লক্ষ হেঃ **জমিতে** কফির চায় হয়। কিন্তু চাষ-

আবাদ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এদেশে কফি **উৎপাদনের পরিমাণ** প্রায় ১·৬৫ লক্ষ টন, অর্থাৎ ঐ সময়ের কফি উৎপাদনের প্রায় ৭-৮ গুণ।

কফির আবাদের জন্য প্রায় **চা-এর আবাদের মত ঢালু জমি** দরকার। তাহা ছাড়া ইহার চাষের জন্য প্রায় ২৪-২৭° সেঃ উষ্ণতা ও ২০০-২৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টি দরকার। কফি গাছের চারা প্রখর সূর্যরশ্মি সহ্য করিতে পারে না। তাই কফির চারা গাছের জন্য প্রয়োজনীয় ছায়ার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে কলা গাছ ও অন্য কতক গাছ লাগান হয়। **নীলগিরি অঞ্চলের** লোহিত ও ল্যাটারাইট মৃত্তিকা কফির আবাদের পক্ষে অনুকূল। তাহার উপর তথায় বৎসরের অধিকাংশ সময় বৃষ্টি হয়। তথায় বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণও বেশী। এসকল কারণে তথায়ই **দেশের অধিকাংশ কফি** উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে কর্ণাটকেই এদেশের প্রায় ⅘ অংশ কফি তৈরী হয়। তাহার পর তামিলনাড়ুর স্থান। স্বাদে ও গন্ধে কর্ণাটকের কফি পৃথিবী-বিখ্যাত (৭৯নং চিত্র)।

(৯) তৈলবীজ

সকল বাড়িতেই রান্নার কাজে তৈল ব্যবহৃত হয়। তাহাছাড়া এদেশে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে দালদা, বনস্পতি, রসুই প্রভৃতি ভেষজ তৈল বা কৃত্রিম ঘি অথবা কৃত্রিম মাখন (vegetable oil), সাবান, বার্নিশ প্রভৃতি তৈরী হইতেছে। এসকল জিনিস তৈরীর জন্য নানারকম তৈলবীজ হইতে উৎপন্ন তৈল প্রচুর পরমাণে প্রয়োজন।

৮০নং চিত্র।

এদেশের অধিকাংশ স্থানে **শীত কালে** প্রয়োজনমত **সেচের সাহায্যে রবি শস্য** হিসাবে নানাপ্রকার তৈল-বীজের চাষ হয়। ইহাদের মধ্যে **চীনা-বাদামের** (ground nut) পরিমাণ প্রায় ৬০-৭০%। তারপর **সরিষা, তিল, তিসি** প্রভৃতির স্থান। এদেশে ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এক কোটি হেক্টরের অধিক জমিতে তৈলবীজের চাষ হইয়াছিল এবং উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫২ লক্ষ টন। আর এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) প্রায় ১·৯ কোটি হেঃ জমিতে ইহাদের চাষ হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১·৩ কোটি টন। কাজেই দেখা যায়, তখন-কার প্রায় দ্বিগুণ জমিতে এখন ইহা-দের চাষ হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ তখনকার উৎপাদনের প্রায় ২½ গুণ। এদেশে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী জমিতে তৈলবীজের চাষ হয় এবং এদেশে তৈলবীজ উৎপন্নও হয় **পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী**। ইহাদের মধ্যে **চীনাবাদামের** স্থান প্রথম। ইহার **উৎপাদন** সম্পর্কেও ভারতের স্থান **পৃথিবীতে প্রথম** (৮০নং চিত্র)। ইহা প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতে জন্মে। উত্তর প্রদেশ এবং মধ্য প্রদেশেও প্রচুর চীনা-

বাদাম জন্মে। সরিষা অধিক জন্মে উত্তর প্রদেশে। আর নারিকেল অধিক জন্মে সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে।

vii. শক্তির উৎস ও কয়েকটি প্রধান খনিজ সম্পদ্ এবং তাহাদের প্রভাব

ভারতে কয়লা, লৌহ আকরিক, খনিজ তৈল (পেট্রোলিয়াম), ম্যাঙ্গানিজ আকরিক, অভ্র, বক্সাইট প্রভৃতি বহু প্রকার খনিজ সম্পদ্ পাওয়া যায়। এদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেও এদেশে এসকল সম্পদ্ ছিল। কিন্তু তখন ইহাদের জন্য প্রয়োজন-মত অনুসন্ধান করা হয় নাই। ইহাদের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্যও চেষ্টা হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর এদেশে সকল বিষয়ে উন্নতির জন্য চেষ্টা হইতেছে। স্বভাবতঃ এবিষয়েও হইতেছে। এদেশের খনিজ সম্পদ্ সমূহের মধ্যে কয়লা ও খনিজ তৈল প্রধানতঃ শক্তির উৎস রূপে ব্যবহৃত হয়। আর লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ আকরিক, বক্সাইট, তামা প্রভৃতি প্রধানতঃ শিল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শক্তির উৎস

বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র **যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা, নানাপ্রকার শিল্প, কল-কারখানা** প্রভৃতির গুরুত্ব আগেকার তুলনায় অনেক বেশী। ইহাদের গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন প্রচুর **শক্তির উৎস** (sources of energy or power resources)। সুতরাং সর্বত্র শক্তির উৎসের গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে।

সুদূর অতীত কালে সকল দেশেই ছিল ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের যুগ। তখন গৃহস্থালীর কাজে ও শিল্পে **কাঠ ও কাঠকয়লা শক্তির উৎসরূপে** ব্যবহৃত হইত। ক্রমশঃ গৃহস্থালী, যাতায়াত ব্যবস্থা, বিভিন্ন কলকারখানা ও অন্য অনেক কাজে কয়লাকে সরাসরি শক্তির **উৎস** হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। আরও পরে এসকল কাজে **তাপ-বিদ্যুৎ শক্তি** (Thermal power) ব্যবহৃত হইতেছে। কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতির সাহায্যে তাপ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। তাহাছাড়া নদ-নদীর স্বাভাবিক ও কৃত্রিম জলপ্রপাতের প্রবল জল শক্তির সাহায্যে উৎপন্ন হইতেছে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে **জলজ বিদ্যুৎ শক্তি** (Hydro-electric or hydel power)। এই দুই প্রকার বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা ও ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। **সম্প্রতি আণবিক বা পরমাণবিক শক্তি** (Atomic power or energy), **সৌর শক্তি** (Solar energy) প্রভৃতির ব্যবহারও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের **ভারতও**
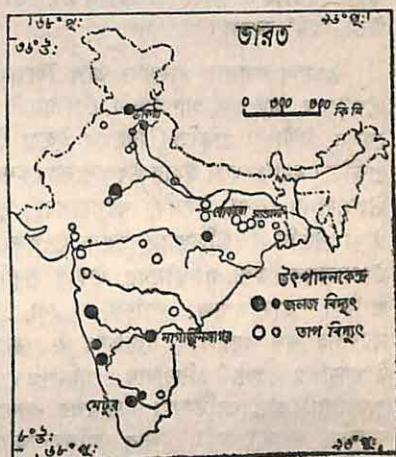
৮১নং চিত্র।

এসকল বিষয়ে **পশ্চাৎপদ** থাকিতে অনিচ্ছুক। আমাদের দেশে এগুলি ভিন্ন বায়োগ্যাস (Biogas), বায়ু কল (Wind mill), জিওথার্মাল শক্তি (Geothermal energy) প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইতেছে। শহর, নগর, কলকারখানা অঞ্চলে জঞ্জালের (Urban waste) সাহায্যে শক্তি উৎপাদনের পরিমাণও ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশে শক্তি উৎপাদনের উপাদান (source) সম্পর্কে পার্থক্য খুব বেশী। ফলে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে প্রধানতঃ তাপ বিদ্যুৎ শক্তি, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মেঘালয়, অরুণাচল প্রভৃতি রাজ্যে প্রধানতঃ জলজ বিদ্যুৎ শক্তি এবং অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে উভয় প্রকার শক্তি উৎপাদনের সুযোগ অধিক। তবে এখনও এদেশে **তাপ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ অধিক।** ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে মোট প্রায় ১৯০০ মেগাওয়াট (mw) বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইত। আর এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশে ২৪,০০০ মেগাওয়াট (mw) তাপ বিদ্যুৎ শক্তি, ১৩,৭০০ মেগাওয়াটের বেশী জলজ বিদ্যুৎ শক্তি এবং প্রায় ১১০০ মেগাওয়াট আণবিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। অর্থাৎ এখন এদেশে মোট প্রায় ৪০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ তুলনায় ইহার পরিমাণ প্রায় ২০ গুণ। ইহার মধ্যে প্রায় ৬২% তাপ বিদ্যুৎ শক্তি, প্রায় ৩৫% জলজ বিদ্যুৎ শক্তি এবং মাত্র প্রায় ৩% আণবিক শক্তি। বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে একাধিক শক্তি প্রয়োজনমত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে **গ্রিড-প্রথা** ক্রমশ অধিক প্রচলিত হইতেছে। এদেশের বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ও তাহার সরবরাহ সুষ্ঠু ভাবে পরিচলনা করিবার উদ্দেশ্যে এদেশকে **পাঁচটি অঞ্চলে** বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—উত্তর অঞ্চল, পশ্চিম অঞ্চল, দক্ষিণ অঞ্চল, পূর্ব অঞ্চল ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল।

এদেশে **কয়লার সাহায্যে তাপ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র** পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর, ব্যাণ্ডেল, সান্তালদি, কোলাঘাট, ফরাক্কা, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, টিটাগড় প্রভৃতি। বিহারে ইহার উৎপাদনের কেন্দ্র বোকারো, চন্দ্রপুরা, পত্রাতু প্রভৃতি। মধ্য প্রদেশে ইহার উৎপাদনের কেন্দ্র কোরবা, অমরকণ্টক প্রভৃতি। মহারাষ্ট্রে ইহার উৎপাদনের কেন্দ্র কয়াদি, খপেরখেদা, ভুসোয়াল, উরান, পার্লি, চন্দ্রপুর, নাসিক, ট্রম্বে প্রভৃতি। উড়িষ্যাতে ইহার উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র তলচের। গুজরাটে ইহার উৎপাদনের কেন্দ্র গান্ধীনগর, উকাই প্রভৃতি। উত্তর প্রদেশে ইহার উৎপাদনের কেন্দ্র পারিচা, হার্দুয়াগঞ্জ, পাঙ্কি, ওরবা, সিঙ্গরাউলি। দেল্লীতে তাপবিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ হয় বদরপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ ও রাজঘাট কেন্দ্র হইতে। হরিয়ানাতে ইহার উৎপাদনের কেন্দ্র ফরিদাবাদ, পানিপথ। রাজস্থানে ইহার উৎপাদন-কেন্দ্র কোটা। পঞ্জাবের কেন্দ্র ভাতিন্দা। তারপর অন্ধ্র প্রদেশে ইহার উৎপাদনের কেন্দ্র কোথাগুডম, রামগুণ্ডেম। আর তামিলনাড়ুতে ইহার উৎপাদনের কেন্দ্র এন্নোর, টুটিকোনির, নেভেলি প্রভৃতি। এদেশে **খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে তাপ-বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র** আসামের গুয়াহাটি (নুনমাটি), ডিগবয়, বিহারের বারাউনি, গুজরাটের ধুবারন, উকাই, ওয়ানকবরি, গান্ধীনগর, মহারাষ্ট্রের ট্রম্বে, কেরালার কোচিন প্রভৃতি।

এদেশে **জলজ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের প্রধান** কেন্দ্র পঞ্জাবের ভাকরা-নাঙ্গল, পঙ্গ প্রভৃতি। মধ্য প্রদেশের কেন্দ্র রাণা প্রতাপ সাগর, জওহর সাগর, গান্ধী সাগর। উত্তর

প্রদেশের কেন্দ্র রিহান্দ, যমুনা, চিল্লা, রাম গঙ্গা। গুজরাটের কেন্দ্র উকাই। মহারাষ্ট্রের কেন্দ্র কয়না, ভিবপুরী, লোনাভলা, ভীরা। কর্ণাটকের কেন্দ্র কালী নদী, শিবসমুদ্রম্, সরাবতী। তামিলনাড়ুর কেন্দ্র কুণ্ডা, কোদুয়ার, মেটুর, পেরিয়ার, পাইকারা। কেরালার কেন্দ্র ইডুকি, সবরিগিরি, পল্লীভাসাল। অন্ধ্র প্রদেশের কেন্দ্র সিলেরু, মাচকুন্দ, শ্রীশৈলম্, নাগার্জুন সাগর, তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প। বিহারের কেন্দ্র মাইথন, পাঞ্চেত, তিলাইয়া, কোশী, সুবর্ণরেখা প্রকল্প। উড়িষ্যার কেন্দ্র মহানদী প্রকল্প (হীরাকুঁদ), বালিমেলা। জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্র সালাল। মণিপুরের কেন্দ্র লোকটেক। মেঘালয়ের কেন্দ্র কিরিয়ডেম কুলাই। এদেশে **আণবিক শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র** মহারাষ্ট্রের তারাপুর, রাজস্থানের কোটা, তামিলনাড়ুর কালপক্কম্ প্রভৃতি (৮১নং চিত্র)।

এদেশে উৎপন্ন শক্তির দুইটি উৎসের বিষয় (সিলেবাস অনুসারে) নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(১) কয়লা

কয়লা এদেশের **সর্বপ্রধান** খনিজ **সম্পদ্**। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর হইতে এদেশের বিভিন্ন খনিজ সম্পদ্ সম্পর্কে গবেষণা, অনুসন্ধান, ইহাদের উৎপাদন ও ব্যবহার প্রভৃতি সকল বিষয়েই অসামান্য উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কয়লার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে মাত্র ৩২ কোটি টনের অধিক কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল। আর এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশে তাহার প্রায় চার গুণ অর্থাৎ ১৩·৯ কোটি টন কয়লা উৎপন্ন হইতেছে। ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ সম্ভবতঃ ১৪·৭ কোটি টন (অর্থাৎ ১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ তুলনায় প্রায় ৮০ লক্ষ টন বেশী) কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার ৯৫%-এর বেশী **উৎকৃষ্ট** (bituminous) কয়লা ও মাত্র প্রায় ৫৯ লক্ষ টন **লিগনাইট** বা নিকৃষ্ট কয়লা। কয়লা উৎপাদন সম্পর্কে ভারতের স্থান **পৃথিবীর** দেশগুলির মধ্যে **সপ্তম**।

৮২নং চিত্র।

এদেশে উৎপন্ন কয়লার প্রায় অর্ধেক বিভিন্ন **শিল্পকেন্দ্রে কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি চালাইবার** জন্য ব্যবহৃত হয়। বাকী কয়লা **রেলগাড়ি, স্টীমার** প্রভৃতি **চালানো,** রান্না ও অন্য নানা কাজে **ব্যবহৃত** হয়। কিছু কয়লাকে তৈল জাতীয় পদার্থ এবং গ্যাসেও পরিণত করা হয়। কাজেই বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি **সম্পর্কে** কয়লার গুরুত্ব অসামান্য। বিশেষতঃ লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং বা পূর্ত, এলুমিনিয়াম প্রভৃতি **ধাতব শিল্পের জন্য প্রচণ্ড তাপ শক্তি** প্রয়োজন। তাই এসকল ক্ষেত্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে **উৎকৃষ্ট**
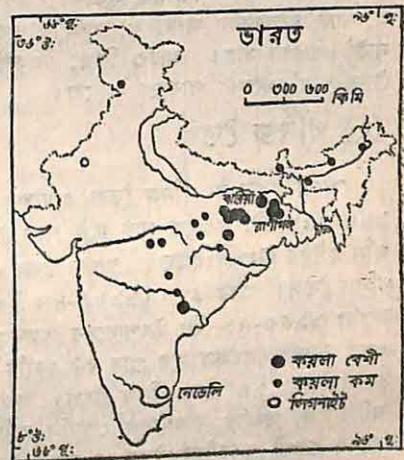
কয়লাকে বিহারের দুগদা, কারগলি, কাথাবা, পাথরদিহ প্রভৃতি ধৌতাগারে (coal washeries) পাঠান হয়। তাহা পরে দুর্গাপুরের কোক চুল্লীতে (coke oven) **শক্ত কোক কয়লাতে** (hard coke) পরিণত করা হয়। ইহাই সকল ধাবত শিল্প-কেন্দ্রে ব্যবহার করা হয়। কোক তৈরীর সময় কোল গ্যাস, **বেঞ্জল, আলকাতরা,** স্যাকারিন, ন্যাফথালিন, পিচ প্রভৃতি মূল্যবান্ উপজাতদ্রব্য (bi-product) পাওয়া যায়। কয়লা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবেষণাগার (Indian Fuel Research Institute) ধানবাদে অবস্থিত।

ভারতের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট কয়লার খনি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশ হইতে পশ্চিমে মধ্য প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চল **গণ্ডোয়ানা** কয়লা অঞ্চল বা **দামোদর উপত্যকা কয়লা অঞ্চল** নামেও পরিচিত। এখানে প্রায় ৮৩০টি কয়লার খনি আছে। তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ কোল ইণ্ডিয়া লিঃ (Coal India Ltd.) নামক সংস্থার মাধ্যমে **সরকারের পরিচালনাধীন**। এদেশের **প্রায় অর্ধেক** কয়লা পাওয়া যায় **বিহার রাজ্যে**। এখানকার প্রধান কেন্দ্র ছোটনাগপুরের **ঝরিয়া**। বোকারো, ডল্টনগঞ্জ, গিরিডি, রাজমহল, করণপুরা, রামগড় প্রভৃতি এই রাজ্যের অন্যান্য কেন্দ্র। আমাদের **পশ্চিমবঙ্গে** পাওয়া যায় ভারতের **প্রায় সিকিভাগ** কয়লা। এখানকার প্রধান কেন্দ্র **রাণীগঞ্জ**। ইহা ঝরিয়ার ২৫ কিঃ মিঃ-র মধ্যে। আসানসোল, ধর্মনগর, পুরুলিয়া-বাঁকুড়াতেও (মেঝিয়া) কয়লা পাওয়া যায়। এই দুই রাজ্যের বাহিরে উড়িষ্যার **তলচের**, রামপুর, মধ্য প্রদেশের সোহাগপুর, পেঞ্চ উপত্যকা, ঝিলিমিলি, উমারিয়া, কোরবা, সিংগরা-উলিতে কয়লা পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রের ওয়ারোরা, বল্লারপুর, ওয়ার্ধা, কাম্পতি ও চান্দাতে কয়লা পাওয়া যায়। অন্ধ্র প্রদেশের সিঙ্গারেনি, তেন্দুর প্রভৃতি কেন্দ্রেও কয়লা পাওয়া যায়। এদেশে **লিগনাইট** উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র **তামিলনাড়ুর** নেভেলি। দাক্ষিণাত্যে উৎকৃষ্ট কয়লার অভাব। এজন্য তথায় লিগনাইটের গুরুত্ব খুব বেশী। গুজরাট, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিংএও কিছু লিগ-নাইট পাওয়া যায়। আরও কিছু নিকৃষ্ট (টার্সিয়ারি) কয়লা পাওয়া যায় দেশের উত্তর-পূর্ব অংশের পার্বত্য অঞ্চলে।

(২) খনিজ তৈল

পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তৈল এদেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ্। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে মাত্র দুই লক্ষ টনের অধিক আকরিক তৈল (crude oil) খনি হইতে উৎপন্ন হইত। অথচ তখন এদেশে ব্যবহৃত হইত প্রায় ৩৪ লক্ষ টন খনিজ তৈল। আর এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশে **উৎপন্ন হয়** প্রায় ২.৬ কোটি টন অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ উৎপাদনের তুলনায় **প্রায়** ১৩০ **গুণ** বেশী আকরিক তৈল। এখন এদেশে **ব্যবহৃত হয়** প্রায় ৩২ কোটি টন অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রীঃ এদেশে ব্যবহারের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ খনিজ তৈল। কাজেই এদেশে খনিজ তৈলের উৎপাদন যেমন বাড়িতেছে, তাহার ব্যবহারও তেমনি বাড়িতেছে। ফলে, এখন আগেকার তুলনায় অনেক বেশী **আকরিক তৈল ও পেট্রোলিয়াম-জাত** দ্রব্য এদেশে **আমদানি** করা হয়। ১৯৮২-৮৩ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ১·৭ কোটি টন আকরিক তৈল ও প্রায় ৫০ লক্ষ টন পেট্রোলিয়াম-জাত দ্রব্য আমদানি করা হয়। অবশ্য এদেশ হইতে এসকল জিনিস কিছু কিছু রপ্তানিও হয়। এদেশে উৎপন্ন ও আমদানিকরা **আকরিক তৈলকে** দেশের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত ১২টি **শোধনাগারে** (oil refineries) পাঠান হয়। এসকল

শোধনাগারের মধ্যে কয়ালি, মথুরা, মাদ্রাজ, মানালি, বঙ্গাইগাঁও, গুয়াহাটি, বারাউনি, ডিগবয়, হলদিয়া, কোচিন, ট্রম্বে, বিশাখাপটনম্‌ প্রভৃতি প্রধান। এসকল কেন্দ্রে এখন (১৯৮২-৮৩ খ্রীঃ) ৩·৩ কোটি টনের অধিক আকরিক তৈল শোধন করা হয়। এই তৈল শোধনের ফলে গ্যাসোলিন বা পেট্রোল, কেরোসিন, গ্যাস ও অন্যান্য বহু উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়।

এদেশে খনিজ তৈলের প্রধান উপজাত দ্রব্য **পেট্রোল**। তাহা ব্যবহৃত হয় যাতায়াত ও পরিবহনের কাজে। যেমন, স্থলপথে মোটরগাড়ি, ট্রাক, বাস প্রভৃতি, নৌপথে জাহাজ, স্টীমার প্রভৃতি এবং আকাশপথে বিভিন্ন প্রকার বিমানপোত চালাইবার জন্য পেট্রোল ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য উপজাত দ্রব্যের মধ্যে **ডিজেল** (diesel) তৈল ব্যবহৃত হয় কতক রেলওয়ে ইঞ্জিন, বাস, লরি প্রভৃতি চালাইবার জন্য। **লুব্রিকেটিং (lubricating) তৈল** ব্যবহৃত হয় কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি চালু রাখার জন্য। **কেরোসিন** ব্যবহৃত হয় রান্না, আলো জ্বালান এবং ট্র্যাক্টর, পাম্প ও অন্য কতক যন্ত্রপাতি চালাইবার জন্য। **অ্যাসফ্যাল্ট** দ্বারা রাস্তা বাঁধান হয়। ন্যাফথল ব্যবহৃত হয় কীটনাশক রূপে। আর প্রাকৃতিক গ্যাস রাস্তায় আলো জ্বালান ও বাড়িতে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। খনিজ তৈলের অপর কতক উপজাত দ্রব্য দ্বারা ক্রীম, ভেসেলিন, লিপস্টিক ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য, বার্নিশের তৈল, প্ল্যাস্টিক, কৃত্রিম রবার, মোম, ক্যামেরার ফিল্ম প্রভৃতি বহু জিনিস তৈরী হয়।

খনিজ তৈল সংগ্রহের সময় বহু তৈলকূপ হইতে **প্রাকৃতিক গ্যাস** পাওয়া যায়। আর কতক গভীর কূপ হইতে কেবল মাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) পাওয়া যায়।
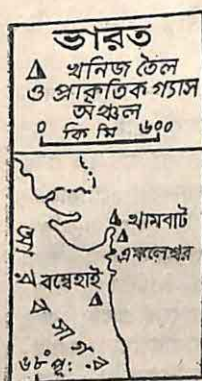
৮৩নং চিত্র।

বর্তমানে এদেশে **খনিজ তৈল** পাওয়া যায় প্রধানতঃ দেশের **পূর্ব ও পশ্চিম** অংশে। এদেশের **পশ্চিম** অংশের **প্রধান কেন্দ্র** বোম্বাই বন্দরের অদূরে অগভীর সমুদ্রে অবস্থিত **'বম্বে হাই'** অঞ্চল। এখানকার তৈল সম্পদ (oil reserve) সমগ্র দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এখানকার ভাসমান কেন্দ্র 'সাগর সম্রাট' বিখ্যাত। তাহার উত্তরে গুজরাটের **খামভাট** (কাম্বে) উপসাগরের পাশে অবস্থিত **এঙ্কলেশ্বর** কেন্দ্রে এখন এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আকরিক তৈল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের খামভাট (কাম্বে), কোসাম্বা, কলোল, লুনেজ, কাথাবা, সানন্দ প্রভৃতি কেন্দ্রও প্রসিদ্ধ। এসকল স্থান হইতে আকরিক তৈল পাইপযোগে সরবরাহ হয় কয়ালি, ট্রম্বে প্রভৃতি তৈল **শোধনাগারে**। ভারতের **উত্তর-পূর্ব অংশে** আসামের ডিগবয় কেন্দ্রে এখন তৈল উৎপাদনের পরিমাণ কম। এই অঞ্চলের বাপ্পাপুঙ্গ, হানসাপুঙ্গ, নাহারকাটিয়া, হুগরিজান, মোরান, মাকুম, রুদ্রসাগর ও ইহাদের আশপাশে এখন তৈল উৎপন্ন হয়। এই সকল উৎপাদনকেন্দ্র হইতে আকরিক তৈল পাইপযোগে পাঠান হয় গুয়াহাটি
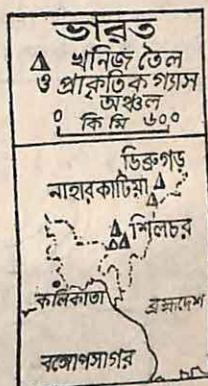
৮৪নং চিত্র।

(নূনমাটি), ডিগবয়, বঙ্গাইগাঁও, বারাউনি প্রভৃতি **শোধনাগারে**। আর এদেশে আমদানি করা খনিজ তৈল শোধন করা হয় প্রধানতঃ বিভিন্ন বন্দর ও তাহাদের আশপাশে অবস্থিত শোধনাগারে। যেমন, কোচিন, ট্রম্বে, বিশাখাপটনম্, মাদ্রাজ (মানালি), হলদিয়া প্রভৃতি। বিভিন্ন শোধনাগার হইতে তৈলজাত দ্রব্য পাইপ যোগে শিলিগুড়ি, মৌরিগ্রাম, কানপুর, আহমদাবাদ প্রভৃতি কেন্দ্রে পাঠান হয়। এসকল কেন্দ্র হইতে তৈল দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়।

অপর কয়েকটি প্রধান খনিজ সম্পদ

(৩) লৌহ আকরিক

লৌহ বর্তমানে **সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ধাতব পদার্থ**। উৎপাদনের পরিমাণ ও মূল্য হিসাবে ইহা এদেশের **দ্বিতীয় খনিজ সম্পদ্** (কয়লার পরে)। এদেশে প্রধানতঃ **উৎকৃষ্ট হেমাটাইট*** জাতীয় লৌহ সংগ্রহ বা উৎপন্ন করা হয়। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে উৎপন্ন হইত প্রায় ৩০ লক্ষ টন লৌহ আকরিক। আর এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় ১৩ গুণ অর্থাৎ ৩·৮ কোটি টনের বেশী লৌহ আকরিক। (১৯৭৭-৭৮ খ্রীঃ ৪·৪ কোটি টন উৎপন্ন হইয়াছে।) লৌহ আকরিক উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবে ভারতের স্থান **পৃথিবীর** দেশগুলি **মধ্যে ষষ্ঠ**। এখন এদেশে **লৌহের ব্যবহার** অসামান্য পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার সাহায্যে জাহাজ, স্টীমার, নানারকম গাড়ি, প্রকাণ্ড সেতু, অসংখ্য রকম ছোট বড় কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি, ঘর-বাড়ির অংশ, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রভৃতি তৈরী হয়। ইহাদের মধ্যে কতক এত উৎকৃষ্ট যে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশেও তাহা রপ্তানি হয়। আবার এদেশের কতক উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিকও জাপানে ও অন্য কয়েকটি দেশে রপ্তানি হয়। ১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ এদেশ হইতে ৩৮৫ কোটি টাকার অধিক মূল্যের লৌহ আকরিক রপ্তানি হইয়াছে।
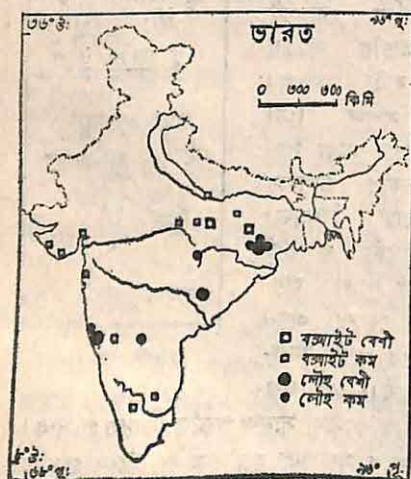
৮৫নং চিত্র।

বর্তমানে এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী (দেশের প্রায় ৩০%) আকরিক লৌহ উৎপন্ন হয় মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মিলনস্থল **গোয়াতে**। এদেশের প্রায় ২৫% লৌহ আকরিক উৎপন্ন হয় উড়িষ্যাতে এবং প্রায় ২০% উৎপন্ন হয় বিহারে। উড়িষ্যাতে লৌহ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র গুরুমহিষাণী, সুলাইপত, বাদামপাহাড়, বোনাই, বাগিয়াবুরু কেন্দ্র। বিহারের প্রধান কেন্দ্র চিরিয়া, নোয়ামুণ্ডি, গুয়া, বুদাবুরু, পানসিরাবুরু প্রভৃতি। এই অঞ্চলের কিরিবুরু খনি বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যে বিস্তৃত। মধ্য প্রদেশে লৌহ আকরিক পাওয়া যায় বৈলাদিলা, দুর্গ, বাস্তার, ডালি

* এই আকরিকের মধ্যে লৌহের ভাগ ৬৫% বা তাহা অপেক্ষা অধিক।

রাজহারা কেন্দ্রে। তাহাছাড়া অন্ধ্র প্রদেশের প্রধান কেন্দ্র নেলোর, গুন্টুর, কুড্ডাপা, কুর্নুল। তামিলনাড়ুর প্রধান কেন্দ্র সালেম, তিরুচিরাপল্লী। মহারাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্র চাঁদা, রত্নগিরি। কর্ণাটকের প্রধান কেন্দ্র বাবাবুদান, দোনিমালাই, সান্দুর, চিত্রদুর্গ, বেলারি। রাজস্থানের জয়পুর, জশল্মীর প্রভৃতি স্থানেও লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

(৪) বক্সাইট (আকরিক)

বক্সাইট এদেশের একটি **গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ**। সাধারণতঃ জলজ বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে **অতিশয় প্রচণ্ড উত্তাপে** ইহা গলাইয়া **এলুমিনিয়াম** তৈরী হয়। আর তাহার সাহায্যে বিমানপোত ও গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার জিনিস তৈরী হয়। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে মাত্র প্রায় ৭০,০০০ টন বক্সাইট উৎপন্ন হয়। ৩০ বৎসর পরে (১৯৮০-৮১ খ্রীঃ) এদেশে প্রায় ২০ লক্ষ টন বক্সাইট উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে, এখন এদেশে এলুমিনিয়ামের উৎপাদন ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ তুলনায় প্রায় ২৫০ গুণ। বক্সাইট অধিক পাওয়া যায় বিহার ও মধ্য প্রদেশে। তারপর মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও অন্য কয়েকটি রাজ্যে। মধ্য প্রদেশের বক্সাইট উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে বালাঘাট, জব্বলপুর, মান্দলা ও অমরকণ্টক প্রধান। বিহারের পালামৌ ও লোহারডাগা কেন্দ্র বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। মহারাষ্ট্রের টঙ্গের পাহাড় ও শোলাপুর কেন্দ্র বিখ্যাত। গুজরাটের প্রধান কেন্দ্র জামনগর। উড়িষ্যার সম্বলপুর ও কালাহাণ্ডি কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। তামিল-নাড়ুর প্রধান কেন্দ্র সালেম। কর্ণাটকের প্রধান কেন্দ্র বাবাবুদান।

(৫) ম্যাঙ্গানিজ আকরিক

ম্যাঙ্গানিজ ভারতের একটি **গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ**। ইহা ইস্পাত ও কাচ শিল্পে অধিক ব্যবহৃত হয়। ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদন সম্পর্কে এখন এদেশের স্থান **পৃথিবীর** দেশগুলির মধ্যে **তৃতীয়**। আর ম্যানিজ **রপ্তানি সম্পর্কে** এদেশের স্থান পৃথিবীতে **প্রথম**। এদেশে উৎকৃষ্ট ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনের পরিমাণ এখন (১৯৮১-৮২ খ্রীঃ) ১৪·৫ লক্ষ টনের বেশী। ইহা অধিক পাওয়া যায় উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কালাহাণ্ডি, কোরাপুট, গাঙ্গাপুর, বোনাই, কেওঞ্জড় ও সুন্দর-গড়ে। কর্ণাটকে ইহা অধিক পাওয়া যায় বেলগাঁও, চিত্রদুর্গ, সান্দুর, সিমোগা ও তমকুরে। মধ্য প্রদেশে ইহা অধিক পাওয়া যায় বালাঘাট, ছিন্দোয়ারা ও জব্বলপুরে। মহা-
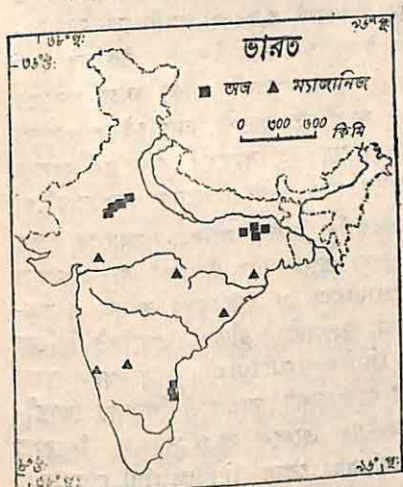
৮৬নং চিত্র।

রাষ্ট্রে ইহা পাওয়া যায় ভাণ্ডারা ও নাগপুরে। গুজরাটে ইহা পাওয়া যায় পাঁচমহলে। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের সংযোগস্থল গোয়াতেও ইহা পাওয়া যায়। বিহারে ম্যাঙ্গানিজ

পাওয়া যায় কালহান ও সিংভূমে। অন্ধ্র প্রদেশে ইহা পাওয়া যায় শ্রীকাকুলাম ও বিশাখাপটনমে (৮৬নং চিত্র)।

(৬) অভ্র

অভ্র ভারতের একটি **গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ**। ইহার **উৎপাদন** সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে **প্রথম**। স্বভাবতঃ ইহার **রপ্তানি** সম্পর্কেও এদেশের স্থান **প্রথম**। সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ৭৫-৮৫% অভ্র পাওয়া যায় এদেশে। তাহার বেশীর ভাগ অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। বিমানপোত ও মোটরগাড়ির বিভিন্ন অংশ, বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, আলোর চিমনি, ছবি আঁকার পাত, কতক ঔষধ, রঙ প্রভৃতি তৈরীর জন্য অভ্র ব্যবহৃত হয়। এদেশে প্রতি বৎসর ১৪-২২ হাজার টন অভ্র উৎপন্ন হয়। ১৯৮১-৮২ খ্রীঃ এদেশে অভ্র উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩ হাজার টন।

বিহারের গয়া, হাজারিবাগ (কোডার্মা), গিরিডি ও মুঙ্গেরে পাওয়া যায় এদেশের বেশীর ভাগ অভ্র। রাজস্থানে ইহা পাওয়া যায় ভিলোয়ারা, জয়পুর ও আজমীরে। তাহাছাড়া অন্ধ্র প্রদেশের নেলোর, কর্ণাটকের হাসান, তামিলনাড়ুর নীলগিরি এবং কেরালাতেও কিছু অভ্র পাওয়া যায় (৮৬নং চিত্র)।

viii. *শিল্প সম্ভার*

ভারত অতি প্রাচীন কাল হইতে নানাপ্রকার শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। তবে তখন ছিল **ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের** যুগ। তখন এদেশের মসলিন, কেলিকো প্রভৃতি বস্ত্র বিদেশেও বিস্তর সমাদর লাভ করিয়াছিল। ক্রমশঃ এদেশ সহ পৃথিবীর সর্বত্র অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের স্থান অধিকার করিয়াছে **বৃহৎ শিল্প** (Large scale industries)। তবে পৃথিবীর আধুনিক শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত ভারতের কতক বিষয়ে পার্থক্য আছে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট সাধারণ-তন্ত্র, জাপান প্রভৃতি স্বাধীন দেশ নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে শিল্পের উন্নতির জন্য প্রচুর সুযোগ লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রায় ২০০ বৎসর পরাধীন থাকা কালে ভারতের সেই সুযোগ ছিল না। ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় হইতে এসকল বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিবার সুযোগ আসিয়াছে। গত ৪০ বৎসরে এদেশের এসকল বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতিও হইয়াছে। তবু এখনও অনেক কাজ বাকী।

বিভিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি কতকগুলি বিষয়ে **সুবিধা-সুযোগের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল**। যেমন, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বা কাঁচামাল (raw material), শক্তির উৎস (power resources or energy), শ্রমিক ও শ্রম-শক্তি (labour), যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা, জলবায়ু প্রভৃতি। এগুলিই বিভিন্ন শিল্পের **বুনিয়াদ** বা **ভিত্তি** বা **শিল্পকাঠামো** (infra-structure)। যে স্থানে কোন একটি শিল্প সম্পর্কে এসকল বিষয়ে সুবিধা খুব বেশী, তথায় ঐ **শিল্পের কেন্দ্রী-ভবন** (localisation) হয়। যেমন, আহমদাবাদ এদেশে কার্পাস বস্ত্র শিল্পের দ্বিতীয় কেন্দ্র। **বোম্বাই** এই শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র (industrial centre)। তারপর **জামসেদপুর** এদেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। আর কোথাও পাশাপাশি বহু শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিলে তাহা **শিল্পাঞ্চলে** (industrial zone) পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া হুগলি নদীর দুই পাশে

বিস্তৃত স্থানসমূহ **ভারতের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল**। এই অঞ্চল ভাগীরথী-হুগলির পূর্ব তীরে উত্তরে নৈহাটি হইতে দক্ষিণে বজবজ-বিড়লাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এই নদীর পশ্চিম তীরে উত্তরে ডানলপ ব্রিজ হইতে দক্ষিণে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সমগ্র অঞ্চল **কলিকাতা শিল্পাঞ্চল** বা **হুগলি (নদী) শিল্পাঞ্চল** নামে পরিচিত।

এদেশের শিল্পসমূহ তাহাদের প্রধান উপাদান অনুসারে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যেমন—কৃষিজ সম্পদ্ভিত্তিক শিল্প, খনিজ সম্পদ্ভিত্তিক শিল্প, উদ্ভিজ্জ সম্পদ্-ভিত্তিক শিল্প ও রাসায়নিক শিল্প। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির বিষয় (সিলেবাস অনু-সারে) নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

(১) লৌহ ও ইস্পাত এবং পূর্ত শিল্প

লৌহ ও ইস্পাতশিল্প এদেশের **সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ্ভিত্তিক শিল্প**। অতি প্রাচীন কালেও এদেশের লৌহ শিল্প ছিল বিশেষ উন্নত। তবে **আধুনিক শিল্পের** অর্থাৎ কয়লার চুল্লীর সাহায্যে লোহাকে গলাইয়া ইস্পাত তৈরীর সূত্রপাত হয় ২০০ বৎসরেরও আগে বীরভূম জেলাতে (সম্ভবতঃ ১৭৭৭ খ্রীঃ)। এদেশে এই শিল্পের **সর্বপ্রধান অঞ্চল** ছোটনাগপুর ও তাহার আশপাশ। অর্থাৎ বিহারের দক্ষিণ অংশ, উড়িষ্যার উত্তর অংশ, পশ্চিম-বঙ্গের পশ্চিম অংশ ও মধ্য প্রদেশের পূর্ব অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির পক্ষে সুবিধা সুযোগ বা **শিল্পের বুনিয়াদ** (infrastructure) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন, এই অঞ্চলের অন্তর্গত বিভিন্ন খনিতে পাওয়া যায় প্রচুর উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক (হেমাটাইট)। এই শিল্পের জন্য অত্যাবশ্যক কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট, চুনাপাথর প্রভৃতিও এখানে পাওয়া যায় প্রচুর। এখানে তাপবিদ্যুৎ শক্তি, নদীর জল এবং জলজ বিদ্যুৎ শক্তিও প্রচুর। এখানে স্থলপথ ও রেলপথে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত। শ্রমিক ও শ্রমশক্তি, মূলধন প্রভৃতি বিষয়েও এখানে প্রচুর সুবিধা পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে যে সকল জিনিস তৈরী হয় তাহাদের স্থানীয় চাহিদা (local market) খুব বেশী। এদেশের অন্যান্য অংশে এবং বিদেশেও ইহাদের চাহিদা খুব বেশী। চীন ও জাপানের ২/৩টি অঞ্চল ভিন্ন এশিয়া, আফ্রিকা ও ওশিয়ানিয়ার কোথাও এই শিল্পের এত উন্নত অঞ্চল নাই।

৮৭নং চিত্র।

বীরভূম জেলাতে কয়লার চুল্লীর সাহায্যে আধুনিক ইস্পাত শিল্পের প্রতিষ্ঠার প্রায় ১০০ বৎসর পরে (সম্ভবতঃ ১৮৭৪ খ্রীঃ) এদেশে এই শিল্পের আর এক ধাপ উন্নতি হয়। ঐ সময় পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জের পাশে **কুলটিতে** ব্লাস্ট ফারনেস জাতীয়

আধুনিক চুল্লীতে ইস্পাত তৈরী আরম্ভ হয়। তাহার প্রায় ৩৩ বৎসর পর (১৯০৭ খ্রীঃ) বিহারের **জামসেদপুরে** স্থাপিত হয় এদেশে **ইস্পাত শিল্পের বৃহত্তম কেন্দ্র।** ইহা সমগ্র এশিয়াতে এই শিল্পের তৃতীয় **বৃহত্তম কেন্দ্র।** এখানে এই শিল্পকেন্দ্র স্থাপন ও শিল্পের উন্নতির পক্ষে নিম্নলিখিত **সুবিধা** আছে। যেমন, লৌহ পাওয়া যায় পাশে উড়িষ্যার গুরুমহিষাণী, বোনাই, বাদাম পাহাড় প্রভৃতি খনিতে। বিহারে পাওয়া যায় নোয়ামুণ্ডি, গুয়া, বুদাবুরু প্রভৃতি খনিতে। পাশে ঝরিয়াতে পাওয়া যায় প্রচুর কয়লা। উড়িষ্যাতে পাওয়া যায় ম্যাঙ্গানিজ ও চুনাপাথর। সুবর্ণরেখা নদীতে পাওয়া যায় প্রচুর জল। তাহাছাড়া এখানে আছে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা। মূলধন, দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতি এখানে প্রচুর। জামসেদপুরের পর ক্রমশঃ পশ্চিমবঙ্গের **হীরাপুর** (১৯১৮ খ্রীঃ), **বার্নপুর** (১৯২৩ খ্রীঃ) ও মহীশূরের (বর্তমান কর্ণাটক) **ভদ্রাবতীতে** (১৯৩৬ খ্রীঃ) ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর এদেশের সকল বিষয়ে উন্নতির উদ্দেশ্যে ইস্পাতের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। এজন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক প্রকল্প হইতেই ইস্পাত তৈরীর বিভিন্ন কেন্দ্রে উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পে **সরকারী প্রচেষ্টায়** (Public sector) পশ্চিমবঙ্গের **দুর্গাপুর,** মধ্য প্রদেশের **ভিলাই** ও উড়িষ্যার **রৌরকেল্লাতে** ইস্পাত শিল্পের তিনটি বৃহৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পে বিহারের **বোকারোতে** একটি বৃহৎ ইস্পাত-শিল্পের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য যুক্ত রাজ্যের সহায়তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিহারের বোকারো এবং মধ্য প্রদেশের ভিলাই কেন্দ্রের জন্য পাওয়া গিয়াছে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের সকল রকম সাহায্য। আর উড়িষ্যার রৌরকেল্লার উন্নতি সম্পর্কে পশ্চিম জার্মানীর সাহায্যের বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এসকল কেন্দ্র এখন **স্টীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার** (SAIL) পরিচালনাধীন। ১৯৫০ খ্রীঃ এদেশে উৎপন্ন হইত প্রায় ১৭ লক্ষ টন লৌহপিণ্ড ও ১০·৪ লক্ষ টন খাঁটি ইস্পাত। ক্রমশঃ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এখন (১৯৮২-৮৩ খ্রীঃ) এদেশে লৌহপিণ্ড উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৯৬* লক্ষ টন ও খাঁটি ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৭৩ লক্ষ টন। এখন এদেশে লৌহপিণ্ড উৎপাদনের ক্ষমতা (capacity) প্রায় ১১৪ লক্ষ টন ও খাঁটি ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা প্রায় ৮৭ লক্ষ টন। তবে ১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৮২-৮৩ খ্রীঃ তুলনায় সামান্য কমিয়াছে। এদেশে **বিশেষ ধরনের ইস্পাতও** (alloy steel) তৈরী হইতেছে। কর্ণাটকের **ভদ্রাবতীতে** কেবল **সঙ্কর ইস্পাত** তৈরী হয়। এদেশে ইস্পাতের উৎপাদন আরও বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তামিলনাড়ুর **সালেমে** একটি নূতন কেন্দ্র তৈরী হইয়াছে ও উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধ্র প্রদেশের **বিশাখাপটনম্** (বালাচেরুভু) ইস্পাত-শিল্পের নূতন কেন্দ্র তৈরী হইতেছে। কর্ণাটকের **বিজয়নগরে** (হসপেটে) এবং উড়িষ্যার **দেওরীতে** নূতন কেন্দ্র তৈরীর জন্য ব্যবস্থা হইতেছে। এসকল বৃহৎ কেন্দ্র ভিন্ন এদেশে ১৭০টির বেশী **ক্ষুদ্র কেন্দ্রও** (mini steel plants) আছে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ১৫০টি কেন্দ্রে এখন যথেষ্ট পরিমাণ (১৯৮২-৮৩ খ্রীঃ ২০ লক্ষ টনের বেশী) ইস্পাত উৎপন্ন হইতেছে (৮৭নং চিত্র)।

* ১৯৮২-৮৩ খ্রীঃ জামসেদপুরে ১৯·৫ লক্ষ টন, ভিলাইতে ২১·৩ লক্ষ টন, দুর্গাপুরে ৯·৫ লক্ষ টন, রৌরকেল্লাতে ১১·৪ লক্ষ টন, বোকারোতে ১৮·৩ লক্ষ টন ও বার্নপুরে ৬·২ লক্ষ টন লৌহপিণ্ড উৎপন্ন হয়। ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ সকল কেন্দ্রেই উৎপাদন কমিয়াছে।

ইস্পাত শিল্পের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন শিল্প—পূর্ত (ইঞ্জিনিয়ারিং) শিল্প

এদেশের স্বাধীনতা লাভের পর হইতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ক্রমাগত উন্নতি হইতেছে। এই শিল্পের উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল **পূর্ত বা ইঞ্জিনিয়ারিং** শিল্পেরও তখন হইতে অসামান্য উন্নতি হইতেছে। তাহার ফলে এদেশে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় রেলগাড়ি (বগি) ও ইঞ্জিন, মোটরগাড়ি, বিমান-পোত, ট্রাক, বাস, লরি, জাহাজ, লঞ্চ, স্টীমার, বাই সাইকেল, মোটর সাইকেল প্রভৃতি এদেশের প্রয়োজন মত সবই এদেশে তৈরী হয়। তারপর কাপড়ের কল, পাট কল, চিনির কল, ছাপাখানা প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি এদেশেই তৈরী হয়। চাষ-আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় ট্র্যাক্টর, লাঙ্গল প্রভৃতিও এদেশেই সম্পূর্ণ পরিমাণে তৈরী হয়। তারপর রাস্তা-ঘাট তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় ভারী রোলার, বড় কারখানা ও বন্দর প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় নানারকম ক্রেন ইত্যাদি প্রায় সব রকম ভারী জিনিসও এদেশে তৈরী হয়। আর ছোট জিনিসের মধ্যে ব্লেড, পিন, পেরেক, তার, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি সবই এদেশে তৈরী হয়। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির মধ্যে ঘড়ি, ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার, রেডিও, টেলিভিশান যন্ত্র প্রভৃতিও এদেশেই তৈরী হয়। দেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতিও এদেশেই তৈরী হয়। দেশের প্রয়োজন মিটাইয়াও এসকল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে। এখন এদেশের সকল প্রকার রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে মূল্য হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের স্থান প্রথম। মূল্য হিসাবে দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১২½% হইল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য।

এদেশের পূর্ত বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সাধারণ ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত—ভারী পূর্ত (Heavy engineering) শিল্প বা ভারী যন্ত্রপাতি তৈরী সম্পর্কিত শিল্প এবং হাল্কা পূর্ত (Light engineering) শিল্প বা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি (delicate instruments) তৈরী সম্পর্কিত শিল্প। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

মোটরগাড়ি নির্মাণ (Automobile) শিল্প

এদেশে সর্বপ্রথম মোটরগাড়ি তৈরীর কেন্দ্র স্থাপিত হয় বোম্বাইয়ের নিকট মাতুঙ্গাতে (১৯৪১ খ্রীঃ)। তারপর পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার নিকট হিন্দুস্থান মোটর্সে (১৯৪৪ খ্রীঃ) স্থাপিত হয় **এশিয়ার বৃহত্তম** মোটরগাড়ি নির্মাণকেন্দ্র। এদেশে এই শিল্পের অন্যান্য কেন্দ্র হইল বোম্বাইয়ের নিকট সিউড়ি, মাদ্রাজে ও তাহার পাশে এন্নোর, বিহারের জামসেদপুর, উত্তর প্রদেশের কানপুর, মধ্য প্রদেশের জব্বলপুর প্রভৃতি। এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশে বাৎসরিক ১½ লক্ষের অধিক অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় ৯½ গুণের অধিক মোটরগাড়ি তৈরী হয়। তাহাছাড়া এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) প্রায় ৪·৪ লক্ষ মোটর সাইকেল, স্কুটার প্রভৃতি তৈরী হয়। অর্থাৎ এখন ইহাদের উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৫০ খ্রীঃ-র উৎপাদনের তুলনায় ২০ গুণের

বেশী। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে এক লক্ষের কম বাই সাইকেল তৈরী হইয়াছে। আর এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশে তৈরী হয় ৫৮ লক্ষ, অর্থাৎ ঐ সময়ের প্রায় ৬০ গুণ বাই সাইকেল।

রেলইঞ্জিন (Locomotive) নির্মাণ শিল্প

এদেশে সর্বপ্রথম রেলগাড়ির ইঞ্জিন তৈরী হয় **জামসেদপুরে** (১৯৪৩ খ্রীঃ)। তার পর স্থাপিত হয় বর্ধমান জেলার পশ্চিম সীমাতে **চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ** ওয়ার্কস (১৯৫০ খ্রীঃ)। এখানে পূর্বে বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরী হইত। ১৯৭১ খ্রীঃ পর্যন্ত এদেশে মোট ২৩৫০-এর অধিক বাষ্পীয় রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরী হইয়াছে। তাহার পর হইতে এই ইঞ্জিন তৈরী হয় না। ১৯৬০-৬১ খ্রীঃ হইতে এই কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক লোকো ইঞ্জিন, ডিজেল রেলওয়ে ইঞ্জিন ও ন্যারো গেজ ডিজেল ইঞ্জিন তৈরী হইতেছে। উত্তর প্রদেশের বারাণসীর **ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস** কেন্দ্রেও অনেক ডিজেল রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরী হইতেছে। ১৯৮৩ খ্রীঃ পর্যন্ত এদেশে মোট ৯৩০টির বেশী বৈদ্যুতিক রেলওয়ে ইঞ্জিন এবং ৫০০-এর বেশী ডিজেল রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরী হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে ডিজেল রেলওয়ে ইঞ্জিন ছিল মাত্র ১৭, আর এখন (১৯৮২-৮৩ খ্রীঃ) তাহাদের সংখ্যা হইয়াছে প্রায় ২৬৪০। তখন (১৯৫০-৫১ খ্রীঃ) এদেশে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে ইঞ্জিন ছিল মাত্র ৭২, আর এখন (১৯৮২-৮৩ খ্রীঃ) তাহাদের সংখ্যা ১১৫০ এর বেশী।

রেলগাড়ি (Coach, boggy) নির্মাণ শিল্প

এদেশে রেলগাড়ি তৈরীর সর্বপ্রধান কেন্দ্র **পেরাম্বুর** (মাদ্রাজ) **ইণ্টিগ্র্যাল কোচ** ফ্যাক্টরী। প্রথম পঞ্চবার্ষিক প্রকল্প অনুসারে এই কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের **খড়্গপুর** (মেদিনীপুর জেলা), **দমদম** (জেসপ এণ্ড কোং), **কাঁচড়াপাড়া** (এই দুইটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা), **সাঁতরাগাছি** (হাওড়া জেলা), কর্ণাটকের **ব্যাঙ্গালোর** প্রভৃতি স্থানেও এই শিল্পের কেন্দ্র আছে। এদেশে ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় ১৭,১৫০ রেলওয়ে ওয়াগন (মালগাড়ি) ও প্রায় ১৫,০০০ রেলওয়ে কোচ বা বগি (রেলগাড়ি) তৈরী হইয়াছে।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প

বহু প্রাচীন কাল হইতে এদেশে কাঠের সাহায্যে নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি তৈরী হইতেছে। এদেশে বাষ্পচালিত জাহাজ তৈরীর প্রথম কেন্দ্র স্থাপিত হয় **বিশাখাপটনমে** (১৯৪১ খ্রীঃ)। পরে (১৯৫২ খ্রীঃ) ইহা সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এখানে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়ে সুযোগগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন, এই অঞ্চল ঝড় হইতে সুরক্ষিত। এখানে সমুদ্র সুগভীর। এখানে কাঠ, কয়লা, ইস্পাত প্রভৃতি সংগ্রহের সুবিধা খুব বেশী। এই কেন্দ্রে প্রতি বৎসর তিনটি জাহাজ প্রায় সম্পূর্ণরূপে তৈরী হয়। ভবিষ্যতে প্রতি বৎসর ৬/৭টি জাহাজ তৈরীর জন্য ব্যবস্থা হইতেছে। কেরালার **কোচিনের** পাশে **পেরুমানুর** এদেশে এই শিল্পের দ্বিতীয় কেন্দ্র। বিশাখাপটনম্ কেন্দ্রে তৈরী জাহাজের চেয়ে বড় দুইটি জাহাজও এখানে তৈরী হইয়াছে। **বোম্বাই** (মাঝগাঁও ডক), **কলিকাতা**

(গার্ডেনরীচ) এদেশে এই শিল্পের অন্যান্য কেন্দ্র। **মাঝগাঁও ডকে** দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নানারকম জাহাজ তৈরী হয়। গোয়াতে ও কলিকাতার **গার্ডেনরীচে** জাহাজ মেরামত ও ছোট জাহাজ, স্টীমার প্রভৃতি তৈরী হয়। উড়িষ্যার পারাদীপেও জাহাজ তৈরীর ব্যবস্থা হইতেছে। এদেশে জাহাজ তৈরী সম্পর্কে ক্রমশঃ উন্নতির ফলে ১৯৫১ খ্রীঃ তুলনায় এখন এদেশের নৌপথে পরিবহন ক্ষমতা ৩০ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিমানপোত (Aircraft) নির্মাণ শিল্প

এদেশে বিমানপোত তৈরীর সর্বপ্রধান কেন্দ্র **ব্যাঙ্গালোর**। ১৯৪০ খ্রীঃ এই কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এখানে যাত্রীবাহী এবং দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জঙ্গী বিমান ও জেট বিমানপোত তৈরী হয়। এদেশে বিমানপোত তৈরীর অন্যান্য কেন্দ্র উত্তর প্রদেশের **কানপুর**, অন্ধ্র প্রদেশের **হায়দরাবাদ**, মহারাষ্ট্রের **নাসিক** ও উড়িষ্যার **কোরাপুট**।

যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প

বর্তমানে এদেশে বড় বড় সেতু, রেলপথ প্রভৃতি তৈরীর সরঞ্জাম এবং কৃষিকার্য, খনিজ কাজ, বস্ত্র শিল্প, ছাপাখানা, চিনি শিল্প, চা শিল্প প্রভৃতি যাবতীয় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এদেশেই তৈরী হয়। এগুলি সাধারণতঃ ভারী যন্ত্রপাতির (Heavy engineering) অন্তর্ভুক্ত। তাহাছাড়া নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি, ঘড়ি, দূরদর্শন (Television যন্ত্র), ক্যামেরা, রেডিও, টাইপরাইটার প্রভৃতি অসংখ্য রকম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এদেশেই তৈরী হয়। নানা-প্রকার শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতি তৈরী হয় বিহারের **হাতিয়াতে** (রাঁচির নিকট), **জামসেদপুরে**, উত্তর প্রদেশের **নৈনিতে** (এলাহাবাদের পাশে) এবং অন্ধ্র প্রদেশের **বিশাখাপটনমে**। ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরী হয় মধ্য প্রদেশের **ভূপালে**, অন্ধ্র প্রদেশের **রামচন্দ্রপুরমে**, তামিলনাড়ুর **তিরুচিরাপল্লীতে** ও উত্তর প্রদেশের **হরিদ্বারে**। খনির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী হয় পশ্চিমবঙ্গের **দুর্গাপুরে**। কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী হয় হরিয়ানার **পিঞ্জোরে**। এগুলি ভিন্ন উত্তর প্রদেশের **কানপুরে**, **আলিগড়ে**, **বানারসে**, মহারাষ্ট্রের **শোলাপুরে**, **পুণেতে**, **বোম্বাইতে**, নাগপুরে, পঞ্জাবের **অমৃতসরে**, কর্ণাটকের **ব্যাঙ্গালোরে**, কেরালার **কমলাসেরিতে** এবং এরূপ আরও অনেক কেন্দ্রে নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। এদেশে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরীর কেন্দ্র অসংখ্য। তাহাদের মধ্যে রাজস্থানের **কোটার** ও পশ্চিমবঙ্গের **যাবদপুরের** সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরীর কেন্দ্র বিখ্যাত। তাহাছাড়া বিহারের **গিডনির** চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, কর্ণাটকের **ব্যাঙ্গালোরের** এবং জম্মু ও কাশ্মীরের **শ্রীনগরের** ঘড়ি নির্মাণ কেন্দ্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ছোট-খাট যন্ত্রপাতির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের **কলিকাতা** ও **হাওড়ার** সেলাই কল, বিভিন্ন ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, **আসানসোলের** বাই সাইকেল তৈরীর কেন্দ্র প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ

পশ্চিমবঙ্গের **রূপনারায়ণপুরে** ও কর্ণাটকের **ব্যাঙ্গালোরে** টেলিফোনের কেবল তৈরী হয়। **দিল্লী**, মধ্য প্রদেশের **ভূপাল**, উত্তর প্রদেশের **হরিদ্বার**, অন্ধ্র প্রদেশের

হায়দরাবাদ, তামিলনাড়ুর **তিরুচিরাপল্লী** প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। এসকল কেন্দ্রে ১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) কোন কোন ক্ষেত্রে ৪০০ গুণের বেশী যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। এদেশে রেডিও, টেলিভিশান যন্ত্র প্রভৃতির উৎপাদন যে হারে বাড়িতেছে তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

(২) কার্পাস বস্ত্র শিল্প

ইহা এদেশের **সর্বপ্রধান কৃষিজ সম্পদ ভিত্তিক** (Agro-based) **শিল্প**। দেশের সকল প্রকার **বৃহৎ শিল্পের** (Large scale industries) **মধ্যেও ইহাই সর্বপ্রধান**। অতি প্রাচীন কালে যখন এদেশের কার্পাস বস্ত্র শিল্প ছিল সম্পূর্ণ রূপে কুটীর শিল্প, তখন হইতেই এদেশের কার্পাস বস্ত্র শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের কতক উৎকৃষ্ট বস্ত্র, যেমন, পশ্চিম উপকূলের কালিকটের কেলিকো, ঢাকার মসলিন প্রভৃতি প্রাচীন কালেও বিদেশে রপ্তানি হইত। এখনও (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশ হইতে এত বেশী বস্ত্র, জামা, কাপড় প্রভৃতি রপ্তানি হয় যে তাহার মূল্য এদেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১০%।

এদেশে **সর্বপ্রথম কাপড়ের কল** তৈরী হয় কলিকাতার পাশে ফোর্ট গ্লস্টার বা ঘুষুড়িতে (সম্ভবতঃ ১৮১৮ খ্রীঃ)। ক্রমশঃ দেশের ৮০টির অধিক শহর, নগর, বন্দরে কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা ৯২০। তাহাদের মধ্যে ৬৪০টিতে **সুতা কাটার** (Spinning) কাজ হয় এবং ২৮০টিতে **সুতা কাটা ও কাপড় বোনা** (Spinning and weaving mill) দুই কাজই হয়। এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এসকল কলে তৈরী হয় ১৩৩ কোটি কেজি সুতা। আর ১৯৫০ খ্রীঃ এদেশের কলে কাটা হইয়াছে মাত্র ৫৩ কোটি কেজি সুতা। কাজেই এখনকার উৎপাদন ঐ সময়ের ২½ গুণ। তারপর এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) এদেশের কাপড়ের কলগুলিতে (cotton mill) প্রায় ৩৫১ কোটি মিটার কাপড় তৈরী হয়। তাহাছাড়া এখন (১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ) মিলের সুতা ও হাতে কাটা সুতার সাহায্যে কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে এদেশের নানা স্থানে তাঁতে তৈরী হয় প্রায় ৬৫৩ কোটি মিটার বস্ত্র। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে তাঁতে তৈরী হইয়াছিল মাত্র প্রায় ৮০ কোটি মিঃ বস্ত্র। এখন এদেশে কাপড়ের কল ও তাঁতে মোট বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ ১০০০ কোটি মিটারের বেশী, অর্থাৎ **পৃথিবীতে প্রথম**। ১৯৫০ খ্রীঃ এদেশে মোট বস্ত্র উৎপাদনের তুলনায় এখনকার উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ।

কার্পাস বস্ত্র শিল্পের প্রধান অঞ্চল

এদেশের নানা স্থানে কাপড়ের কল আছে। তাহাদের মধ্যে **পাঁচটি অঞ্চল** বিখ্যাত।

(ক) **পশ্চিম অঞ্চল**—ভারতের পশ্চিম অংশে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র এদেশের কার্পাস বস্ত্র শিল্পের **সর্বপ্রধান অঞ্চল**। এখানে এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সুবিধা বর্তমান। যেমন, এখানে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হয় ও এখানকার জলবায়ু আর্দ্র। দক্ষ শ্রমিক, প্রচুর মূলধন. উত্তম যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা, সকলই এখানে সুলভ। তাহাছাড়া এখানে যন্ত্রপাতি সহজে পাওয়া যায়। আর এখানকার কলে তৈরী সুতা ও বস্ত্র এখানেই বিক্রয়ের সুবিধাও খুব বেশী। এখানে কাপড়ের কলের সংখ্যা প্রায় ২২০। দক্ষিণ অঞ্চলের চেয়ে কিছু কম কিন্তু এই অঞ্চলে

বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ এদেশের মধ্যে **সবচেয়ে বেশী**। মহারাষ্ট্রের **বোম্বাই** এদেশের বস্ত্র শিল্পের **সর্বপ্রধান কেন্দ্র**। এই রাজ্যের অন্যান্য কেন্দ্র নাগপুর, পুণে, শোলাপুর, ওয়ার্ধা প্রভৃতি। গুজরাটে কাপড়ের কলের সংখ্যা এদেশের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয়। তবে এই রাজ্যের **আহমদাবাদ** এদেশে বস্ত্র শিল্পের **দ্বিতীয় কেন্দ্র**। এই রাজ্যের অন্যান্য কেন্দ্র ভাদোদারা (বরোদা), ভাবনগর, রাজকোট প্রভৃতি। (খ) **দক্ষিণ ভারত অঞ্চল**—ভারতের দক্ষিণ অংশের তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও কেরালা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার কাপড়ের কলের সংখ্যা (প্রায় ২৭৫) এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। তবে এখানে এই শিল্পের সুযোগ ও বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ এদেশের মধ্যে দ্বিতীয়, অর্থাৎ পশ্চিম অঞ্চলের পরে। এখানকার **তামিলনাড়ুর** কাপড়ের কলের সংখ্যা (প্রায় ২১৫) ভারতের মধ্যে **প্রথম**। আর এই রাজ্যের সর্বপ্রধান ও সমগ্র দেশের মধ্যে কার্পাস বস্ত্র শিল্পের তৃতীয় কেন্দ্র **কোয়েম্বাটুর**। এই রাজ্যের অন্যান্য কেন্দ্র মাদ্রাজ, মাদুরাই প্রভৃতি। কর্ণাটকের ব্যাংগালোর, কেরালার ত্রিবান্দ্রম্ প্রভৃতি কেন্দ্রও প্রসিদ্ধ। (গ) **মধ্য প্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশ অঞ্চল**—এখানকার কাপড়ের কলের সংখ্যা (৫৫) এদেশের অঞ্চলগুলির মধ্যে তৃতীয়। মধ্য প্রদেশের গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভূপাল এবং অন্ধ্র প্রদেশের হায়দরাবাদ, বিশাখাপটনম্ প্রভৃতি এই শিল্পের কেন্দ্র। (ঘ) **দিল্লী ও উত্তর প্রদেশ অঞ্চল**—এখানকার কাপড়ের কলের সংখ্যা এদেশের পশ্চিম অঞ্চল, দক্ষিণ অঞ্চল এবং মধ্য প্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশ অঞ্চলের পরে। মধ্য প্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান প্রভৃতির অপেক্ষাকৃত শুষ্ক জলবায়ু বস্ত্র শিল্পের পক্ষে একটি প্রধান অসুবিধা। দিল্লী, কানপুর, আলিগড়, বানারস প্রভৃতি এই অঞ্চলের কার্পাস বস্ত্র শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। (ঙ) **পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল**—এখানকার কাপড়ের কলের সংখ্যা প্রায় ৪০। কার্পাস তুলার অভাব এই অঞ্চলে এই শিল্পের উন্নতির পক্ষে একটি প্রধান অসুবিধা। এখানে তুলা ও সুতা দুইই আমদানি করা হয়। হুগলি (নদী) শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত শ্যামনগর, পানিহাটি, সোদপুর, বেলঘরিয়া, শ্রীরামপুর, মৌরিগ্রাম, ফলতা প্রভৃতি এই অঞ্চলে এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র (৮৮নং চিত্র)।

(৩) *পাট শিল্প*

ইহা এদেশের দ্বিতীয় কৃষিজ সম্পদ্‌ভিত্তিক শিল্প। অর্থাৎ এদেশের কার্পাস-বস্ত্র শিল্পের পরেই ইহার স্থান। এদেশের **রপ্তানি বাণিজ্য** সম্পর্কে এই শিল্পের গুরুত্ব বহুদিন ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। অতি প্রাচীন কালে এদেশে পাট শিল্প ছিল কুটীর শিল্প। তারপর এদেশে **প্রথম পাট কল** স্থাপিত হয় কলিকাতার পাশে রিষড়াতে (সম্ভবতঃ ১৮৫৯ খ্রীঃ)। আর প্রথম বিদ্যুৎচালিত পাট কল তৈরী হয় ইহার পরে কলিকাতার উত্তর অংশে বরাহনগরে। ক্রমশঃ এদেশে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পাট শিল্পেরও উন্নতি হইতে থাকে। এদেশে তৈরী পাটের জিনিসের চাহিদাও বিদেশে বাড়িতে থাকে। ফলে, এদেশ হইতে তাহাদের রপ্তানির সুযোগও বৃদ্ধি হয়। এসকল কারণে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ এদেশে পাট কলের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০৬। স্বভাবতঃ তখন **পাট শিল্পে** এদেশের স্থান ছিল **পৃথিবীতে প্রথম**। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত **কলিকাতা শিল্পাঞ্চল** বা **হুগলি** (নদী) **শিল্পাঞ্চল** অর্থাৎ ভাগীরথী-হুগলি নদীর উভয় তীর সমগ্র পৃথিবীতে **পাট শিল্পের সর্বপ্রধান অঞ্চল**। এখানে এই শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে অনেক **সুবিধা**

আছে। এখানকার পাট কলগুলির চাহিদা মিটাইবার মত পাট এখন প্রায় সম্পূর্ণ রূপে এদেশেই জন্মে। তাহার অর্ধেক জন্মে পশ্চিমবঙ্গে, বাকী অর্ধেক জন্মে আশপাশের রাজ্যগুলিতে। খুব সামান্য পাটই বাংলাদেশ হইতে আমদানি করা হয়। এখানকার আর্দ্র জলবায়ু পাট শিল্পের পক্ষে বিশেষ উপকারী। তাহাছাড়া এখানে প্রচুর দক্ষ শ্রমিক ও মূলধন পাওয়া যায়। এখানকার যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত। এখানকার কলে যে পরিমাণ চট, থলে, ক্যানভাস, দড়ি প্রভৃতি তৈরী হয় তাহাদের জন্য যথেষ্ট স্থানীয় চাহিদা আছে। আর এখান হইতে রপ্তানিরও সুযোগ আছে।
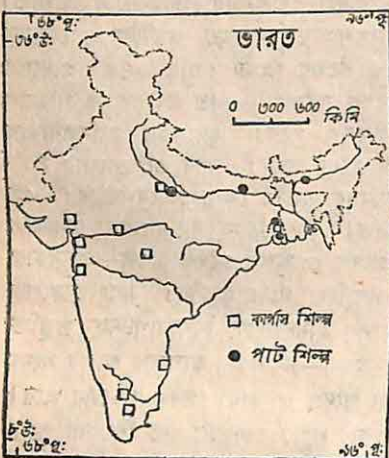
৮৮নং চিত্র।

তারপর ১৯৪৭ খ্রীঃ **দেশ বিভাগের ফলে** পাট চাষের অধিকাংশ জমি চলিয়া যায় তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে)। ফলে, তখন এদেশে, প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হইত মাত্র ৩০-৩২ লক্ষ গাঁট বা বেল পাট। তাহার পর ১৯৫১ খ্রীঃও এদেশে উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র ৪০-৪১ লক্ষ বেল পাট ও মেস্তা। কাজেই তখন এদেশে **পাট শিল্পের** উৎপাদনের **পরিমাণও** ছিল অনেক কম (৮·৪ লক্ষ টন)। ক্রমশঃ এদেশে মেস্তা ও পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং পাট শিল্পেরও উন্নতি হইতে থাকে। ফলে, এখন (১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ) এদেশে পাট শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৩·৭ লক্ষ টন অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে এসকল জিনিস উৎপাদনের তুলনায় ৬৫%-এর অধিক।

আগে এদেশের **রপ্তানি বাণিজ্য** সম্পর্কে পাটের তৈরী চট, থলে প্রভৃতির স্থান ছিল **অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ**, কখন কখন সর্বপ্রথম। এজন্যই বহু দিন এদেশে **পাট শিল্পেরও উন্নতি** ছিল খুব বেশী। অথচ কিছুকাল যাবৎ নানা কারণে* বিদেশে এদেশের পাটের চট ও থলের ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে এবং এদেশ হইতে ইহাদের রপ্তানির পরিমাণ কমিতেছে। যেমন ১৯৮১-৮২ খ্রীঃ এদেশ হইতে প্রায় ২৫৭·৫ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে। মাত্র দুই বৎসর পরে ১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ আরও অনেক কম টাকার (মাত্র ১৬৪·৫ কোটি টাকার) পাটজাত দ্রব্য এদেশ হইতে রপ্তানি হইয়াছে। তাহার ফলে এদেশে **পাট শিল্পেরও** ভয়ানক **ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে।** তাই এদেশের পাট কলে পাটের চাহিদা ক্রমশঃ কমিতেছে। ফলে, বাজারে পাটের দামও কমিতেছে। এজন্য অনেক পাট চাষের জমিতে মাঝে মাঝে **পাটের পরিবর্তে আউস ধান** পাট চাষের সময়েই উৎপন্ন হইতেছে।

* বাংলাদেশ ও অন্যান্য কতক দেশে তৈরী চট, থলে প্রভৃতির চাহিদা অনেক ক্ষেত্রে ভারতের পাট কলে তৈরী জিনিসের তুলনায় বেশী। তাহাছাড়া অনেক জিনিস পাটের থলের পরিবর্তে কাগজের বা অন্য উপাদানের তৈরী থলেতে রাখা হয়। বহু জিনিস রাখার জন্য কোন থলেই ব্যবহার করা হয় না। মালগাড়িতে বা জাহাজের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে শস্যাদি ঢালিয়াই রাখা হয়।

তবে এদেশে পাট শিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্যে চট ও থলের পরিবর্তে পাটের কার্পেট, ম্যাটিং, ত্রিপল, দড়ি, কম্বল প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা হইতেছে। অন্যান্য উপায়েও এই শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা হইতেছে।

কলিকাতার আশপাশ বা হুগলি (নদী) **শিল্পাঞ্চলের** অন্তর্গত বরাহনগর, আগরপাড়া, নৈহাটি, জগদ্দল, রিষড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটি, বজবজ, উলুবেরিয়া প্রভৃতি এখানকার প্রধান কেন্দ্র। বিহারের কাটিহার, উত্তর প্রদেশের কানপুর, সাজনওয়া, অন্ধ্র প্রদেশের চিতভালসা, নেলিমরলা, ত্রিপুরার অরুন্ধতী (আগরতলা) প্রভৃতি এই শিল্পের অন্যান্য কেন্দ্র (৮৮নং চিত্র)।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। সূর্য কি? ইহার আকৃতি কিরূপ? পৃথিবীর তুলনায় ইহার আয়তন কিরূপ? ইহার উপরিভাগের উত্তাপের পরিমাণ কিরূপ? ২। সৌরমণ্ডল কাহাদিগকে লইয়া গঠিত? বুধ, শুক্র প্রভৃতিকে গ্রহ বলার কারণ কি? ৩। সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত গ্রহগণের নাম সূর্য হইতে ইহাদের দূরত্ব অনুসারে পর পর লিখ। আয়তন অনুসারে গ্রহগণের নাম পর পর লিখ। ৪। চন্দ্র কি? ইহা কতদিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে? চন্দ্রে উদ্ভিদ্ ও জীব-জন্তু নাই কেন? ৫। পৃথিবীর আকৃতি কিরূপ? এবিষয়ে নির্ভুল প্রমাণ কি? পৃথিবীর ব্যাসের আয়তন কত?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। পৃথিবীর গতি কয়টি? ইহার আবর্তন গতি কাহাকে বলে? এই গতির প্রমাণ কি? ২। পৃথিবীর আবর্তন গতির প্রভাব উল্লেখ কর। ৩। পৃথিবীর পরি-ক্রমণ গতি কাহাকে বলে? এই গতির প্রমাণ কি? ৪। সূর্যের আপাত গতি অনু-সারে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দ্বারা কি বুঝায়? ৫। ভূপৃষ্ঠ কয়টি আলোকমণ্ডলে বিভক্ত? ঐ মণ্ডলগুলির নাম ও সীমা বল। ৬। নিশীথ সূর্যের দেশ ও সুমেরু-প্রভা বলিলে কি বুঝ? ৭। সংক্ষেপে বুঝাইয়া বল—জলবিষুব, মহাবিষুব, উত্তর আয়নান্ত দিবস। ৮। ভূপৃষ্ঠে কিভাবে ঋতু পরিবর্তন হয় সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

১। ভূপৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থিতি নির্দেশ করিবার জন্য কোন্ কোন্ নির্দিষ্ট রেখার সাহায্য অত্যাবশ্যক? ২। নিরক্ষরেখা কাহাকে বলে? অক্ষরেখা বা সমাক্ষরেখা কাহাকে বলে? প্রধান দ্রাঘিমারেখা কাহাকে বলে? ৩। কোন স্থানের অক্ষাংশ কিভাবে স্থির করা হয়? অক্ষরেখা ও অক্ষাংশের মধ্যে কোন প্রকার সম্পর্ক লক্ষ্য কর কি? ৪। কোন স্থানের দেশান্তর কিভাবে স্থির করা হয়? দেশান্তর ও দ্রাঘিমারেখার মধ্যে সম্পর্ক কি? ৫। অক্ষাংশ ও দেশান্তর কিভাবে গণনা করা হয়? ইহাদের গণনা সম্পর্কে কি পার্থক্য লক্ষ্য কর? ৬। দেশান্তরের সহিত কোন স্থানের স্থানীয় সময়ের সম্পর্ক কি? ৭। I.S.T. ও G.M.T. বলিলে কি বুঝায়? ৮। আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কিভাবে স্থির করা হইয়াছে? ৯। কোন স্থানের প্রতি-পাদস্থান কিভাবে স্থির করা হয়?

দেশান্তর ও স্থানীয় সময় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন

১। পৃথিবীর কোন্ গতিবশতঃ ভূপৃষ্ঠে স্থানীয় সময়ের পরিবর্তন হয়? ২। যে-কোন দুইটি দেশান্তরের মধ্যে পশ্চিমদিকের দেশান্তরের তুলনায় পূর্বদিকে স্থানীয় সময় অগ্রবর্তী বা অধিক হওয়ার কারণ কি? ৩। কি হারে এই পরিবর্তন হয়? ৪। হার এরূপ হওয়ার কারণ কি? ৫। ভারতের পশ্চিম সীমান্তের (প্রায় ৬৮°৭′ পূঃ দ্রাঃ) তুলনায় পূর্ব সীমান্তের (প্রায় ৯৭°২৫′ পূঃ দ্রাঃ) স্থানীয় সময়ের পার্থক্য মোটামুটি হিসাবে কত ঘণ্টা? ৬। এদেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে স্থানীয় সময়ের হিসাব সম্বন্ধে পার্থক্যের ফলে কাজের যে সকল অসুবিধা হইতে পারে তাহা দূর করিবার জন্য কি ব্যবস্থা হইয়াছে? ৭। কোন্ দেশান্তর অনুসারে তাহা স্থির হইয়াছে? ৮। ঐ স্থানের (৮২½° পূঃ দ্রাঃ) স্থানীয় সময়ের তুলনায় কলিকাতার (৮৮½° পূঃ দ্রাঃ) স্থানীয় সময় কত অগ্রগামী বা বেশী বা কম?

৯। গ্রীনিচ প্রমাণ সময় (০° দ্রাঃ) তুলনায় কলিকাতার (৮৮½° পূঃ দ্রাঃ) স্থানীয় সময় কত অগ্রগামী বা বেশী? [৮৮½×৪মি=৩৫৪মি বা ৫ঘ ৫৪ মি বেশী।]

১০। লণ্ডনে (০° দ্রাঃ) দিবা ১০টার সময় ১৯৮৩ প্রুডেন্সিয়াল কাপের ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহা দূরদর্শনে কলিকাতাতে স্থানীয় সময় অনুসারে কখন দেখা গিয়াছিল? [দিবা ১০ঘ+৫ঘ ৫৪মি অর্থাৎ দিবা ৩টা ৫৪মি সময়ে।]

১১। লণ্ডনের ঐ খেলার ধারাবিবরণী দিল্লীতে (৭৭° পূঃ দ্রাঃ) স্থানীয় সময় অনুসারে কখন শুনা গিয়াছিল? [দিল্লীর স্থানীয় সময় লণ্ডনের (০° দ্রাঃ) সময়ের তুলনায় ৭৭°×৪মি বা ৩০৮মি বা ৫ঘ ৮মি বেশী। কাজেই দিল্লীর স্থানীয় সময় অনুসারে দিবা ১০ঘ+৫ঘ ৮মি অর্থাৎ ৩টা ৮মি (3. 8p.m.) সময়ে তাহা দিল্লীতে শুনা গিয়াছিল।]

১২। স্পেনদেশের মাদ্রিদে (৪° পঃ দ্রাঃ) ১৯৮২-বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা বেলা ৫টায় (5 p.m.) আরম্ভ হয়। দূরদর্শনে তাহা কলিকাতাতে (৮৮½° পূঃ দ্রাঃ) কখন দেখা গিয়াছিল? [মাদ্রিদের (৪° পঃ দ্রাঃ) তুলনায় কলিকাতা ৪+৮৮½=৯২½° পূর্বদিকে অবস্থিত। কাজেই কলিকাতার স্থানীয় সময় মাদ্রিদের স্থানীয় সময়ের তুলনায় ৯২½×৪ মি বা ৩৭০ মি বা ৬ ঘ ১০ মি অগ্রগামী বা বেশী। এজন্য কলিকাতার স্থানীয় সময় অনুসারে বৈকাল ৫ ঘ+৬ ঘ ১০ মি অর্থাৎ রাত্রি ১১ ঘ ১০ মি (11.10 p.m.) সময়ে কলিকাতাতে খেলা দেখা গিয়াছিল।]

১৩। ভারতের প্রমাণ সময় যখন দুপুর ১২টা (12 noon I.S.T.), তখন গ্রীনিচের প্রমাণ সময় (G.M.T.) কত? [ভারতের প্রমাণ সময় ৮২½° পূঃ দ্রাঃ অনুসারে স্থির হয়, আর গ্রীনিচ প্রমাণ সময় ০° দ্রাঃ অনুসারে স্থির হয়। কাজেই ৮২½° পূঃ দ্রাঃ তুলনায় গ্রীনিচ ৮২½° দ্রাঃ পশ্চিমে অবস্থিত এবং তথাকার স্থানীয় সময় ৮২½°×৪ মি বা ৩৩০ মিঃ অর্থাৎ ৫ঘ ৩০ মি পশ্চাৎগামী বা কম। এজন্য I.S.T. দিবা ১২টার সময় G.M.T. ১২ ঘ—৫ঘ ৩০ মি বা সেদিনের সকাল ৬.৩০ মি (6.30 a.m.)।]

১৪। পাটনাতে (৮৫°১০′ পূঃ দ্রাঃ) যখন স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা, তখন টোকিওর (১৩৯°৪৫′ পূঃ দ্রাঃ) স্থানীয় সময় কত? [পাটনা (৮৫°১০′ পূঃ দ্রাঃ) হইতে টোকিও (১৩৯°৪৫′ পূঃ দ্রাঃ) ৫৪°৩৫′ পূর্বদিকে (১৩৯°৪৫′—৮৫°১০′) অবস্থিত। প্রতি ডিগ্রি দেশান্তরে স্থানীয় সময় ৪ মিনিট হিসাবে এবং প্রতি মিনিট দেশান্তরে স্থানীয় সময় ৪ সেকেণ্ড হিসাবে পূর্বদিকে অগ্রগামী বা বেশী ও পশ্চিমে পশ্চাৎগামী বা কম। কাজেই পাটনার স্থানীয় সময়ের তুলনায় টোকিওর স্থানীয় সময় ৫৪×৪ মি+৩৫×৪ সে অর্থাৎ ২১৬ মি+১৪০ সে অর্থাৎ ২১৬ মি+২ মি ২০ সে=২১৮ মি ২০ সে বা ৩ ঘ ৩৮ মি ২০ সে অগ্রগামী বা বেশী। কাজেই পাটনার স্থানীয় সময় যখন দুপুর ১২টা (12 noon) তখন টোকিওর স্থানীয় সময় অপরাহ্ন ৩টা ৩৮ মি ২০ সে (p.m.)।]

১৫। জামাইকার কিংসটনে (প্রায় ৭৭° পঃ দ্রাঃ) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সহিত ভারতের ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হইয়াছে তথাকার স্থানীয় সময় সকাল ১০টায়। রেডিওর মারফত খেলার ধারাবিবরণী কখন লণ্ডনে (০° দ্রাঃ) শুনা গিয়াছে? কিংসটন হইতে লণ্ডন ৭৭°

পূর্বে। কাজেই লণ্ডনের স্থানীয় সময় কিংসটনের স্থানীয় সময়ের তুলনায় ৭৭×৪ মি= ৩০৮ মি বা ৫ ঘ ৮ মি অগ্রগামী বা বেশী। অর্থাৎ কিংসটনে যখন সকাল ১০ টা তখন লণ্ডনের স্থানীয় সময় ১০ ঘ+৫ ঘ ৮ মি বা অপরাহ্ন ৩টা ৮ মি (p.m.)।

১৬। কিংসটনের ঐ খেলার ধারাবিবরণী কলিকাতাতে (৮৮২৳° পূঃ দ্রাঃ) কখন স্থানীয় সময় অনুসারে শুনা গিয়াছে? [কিংসটনের ৭৭° দ্রাঃ পূর্বদিকে গ্রীনিচ এবং তথা হইতে ৮৮২৳° দ্রাঃ পূর্বদিকে কলিকাতা। অর্থাৎ কিংসটনের (৭৭+৮৮২৳°) বা **১৬৫২৳°** পূর্বদিকে কলিকাতা। কাজেই কলিকাতার স্থানীয় সময় কিংসটনের স্থানীয় সময়ের চেয়ে ১৬৫২৳×৪ মি বা ৬৬২ মি বা ১১ ঘ ২ মি অগ্রগামী বা বেশী। এজন্য কিংসটনের স্থানীয় সময় যখন বেলা ১০টা, তখন কলিকাতার স্থানীয় সময় ১০ ঘ+১১ ঘ ২ মি বা ২১ ঘ ২ মি অর্থাৎ রাত্রি ৯টা ২ মি (p.m.)।]

১৭। কলিকাতা (৮৮২৳° পূঃ দ্রাঃ) হইতে ঢাকা (৯০২৳° পূঃ দ্রাঃ), টোকিও (১৩৯°৪৫′ পূঃ দ্রাঃ) ও নিউ ইয়র্কে (৭৪° পঃ দ্রাঃ) সকাল ১০টায় একই সময়ে তিনটি টেলিগ্রাম পাঠান হইল। প্রত্যেক স্থানে ঠিক ১৫ মিনিট সময়ে টেলিগ্রাম পৌঁছিল। তখন কোন্ স্থানের স্থানীয় সময় কত? [(i) কলিকাতা (৮৮২৳° পূঃ দ্রাঃ) হইতে ঢাকা (৯০২৳° পূঃ দ্রাঃ) মাত্র ২° দ্রাঃ পূর্বদিকে। কাজেই কলিকাতার স্থানীয় সময়ের চেয়ে ঢাকার স্থানীয় সময় ২×৪=৮ মি অগ্রগামী বা বেশী। এজন্য কলিকাতাতে যখন সকাল ১০টা, তখন ঢাকার স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৮ মি (10.8 a.m.)।] [(ii) কলিকাতা (৮৮২৳° পূঃ দ্রাঃ) হইতে টোকিও (১৩৯°৪৫′ পূঃ দ্রাঃ) ৫১°১৫′ পূর্বদিকে। কাজেই কলিকাতার স্থানীয় সময়ের চেয়ে টোকিওর স্থানীয় সময় ৫১×৪ মি+১৫×৪ সে বা ২০৪ মি+১ মি বা ২০৫ মি বা ৩ ঘ ২৫ মি অগ্রগামী বা বেশী। এজন্য কলিকাতাতে যখন সকাল ১০টা, তখন টোকিওর স্থানীয় সময় ১০ ঘ+৩ ঘ ২৫ মি বা ১৩ ঘ ২৫ মি বা দুপুর ১টা ২৫ মি (1.25 p.m.)।] [(iii) কলিকাতা (৮৮২৳° পূঃ দ্রাঃ) হইতে নিউ ইয়র্ক (৭৪° পঃ দ্রাঃ) ৮৮২৳°+৭৪° বা ১৬২২৳° পশ্চিমে। কাজেই কলিকাতার স্থানীয় সময়ের চেয়ে নিউ ইয়র্কের স্থানীয় সময় ১৬২২৳°×৪ মি বা ৬৫০ মি বা ১০ ঘ ৫০ মি পশ্চাৎ-গামী বা কম। অতএব কলিকাতাতে যখন কোন দিন সকাল ১০টা তখন নিউ ইয়র্কের স্থানীয় সময় সকাল ১০ ঘ−১০ ঘ ৫০ মি, অর্থাৎ পূর্বদিনের রাত্রি ১১ ঘ ১০ মি (p.m.)।] প্রত্যেক ক্ষেত্রে টেলিগ্রাম পৌঁছিবার সময় এরূপ—(i) ঢাকাতে সকাল ১০ ঘ ৮ মি+১৫ মি=১০ ঘ ২৩ মি, (10.23 a.m.), (ii) টোকিওতে দুপুর ১টা ২৫ মি+ ১৫ মি=১টা ৪০ মি (1.40 p.m.), আর (iii) নিউ ইয়র্কে পূর্বদিনের রাত্রি ১১টা ১০ মি+১৫ মি=১১টা ২৫ মি (11.25 p.m. of the previous date)।

১৮। দিল্লী (৭৭° পূঃ দ্রাঃ) হইতে তিনটি বিমান একদিন সকাল ১০টায় একই সময়ে যাত্রা করিল। প্রথমটি গেল লণ্ডন (০° দ্রাঃ), দ্বিতীয়টি ওয়াশিংটন (৭৭° পঃ দ্রাঃ) এবং তৃতীয়টি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন (১৪৫° পূঃ দ্রাঃ)। প্রথম বিমানটির লণ্ডনে পৌঁছিতে সময় লাগিল ৭২৳ ঘণ্টা, দ্বিতীয়টির ওয়াশিংটনে পৌঁছিতে সময় লাগিল ১১ ঘণ্টা এবং তৃতীয়টির মেলবোর্ন পৌঁছিতে সময় লাগিল ৭ ঘণ্টা। প্রত্যেকটি বিমান যখন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিল তখন তাহাদের কোন্‌টির স্থানীয় সময় কত? [(i) দিল্লী (৭৭° পূঃ দ্রাঃ) হইতে লণ্ডন (০° দ্রাঃ) ৭৭° পশ্চিমে। কাজেই দিল্লীতে যখন স্থানীয় সময় সকাল ১০টা, তখন লণ্ডনের স্থানীয় সময় সকাল ১০টা হইতে (৭৭×৪মি=৩০৮ মি) ৫ ঘ ৮ মি পশ্চাৎ-গামী বা কম অর্থাৎ শেষ রাত্রি ৪টা ৫২ মি। তাহার ৭২৳ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ লণ্ডনের স্থানীয় সময় অনুসারে ৪ ঘ ৫২ মি+৭ ঘ ৩০ মি বা দিবা ১২টা ২২ মি (12.22 p.m.) সময়ে বিমানটি লণ্ডনে পৌঁছিয়াছিল।] [(ii) দিল্লী (৭৭° পূঃ দ্রাঃ) হইতে ওয়াশিংটন (৭৭° পঃ দ্রাঃ) ৭৭+৭৭ বা ১৫৪° পশ্চিমে। কাজেই দিল্লীতে যখন স্থানীয় সময় সকাল ১০টা, তখন ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় সকাল ১০টা হইতে (১৫৪×৪ মি=৬১৬ মি) ১০ ঘ ১৬ মি পশ্চাৎগামী বা কম। অর্থাৎ পূর্বদিনের রাত্রি ১১টা ৪৪ মি (11.44 p.m.)। তাহার ১১ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় অনুসারে রাত্রি ১১টা ৪৪ মি+১১ ঘ বা ২২ ঘ ৪৪ মি-এ অর্থাৎ পরদিন সকাল ১০টা ৪৪ মি সময়ে বিমানটি তথায় পৌঁছিল। অর্থাৎ দিল্লী হইতে রওয়ানা হওয়ার দিনই ওয়াশিংটনের সময় সকাল

১০টা ৪৪ মি-এ (10.44 a.m.) বিমানটি ওয়াশিংটনে পৌঁছিল।] [(iii) দিল্লী (৭৭° পূঃ দ্রাঃ) হইতে মেলবোর্ন (১৪৫° পূঃ দ্রাঃ) ৬৮° (১৪৫-৭৭) পূর্বদিকে। কাজেই দিল্লীতে যখন স্থানীয় সময় সকাল ১০টা, তখন মেলবোর্নের স্থানীয় সময় সকাল ১০টা হইতে (৬৮×৪ মি বা ২৭২ মি বা) ৪ ঘ ৩২ মি অগ্রগামী বা বেশী অর্থাৎ দুপুর ২টা ৩২ মিঃ (2.32 p.m.)। তাহার ৭ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ মেলবোর্নের স্থানীয় সময় অনুসারে ২টা ৩২ মি+৭ ঘ=রাত্রি ৯টা ৩২ মি (9.32 p.m.) সময়ে বিমানটি মেলবোর্নে পৌঁছিল।]

১৯। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে (১৫১° পূঃ দ্রাঃ) অস্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতের ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হইয়াছে তথাকার স্থানীয় সময় সকাল ১০টায়। ঐ খেলার ধারাবিবরণী রেডিওর মারফত কলিকাতাতে (৮৮½ পূঃ দ্রাঃ) স্থানীয় সময় অনুসারে কখন শুনা গিয়াছে? [সিডনি (১৫১° পূঃ দ্রাঃ) হইতে কলিকাতা (৮৮½° পূঃ দ্রা) ৬২½° (১৫১°-৮৮½°) পশ্চিমে। কাজেই সিডনির স্থানীয় সময়ের চেয়ে কলিকাতার স্থানীয় সময় ৬২½°×৪ মি বা ২৫০ মি বা ৪ ঘ ১০ মি পশ্চাৎগামী বা কম। এজন্য সিডনির স্থানীয় সময় যখন সকাল ১০টা, তখন কলিকাতার স্থানীয় সময় সকাল ১০টা—৪ ঘ ১০ মি=সকাল ৫ ঘ ৫০ মি বা ৫·৫০ মি (5.50 a.m.)।]

২০। একজন বিমানযাত্রী কোন বিমানবন্দরে তাঁহার ক্রনোমিটারের সহিত মিলান ঘড়িতে সময় দেখিলেন রাত্রি ১২টা, অথচ তখন একজন নূতন যাত্রী ঐ বিমানে আসিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার ঘড়িতে স্থানীয় সময় তখন সকাল ৮টা। ঐ স্থানের দেশান্তর কত? [ঐ স্থানের স্থানীয় সময় গ্রীনিচ সময় হইতে ৮ ঘণ্টা অগ্রগামী বা বেশী। কাজেই স্থানটি গ্রীনিচ (০° দ্রাঃ) হইতে পূর্বদিকে। পৃথিবীর পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আবর্তন বশতঃ প্রতি ডিগ্রি দেশান্তরে ৪ মিনিট হিসাবে ও প্রতি মিনিট দেশান্তরে ৪ সেকেণ্ড হিসাবে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে সময় বেশী। এখানে ৮ ঘণ্টা বা ৮×৬০ মি বা ৪৮০ মি সময় বেশী। কাজেই স্থানটির দেশান্তর ৪৮০ মি÷৪=১২০° পূঃ দ্রাঃ।]

২১। একজন বিমানযাত্রী কোন বিমানবন্দরে তাঁহার ক্রনোমিটারের সহিত মিলান ঘড়িতে সময় দেখিলেন সন্ধ্যা ৬·১৫ (6.15 p.m.)। অথচ তখন ঐ স্থানের স্থানীয় সময় ঘোষণা করা হইল দুপুর ১২টা (12 noon)। ঐ স্থানের দেশান্তর কত? [ঐ স্থানের স্থানীয় সময় (দুপুর ১২টা) গ্রীনিচ সময় হইতে ৬ ঘ ১৫ মি পশ্চাৎগামী বা কম। কাজেই স্থানটি গ্রীনিচের (০° দ্রাঃ) হইতে পশ্চিমে। উপরের হিসাব অনুসারে ৬ ঘ বা ৬×৬০ মি বা ৩৬০ মি সময়ের পার্থক্য হইল ৩৬০÷৪ বা ৯০° দেশান্তরের জন্য। আর ১৫ মি সময়ের পার্থক্য হইল ১৫÷৪ বা ৩°৪৫′ দেশান্তরের জন্য। অতএব ঐ স্থানটির দেশান্তর ৯০°+৩°৪৫′ পশ্চিম বা ৯৩°৪৫′ পঃ দ্রাঃ।]

২২। একজন বিমানযাত্রী মস্কো হইতে বিমানে দিল্লী (৭৭° পূঃ দ্রাঃ) পৌঁছিয়া লক্ষ্য করিলেন তখন দিল্লীর স্থানীয় সময় সকাল ৮·৩০ মিঃ (8.30 a.m.)। কিছুক্ষণ পর তাঁহার পরিচিত অপর একজন বিমানযাত্রী লণ্ডন হইতে বিমানে দিল্লী পৌঁছিয়া দেখিলেন তাঁহার ক্রনোমিটারের সহিত মিলান ঘড়িতে সময় তখন শেষরাত্রি ৩টা ৩২ মি (3.32 a.m.)। তিনি প্রথম ব্যক্তির কতক্ষণ পরে দিল্লীতে পৌঁছিলেন? [লণ্ডন হইতে দিল্লী ৭৭° পূর্বদিকে। কাজেই গ্রীনিচ সময়ের চেয়ে দিল্লীর স্থানীয় সময় ৭৭×৪ মি=৩০৮ মি বা ৫ ঘ ৮ মি অগ্রগামী বা বেশী। অর্থাৎ যখন গ্রীনিচ সময় শেষরাত্রি ৩·৩২ মি, তখন দিল্লীর স্থানীয় সময় ৩ ঘ ৩২ মি+৫ ঘ ৮ মি=৮ ঘ ৪০ মি (8.40 a.m.)। অতএব প্রথম ব্যক্তির দিল্লীতে পৌঁছিবার ১০ মি পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি দিল্লীতে পৌঁছিলেন।]

২৩। দুইটি স্থানের মধ্যে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য ৫৪মি ২০সে। তাহাদের মধ্যে একটি স্থান কলিকাতা (৮৮½° পূঃ দ্রাঃ)। অপর স্থানের দেশান্তর কত? [যেহেতু ঐ স্থানের স্থানীয় সময় কলিকাতার স্থানীয় সময়ের তুলনায় বেশী বা কম বলা হয় নাই, তাহা বেশী হইতে পারে কমও হইতে পারে। ৫৪মি সময়ের পার্থক্য হয় ৫৪÷৪=১৩½° দেশান্তরের পার্থক্যের জন্য। আর ২০সে সময়ের পার্থক্য হয় ২০÷৪=৫′মি দেশান্তরের পার্থক্যের জন্য। কাজেই স্থান দুইটির দেশান্তরে পার্থক্য ১৩°৩০′+৫′ বা ১৩°৩৫′ মি।

স্থানটির স্থানীয় সময় যদি কলিকাতার স্থানীয় সময়ের চেয়ে বেশী হয় তবে তথাকার দেশান্তর ৮৮°৩০′+১৩°৩৫′=১০২°৫″ পূঃ দ্রাঃ। আর স্থানটির স্থানীয় সময় যদি কলিকাতার স্থানীয় সময়ের চেয়ে কম হয় তবে তথাকার দেশান্তর ৮৮°৩০′–১৩°৩৫′=৭৪°৫৫′ পূঃ দ্রাঃ।]

২৪। দুইটি স্থানের মধ্যে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য ৬ ঘণ্টা এবং একটি স্থান কলিকাতা হইলে (৮৮½° পূঃ দ্রাঃ) বাকী স্থানটির দেশান্তর কত? [৬ ঘণ্টা বা ৬ ঘ×৬০ মি বা ৩৬০ মি সময়ের পার্থক্য হয় ৩৬০÷৪ বা ৯০° দেশান্তরের পার্থক্যের জন্য। কাজেই অপর স্থানটি কলিকাতার (৮৮½° পূঃ দ্রাঃ) ৯০° পূর্ব দিকে অথবা কলিকাতার ৯০° পশ্চিমদিকে। স্থানীয় সময় বেশী হইলে বা স্থানটি কলিকাতার পূর্বদিকে হইলে তথাকার দেশান্তর ৮৮½°+৯০°=১৭৮½° পূঃ দ্রাঃ। আর স্থানটি কলিকাতার পশ্চিমে হইলে বা সময় কম হইলে তথাকার দেশান্তর স্থির করিবার জন্য মনে রাখিতে হইবে ৮৮½°+১½°=৯০°। কারণ, কলিকাতার (৮৮½° পূঃ দ্রাঃ) ৮৮½° পশ্চিমে গ্রীনিচ (০° দ্রাঃ)। আর ঐ স্থানটি তথা হইতে ১½° বা ১°৩০′ পশ্চিমে অর্থাৎ তথাকার দেশান্তর ১°৩০′ পঃ দ্রাঃ।]

২৫। ১৯৮৪ ইং সনের ২৯শে জুলাই রবিবার ভারতীয় সময় (I.S.T.) ভোর ৪টায় (4a.m.) দূরদর্শনের মাধ্যমে লস এঞ্জেলসে (প্রায় ১১৮°১০′ পঃ দ্রাঃ) অনুষ্ঠিত ২৩তম অলিম্পিক উৎসবের উদ্বোধনের সূচনা ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সরাসরি দেখা যায়। তখন লস এঞ্জেলসের স্থানীয় সময় কত? [লস এঞ্জেলস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অংশে ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থিত। তথাকার দেশান্তর প্রায় ১১৮°১০′ পঃ দ্রাঃ। আর ভারতীয় সময় স্থির হয় ৮২½° পূঃ দ্রাঃ এর স্থানীয় সময় অনুসারে। কাজেই ৮২½° পূঃ দ্রাঃ হইতে লস এঞ্জেলস প্রায় ৮২½° বা ৮২° ৩০′+১১৮°১০′ অর্থাৎ ২০০°৪০′ পশ্চিমে অবস্থিত। এজন্য লস এঞ্জেলসের স্থানীয় সময় ভারতীয় সময় হইতে ২০০×৪মি+৪০×৪সে বা ৮০০মি+১৬০সে বা৮০০মি+২মি ৪০সে বা ৮০২মি ৪০সে অর্থাৎ ১৩ঘ ২২ মি ৪০সে পশ্চাৎবর্তী বা কম। ফলে, যখন ভারতীয় সময় রবিবার ২৯শে জুলাই ভোর ৪টা (a.m.), তখন ঐ সময় হইতে ৪ ঘণ্টা আগেকার সময় রাত্রি ১২টা। তাহা হইতে ৯ঘ ২২মি ৪০সে আগেকার সময় অর্থাৎ লস এঞ্জেলসের স্থানীয় সময় শনিবার ২৮শে জুলাই অপরাহ্ন প্রায় ২টা ৩৭মি ২০সে বা মোটামুটি হিসাবে ২·৩৭মি (2.37p.m.)।]

চতুর্থ অধ্যায়

১। পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডল, বহির্মণ্ডল ও ভূত্বক্ বলিলে কি বুঝায় সংক্ষেপে লিখ ও চিত্র আঁক। ২। শিলা কাহাকে বলে? ইহারা কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত? ৩। আগ্নেয় শিলা কাহাকে বলে? এরূপ দুইটি শিলার নাম লিখ। ৪। পাললিক শিলা কাহাকে বলে? এরূপ দুইটি শিলার নাম লিখ। ৫। রূপান্তরিত শিলা কাহাকে বলে? একটি আগ্নেয় শিলার ও তাহার রূপান্তরিত শিলার নাম লিখ। একটি পাললিক শিলার ও তাহার রূপান্তরিত শিলার নাম লিখ। ৬। জীবাশ্ম কি? ৭। ব্যাসল্ট, কংগ্লোমারেট ও মার্বেল পাথরের মধ্যে কোন্‌টি কোন্ জাতীয় শিলা?

পঞ্চম অধ্যায়

১। ভূমিরূপ কয়টি প্রধান ভাগে বিভক্ত? তাহাদের নাম কি? ২। ভঙ্গিল পর্বত কিভাবে সৃষ্টি হয়? তিনটি প্রধান ভঙ্গিল পর্বতের নাম লিখ। ৩। স্তূপ পর্বত কাহাকে বলে? দুইটি স্তূপ পর্বতের ও দুইটি গ্রস্ত উপত্যকার নাম লিখ। ৪। সঞ্চয়জাত পর্বত কাহাকে বলে? এরূপ একটি পর্বতের নাম লিখ। ৫। ক্ষয়জাত পর্বত কাহাকে বলে? এরূপ একটি পর্বতের নাম লিখ। ৬। পর্বতবেষ্টিত মালভূমি ও লাভা মালভূমি কাহাকে বলে? প্রত্যেকের একটি উদাহরণ দাও। ৭। পাললিক সমভূমি, হ্রদ সমভূমি ও হিমবাহ সমভূমির মধ্যে কোন্‌টি কিভাবে সৃষ্টি হয়? প্রত্যেক প্রকারের একটি উদাহরণ দাও। ৮। মানবজীবনে সমভূমি ও পর্বতের প্রভাব সম্পর্কে কি বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য লক্ষ্য কর?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। ভূমিকম্প কি? ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বা কেন্দ্র কিভাবে জানিতে পারা যায়? ২। ভূমিকম্পের কারণ কি? ভূমিকম্পের ফলে কি জাতীয় ক্ষতি হয়? ৩। ভূমিকম্পের প্রধান অঞ্চল পৃথিবীর কোন্ অংশে?

সপ্তম অধ্যায়

১। কোন্ কোন্ শক্তিদ্বারা ভূপৃষ্ঠের অধিক পরিবর্তন হয়? ২। যান্ত্রিক বা সাধারণ আবহবিকার কাহাকে বলে? এবিষয়ে বৃষ্টিপাতের প্রভাব কিরূপ? ৩। নদীর উচ্চ-গতিতে তাহাদ্বারা ভূপৃষ্ঠের কিরূপ পরিবর্তন হয়? ৪। নদীর কোন্ অংশে উহার উপত্যকার আকৃতি I-এর মত ও কোথায় V-এর মত? এরূপ বিভিন্ন প্রকার অবস্থা কেন হয়? ৫। ঝুলান উপত্যকা,, জলপ্রপাত ও খরস্রোতের চিত্র আঁকিয়া দেখাও। ৬। সৌরতাপ ও বায়ুর উষ্ণতার প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের কিভাবে পরিবর্তন হয়? পৃথিবীর কোন্ অংশে এরূপ পরিবর্তন অধিক হয়? ৭। তুষারের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের কিরূপ পরিবর্তন হয়?

অষ্টম অধ্যায়

১। নদীর গতিপথের কোন্ অংশে ভূপৃষ্ঠের কোন্ জাতীয় পরিবর্তন হয়? ২। নদীর মধ্যগতি ও নিম্নগতিতে অপসারণকার্য সম্বন্ধে কিরূপ পার্থক্য দেখা যায়? ৩। নদীর কোন্ অংশে সঞ্চয়কার্য অধিক? এরূপ সঞ্চয়কার্যের কয়েকটি উদাহরণ দাও। ৪। প্লাবনভূমি ও অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ কাহাকে বলে? কোন্‌টি কিভাবে সৃষ্টি হয়? ৫। বদ্বীপ কিভাবে সৃষ্টি হয়? একটি বিখ্যাত বদ্বীপের নাম বল। ৬। নদীর উচ্চগতিতে সঞ্চয়ের কোন কাজ নাই, আবার শেষগতিতে ক্ষয়কার্য নাই—কেন? ৭। হিমবাহ কি? তাহা কিভাবে পরিবহনকার্য করে? ৮। হিমবাহদ্বারা কিভাবে সঞ্চয়কার্য হয়? পার্শ্ব গ্রাবরেখা ও মধ্য গ্রাবরেখা কাহাকে বলে? ৯। বায়ুদ্বারা কিভাবে পরিবহনকার্য হয়? বালিয়াড়ি কি? কিভাবে ইহার সৃষ্টি হয়? ১০। লোয়েস সমভূমি বা নিম্নমালভূমি কোথায়? কিভাবে তাহার সৃষ্টি হইয়াছে?

নবম অধ্যায়

১। অক্ষাংশ ও দেশান্তরের সাহায্যে ভারতের অবস্থিতি নির্দেশ কর। ভারতের প্রমাণকাল কোন্ দেশান্তর অনুসারে নির্ধারিত হয়? ২। ভারত পূর্ব গোলার্ধের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। একথা কিভাবে বলা যায়? ৩। ভারতের দক্ষিণদিকে কোন্ কোন্ সাগর, মহাসাগর? ইহাদের অবস্থিতির ফলে এদেশের কোন্ কোন্ বিষয়ে সুবিধা বা উপকার হইতেছে? ৪। ভারত কখন স্বাধীনতা লাভ করে? ঐ সময় এদেশে কতগুলি গভর্ণরশাসিত রাজ্য ছিল? ৫। বর্তমানে এদেশে কতগুলি গভর্ণরশাসিত রাজ্য আছে? ৬। আয়তন হিসাবে কোন্‌টি বৃহত্তম ও কোন্‌টি ক্ষুদ্রতম? লোকসংখ্যা (১৯৮১) হিসাবে কোন্‌টির স্থান প্রথম? কোন্‌টির লোকসংখ্যা সবচেয়ে কম? ৭। ভারতের কোন্ রাজ্যের নাম মেঘালয়? তাহার রাজধানী কি? ৮। বর্তমানে এদেশে কয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে? তাহাদের মধ্যে কোন্‌টির আয়তন সবচেয়ে বেশী? কোন্‌টির লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশী? ৯। ভারতের কোন্ অংশে অরুণাচল প্রদেশ অবস্থিত? তাহার রাজধানী কি? ১০। গান্ধীনগর, ইটানগর, শ্রীনগর—কোন্‌টি কোন্ রাজ্যের রাজধানী? ১১। দিসপুর, চণ্ডীগড়, আইজল ও কাভারত্তি—কোন্‌টি কোন্ রাজ্যের রাজধানী?

দশম অধ্যায়

১। ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমদিকে অবস্থিত প্রতিবেশী দেশসমূহের নাম লিখ। ২। নেপালের বিখ্যাত পর্বতশ্রেণীর নাম লিখ। তাহা ঐ দেশের কোন্ অংশে? শিবালিক পাহাড় সে দেশের কোন্ অংশে? সে দেশের দুইটি বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গের নাম

লিখ। ৩। নেপালের কোন্ অংশে তরাই অঞ্চল? সে দেশের উদ্ভিজ্জ সম্পদ কিরূপ? ৪। বাল্মীকিনগর, কাঠমণ্ডু ও কপিলাবস্তু—ইহাদের কোন্‌টি কেন প্রসিদ্ধ? ৫। ভুটানের একটি পর্বত ও দুইটি নদীর নাম লিখ। সে দেশের রাজধানী কি? ৬। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি কিরূপ? সে দেশের সর্বপ্রধান নদী কি? ঐ দেশ কোন্ কোন্ নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত? সে দেশের দুইটি প্রধান কৃষিজ সম্পদের নাম লিখ। কোন্‌টির গুরুত্ব কিরূপ? সে দেশের কোন্ শিল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ? তাহার তিনটি প্রধান অঞ্চলের নাম লিখ। ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন বিখ্যাত? ৭। ব্রহ্মদেশ ভারতের কোন্‌দিকে অবস্থিত? সে দেশের সর্বপ্রধান নদী কি? সেদেশের কোন্ অংশে অধিক বৃষ্টি হয়? সেদেশের সর্বপ্রধান কৃষিজ সম্পদ কি? সেদেশের কোন্ অংশে রবারের আবাদ আছে? সে দেশের রাজধানী কি? ৮। শ্রীলংকা ও ভারতের মাঝখানে কোন্ প্রণালী? শ্রীলংকার জলবায়ু কিরূপ? ভারতের কোন্ অংশের জলবায়ুর সহিত তাহার মিল আছে? শ্রীলংকার রাজধানী কি? নৌপথে যাতায়াত সম্পর্কে ঐ বন্দরের গুরুত্ব কিরূপ? ৯। পাকিস্তান ভারতের কোন্ দিকে অবস্থিত? সে দেশের প্রধান নদী কি? তাহার তিনটি উপনদীর নাম লিখ। সে দেশের অধিকাংশ স্থানের জলবায়ু কিরূপ? সে দেশের সেচব্যবস্থার গুরুত্ব উল্লেখ কর। ইসলামাবাদ, করাচি ও জেকোবাবাদের মধ্যে কোন্‌টি কেন বিখ্যাত? ১০। আফগানিস্থানের ভূপ্রকৃতি কিরূপ? সে দেশের জলবায়ু কিরূপ? সে দেশে কোন্ জাতীয় ফল অধিক উৎপন্ন হয়? কাবুল ও গজনী কেন বিখ্যাত?

একাদশ অধ্যায়

১। হিমালয় কোন্ জাতীয় পর্বত? ইহার কোন্ অংশ প্রধান হিমালয় বা হিমাদ্রি নামে পরিচিত? কোন্ অংশ মধ্য হিমালয় ও কোন্ অংশ অবহিমালয়? হিমালয়ের ভারতীয় অংশে অবস্থিত তিনটি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম লিখ। ভারতের উত্তর অংশে হিমালয়ের অবস্থিতির প্রভাব, বিশেষতঃ এদেশ সম্পর্কে ঐ প্রভাব উল্লেখ কর। ২। উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চল কিভাবে গঠিত হইয়াছে? ইহা পূর্ব-পশ্চিমে কতদূর বিস্তৃত? ইহার কোন্ অংশ বদ্বীপ এবং কোন্ কোন্ অংশ উচ্চ, মধ্য ও নিম্নগঙ্গা সমভূমি? এদেশের লোকবসতি, যাতায়াত ও পরিবহন এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এই সমভূমি অঞ্চলের প্রভাব উল্লেখ কর। ৩। দাক্ষিণাত্য মালভূমির ভূপ্রকৃতি কিরূপ? এখানকার কোন্ অংশে কোন্ প্রধান পর্বত অবস্থিত? পালঘাট গিরিপথ কোথায়? ইহার গুরুত্ব কিরূপ? ৪। ভারতের সর্বপ্রধান নদী কি? ইহার সর্বপ্রধান উপনদী কি? গঙ্গার আরও তিনটি উপনদীর নাম লিখ। ব্রহ্মপুত্র ভারতের বাহিরে কোন্ কোন্ নামে পরিচিত? দক্ষিণ ভারতের কোন্ নদী সর্বপ্রধন? তথাকার পশ্চিমবাহিনী দুইটি নদীর নাম লিখ। ৫। ভারতের কোন্ অংশে গ্রীষ্মকালের উষ্ণতা সবচেয়ে বেশী? তখন হিমালয় অঞ্চলে ও দেশের দক্ষিণ অংশে উষ্ণতার অবস্থা কিরূপ? এদেশে কোন্ বায়ুর প্রভাব বা গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী? তাহা কখন ও কোন্ দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়? তাহাদ্বারা এদেশের কি উপকার হয়? ঐ বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখার গুরুত্ব উল্লেখ কর। কালবৈশাখী, আঁধি, লু ও শৈত্যপ্রবাহ—কোন্‌টি কি? ইহাদের কোন্‌টির প্রভাব কিরূপ? ভারতের কোন্ অংশে প্রকৃত শীতকাল নাই? এদেশের কোন্ অংশে বৎসরে দুইবার অধিক বৃষ্টি হয়? এদেশের কোন্ অংশ প্রায় বৃষ্টিহীন? লাডাক ও রাজস্থানের মধ্যে কোন্‌টির জলবায়ু কোন্ জাতীয়? ৬। ভারতের কোন্ অংশে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের বন অধিক? এখানকার এই জাতীয় কয়েকটি বিখ্যাত গাছের নাম লিখ। এদেশের কোন্ কোন্ অংশে মিশ্র বৃক্ষের অরণ্য অধিক বিস্তৃত? এই জাতীয় পাঁচটি গাছের নাম লিখ। এদেশের লোনা মাটি অঞ্চলে কোন্ জাতীয় গাছ দেখা যায়? ৭। উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানে কোন্ জাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায়? দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এরূপ মৃত্তিকার প্রভাব উল্লেখ কর। এদেশের কোন্ অংশে কৃষ্ণ মৃত্তিকা সুস্পষ্ট? তাহা কোন্ কোন্ ফসল চাষের উপযোগী? এদেশের কোন্ অংশে কফি মৃত্তিকা ও কোন্ অংশে লাল মাটি দেখা যায়? ৮। এদেশের কৃষির উন্নতির উদ্দেশ্যে সেচ একান্ত আবশ্যক কেন? এদেশের স্বাধীনতার পূর্বে সাধারণতঃ কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে সেচকার্য হইত? তখন—

কার কয়েকটি প্রসিদ্ধ নদীর সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে সেচব্যবস্থার নাম লিখ। স্বাধীনতার পরে বহুমুখী নদীপ্রকল্প অনুসারে সেচব্যবস্থা সম্পর্কে মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি কি? দামোদর উপত্যকা প্রকল্প, ভাকরানাঙ্গল প্রকল্প, রাজস্থান ক্যানেল প্রকল্প—ইহাদের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ কর। ৯। এদেশে কৃষি বিপ্লব বা গম বিপ্লবের ফলে কৃষির কি প্রকার উন্নতি হইতেছে তাহা ২।১টি উদাহরণসহ সংক্ষেপে আলোচনা কর। এদেশে কত প্রকার ধানের চাষ হয়? ধানের বপন ও রোপণ পদ্ধতিদ্বারা কি বুঝায়? এদেশে বর্তমানে কত ধান উৎপন্ন হয় এবং কোন্ কোন্ অংশে তাহা অধিক জন্মে? গমের চাষ এদেশের কোন্ অংশে সবচেয়ে বেশী? ইহার জন্য কিরূপ ভৌগোলিক অবস্থা বিশেষ অনুকূল? গম বিপ্লবের ফলে এদেশে গমের উৎপাদন কি পরিমাণ বাড়িয়াছে? এদেশের তিনটি প্রধান বাণিজ্যিক ফসলের নাম লিখ। এদেশে কোন্ কোন্ অংশে কার্পাস অধিক জন্মে? স্বাধীনতার পরে এদেশে কার্পাসের চাষ সম্পর্কে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে। এদেশে এখন পাট চাষের পরিমাণ কিরূপ? কোথায় ইহা অধিক জন্মে? ইহার চাষের অনুকূল অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর। এদেশের কোন্ অংশে সবচেয়ে বেশী আখ জন্মে? তাহা চাষের অনুকূল অবস্থা লিখ। এদেশের কোন্ অংশে সবচেয়ে বেশী চা ও কোথায় সবচেয়ে বেশী কফি জন্মে? ইহাদের চাষের অনুকূল অবস্থা আলোচনা কর। ১০। এদেশে তাপবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পাঁচটি কেন্দ্রের নাম লিখ। এদেশে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনেরও পাঁচটি কেন্দ্রের নাম লিখ। এদেশে কয়লা উৎপাদনের দুইটি সর্বপ্রধান কেন্দ্রের নাম লিখ। লিগনাইট এদেশে কোথায় বেশী উৎপন্ন হয়? এদেশে এখন কোথায় কোথায় বেশী খনিজ তৈল পাওয়া যায়? বম্বে হাই কেন বিখ্যাত? এদেশে কোথায় কোথায় অধিক লৌহ আকরিক পাওয়া যায়? এদেশের লৌহ আকরিক প্রধানতঃ কোন্ জাতীয়? এদেশের কোথায় অধিক ম্যাঙ্গানিজ ও কোথায় অধিক বক্সাইট পাওয়া যায়? অভ্র উৎপাদন সম্পর্কে ভারতের গুরুত্ব কিরূপ? ১১। এদেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পাঁচটি প্রধান কেন্দ্রের নাম লিখ। স্বাধীনতার পর ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি স্থাপিত হইয়াছে? এদেশে লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের সবচেয়ে বেশী কেন্দ্র কোথায়? তথায় ইহাদের কেন্দ্রীভবনের কারণ কি? এদেশে সবচেয়ে বেশী কার্পাসবস্ত্র কোন্ অঞ্চলে তৈরী হয়? তথায় এই শিল্পের এপ্রকার উন্নতির কারণ কি? ভারতে পাট শিল্পের সর্বপ্রধান অঞ্চল কোথায়? এখানে এই শিল্পের এপ্রকার উন্নতি কি কি কারণে সম্ভবপর হইয়াছে।

পদ্ধতি

(ছাত্র-ছাত্রীগণের শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সহায়তা সংক্রান্ত পদ্ধতি)

বাস্তব জীবনে প্রত্যেক মানবশিশু নিজে খায়, নিজে হামাগুড়ি দিতে শিখে, হাটিতে শিখে, কথা বলিতে শিখে। তবে এরূপ প্রত্যেক কাজেই তাহাকে দরকারমত সাহায্য করেন তাহার মা, বাবা ও অন্যান্য আপন জন। লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও শিশুই শিখে। প্রথম অবস্থায় তাহাকে অধিক সাহায্য করেন মা, বাবা এবং ক্রমশঃ অন্যান্য আপন জন। (দুর্ভাগ্য বশতঃ অমাদের দেশে এখনও অনেক ক্ষেত্রেই মা, বাবার পক্ষে একাজ করা সম্ভবপর হইতেছে না।) তারপর শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন হইতে তাহাকে সাহায্য করার ভার গ্রহণ করেন শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। ছাত্র-ছাত্রীগণ যাহাতে নিজেদের যত্ন, চেষ্টা ও আগ্রহে ক্রমশঃ ভালভাবে পড়াশুনা করিতে পারে, প্রকৃত মানুষ হইতে পারে, সেজন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা, নানাভাবে সাহায্য করা, ঠিকপথে পরিচালিত করা— এসকল বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের দায়িত্ব ও ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বস্তুতঃ অতুলনীয়।

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীগণের ভূগোল শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে স্বভাবতঃ নিম্ন শ্রেণী হইতেই ভূগোল শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি আলোচনা করা সমীচীন। এবিষয়ে সংক্ষেপে বালা যাইতে পারে যে কতকগুলি তথ্য বা ভৌগোলিক বিষয় মুখস্থ করাই ভূগোল শিক্ষার একমাত্র পদ্ধতি নয়। আর ঐ সকল বিষয় মনে রাখা ও পরীক্ষার সময় তাহাদের সাহায্যে বিভিন্ন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়াই ভূগোল শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ভূগোলের বিষয়বস্তু হইল পরিবেশের, ব্যাপক অর্থে পৃথিবীর সহিত মানুষের

জীবনধারার গভীর সম্পর্ক। শিশুর জীবনের প্রথম দিকে তাহার পরিবেশ বাড়ি ও আশপাশে সীমাবদ্ধ। ক্রমশঃ তাহার বয়স, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়িবার সংগে সংগে পরিবেশের পরিধিও বাড়িতে থাকে। এজন্য প্রথমে নিজের বাসভূমি ও আশপাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাহার ভূগোল শিক্ষা আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভূগোলের বিষয়বস্তুর সহিত তাহার পরিচয় বৃদ্ধি হয়। এবং তাহার জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাও ক্রশমঃ বাড়িতে থাকে। এভাবে নিজ নিজ বাসভূমি ছাড়াইয়া ক্রমে ক্রমে অধিক বিস্তৃত স্থানের ও তথাকার মানুষের সহিত তাহার পরিচয় হয়। ক্রমশঃ নিজের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রাম, মহকুমা, জেলা প্রভৃতির বিষয়, পরে নিজ রাজ্য এবং আরও পরে নিজ দেশের সম্পর্কে সে ভৌগোলিক জ্ঞান লাভ করে। এভাবে নিজের যত্ন ও চেষ্টায়, আপন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে দেশের ভৌগোলিক জ্ঞান লাভের ফলে শিশু আঞ্চলিক ভূগোলের প্রয়োজনীয় অনেক তথ্যই শিখে। তাহাছাড়া দেশের বিভিন্ন অংশের মানুষের জীবন তাহাদের উন্নতি সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে নানাভাবে সাহায্য, সহযোগিতা, নির্ভরতা প্রভৃতি বিষয় শিখে। অর্থাৎ এভাবে সে অর্থনৈতিক ও মানবিক ভূগোলের বিভিন্ন বিষয়ও জানিতে ও বুঝিতে পারে। এভাবেই দেশের অখন্ডতা, সামগ্রিকভাবে উন্নতিলাভ প্রভৃতি বিষয়ও সে ভালভাবে বুঝিতে পারে। ক্রমশঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও মহাদেশের বিষয়, তাহাদের সহিত গভীর সম্পর্ক প্রভৃতিও ছাত্র-ছাত্রীগণ বুঝিতে পারে। এসকল বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাস্তব জীবনে ব্যবহার ভূগোল শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

এখন নবম শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীগণ কিভাবে তাহাদের ভূগোল সংক্রান্ত পাঠ্য বিষয় ঠিক-ভাবে শিখিবে এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীগণ জানে যে প্রধানতঃ নবম ও দশম শ্রেণীতে পঠিত বিষয়ের ভিত্তিতেই তাহাদিগকে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য তৈরী হইতে হয়। কাজেই এই দুই শ্রেণীতে পাঠ্যবিষয়ের গুরুত্ব খুব বেশী। তাহাছাড়া ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে* প্রাকৃতিক ভূগোলের যে সামান্য অংশ তাহারা পাঠ করিয়াছে এখানে প্রাকৃতিক ভূগোলের বিষয় শিখিবার পক্ষে তাহার জ্ঞানও একান্ত আবশ্যক। তাহাছাড়া সপ্তম শ্রেণীতে ভারত সম্পর্কে তাহারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহাও এখানে ভারত সম্পর্কে আলোচনার সময় বিশেষ প্রয়োজন। আর সপ্তম ও এই (নবম) শ্রেণীতে ভারতের বিষয়ে যাহা শিখিবে, দশম শ্রেণীতে ভারতের লোকবসতি, নগর, বন্দর প্রভৃতির বিষয় আলোচনা সম্বন্ধে তাহাদ্বারা তাহারা উপকৃত হইবে। ভূগোলের বিভিন্ন বিষয়বস্তু পাঠের ও আলোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেমন পার্থক্য আছে, পাঠের পদ্ধতি, সেজন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, উপাদান প্রভৃতি সম্বন্ধেও পার্থক্য বিস্তর। সকল বিষয়ই শিখিবার জন্য চিত্র, ছবি, মানচিত্র, ভূচিত্রাবলী প্রভৃতির সাহায্য একান্ত আবশ্যক। আবার কতক ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষের বাহিরে পর্যবেক্ষণ, নিজের হাতে কাজ করা প্রভৃতিও প্রয়োজন। অনেক বিষয় ভালভাবে জানিতে হইলে কিছু অতিরিক্ত বই, সংবাদপত্র** মাসিক পত্র, রিপোর্ট প্রভৃতি পড়া, তাহাদের সাহায্যে কিছু কিছু সম-সাময়িক সংবাদ সংগ্রহ করা প্রভৃতিও একান্ত আবশ্যক। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এসকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ দিবেন এবং সাহায্য করিবেন। পরীক্ষাতে ভাল ফল লাভের জন্য কিভাবে প্রশ্ন বাছিয়া নিতে হয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যেক প্রশ্নের প্রয়োজনমত স্কেচ, মানচিত্র সহ যথাযথ উত্তর দিতে হয় তাহাও বলিবেন। শ্রেণীকক্ষে এসকল বিষয়ে বিস্তর অনুশীলন প্রয়োজন। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালাভের সংগে সংগে ছাত্র-ছাত্রীগণের যাহাতে দক্ষতা বৃদ্ধি, সুঅভ্যাস গঠন, দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতার পরিবর্তন হয় সে সম্পর্কেও তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন ও সাহায্য করিবেন। এরূপ নানাভাবে তাঁহাদের নিকট শিক্ষা, সাহায্য, অনুপ্রেরণা, উপদেশ প্রভৃতি লাভ করা ছাত্র-ছাত্রীগণের পক্ষে শুধু ভূগোল নয়, সকল বিষয়ই ভালভাবে শিখিবার, জানিবার এবং জীবনপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক।

* এই তিন শ্রেণীতে যাহা পড়িয়াছে তাহা হইতেও একটি প্রশ্ন থাকিবে।

** ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ হইতে মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশ গভর্ণর-শাসিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। তাহার ফলে এখন গভর্ণর-শাসিত রাজ্যের সংখ্যা ২৪ ও কেন্দ্র-শাসিত রাজ্যের সংখ্যা ৭।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

নবম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুসারে বিভিন্ন বিষয় ছাত্র-ছাত্রীগণ যাহাতে ভালভাবে শিখিতে পারে সেজন্য তাহাদিগকে ক্রমাগত ছোট ছোট প্রশ্ন করিয়া, তাহাদের চিন্তাশক্তি প্রভৃতি বাড়াইয়া নানাভাবে সাহায্য করা যাইতে পারে। নিম্নে এরূপ কতক প্রশ্নের নমুনা দেওয়া গেল।

প্রাকৃতিক ভূগোল

১। আকাশের কোন্ নক্ষত্রকে পৃথিবীর নিকটতম বলিয়া মনে হয়? ২। সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে কি? ৩। ইহার উপরিভাগের উত্তাপ কিরূপ? ৪। পৃথিবীর তুলনায় ইহা কত বড়? ৫। সৌরজগতে গ্রহগণের সংখ্যা কত? উহাদের এরূপ (Planet) নামকরণের সার্থকতা কি? ৬। সৌরমণ্ডলে সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব কত? ৭। সূর্য হইতে দূরত্ব হিসাবে গ্রহগণের মধ্যে পৃথিবীর স্থান কত? ৮। আয়তন হিসাবে গ্রহগণের মধ্যে ইহার স্থান কত? ৯। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব কত? ১০। চন্দ্র কত দিনে পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসে? ১১। চন্দ্রে উদ্ভিদ্, জীবজন্তু থাকা সম্ভবপর নয় কেন? ১২। ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু আছে কেন? ১৩। পৃথিবীর আকৃতি কিরূপ? ১৪। এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কি? ১৫। পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস কত? মেরুদেশীয় ব্যাস কত? ১৬। পৃথিবীর গতি কয়টি? কি কি? ১৭। পৃথিবীর কক্ষপথে ইহা কিভাবে অবস্থিত? ১৮। পৃথিবীর এক বার আবর্তন করিবার জন্য কত সময় দরকার? ১৯। এই গতির ফলে ভূপৃষ্ঠে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়? ২০। পৃথিবীর আবর্তনের কোন্ প্রভাব আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করি? ২১। বায়ু প্রবাহের উপর পৃথিবীর এই গতির প্রভাব কি? ২২। পৃথিবীর দ্বিতীয় গতির আর কি নাম আছে? ২৩। এরূপ নামকরণের কারণ কি? ২৪। পৃথিবীতে বৎসর গণনা সম্পর্কে কি ব্যতিক্রম হয়? ২৫। পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি না থাকিলে কি হইত? ২৬। কলিকাতাতে শীত ও গ্রীষ্মকালে দিবামানের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে পার্থক্য কিরূপ? ২৭। পৃথিবীর কোন্ অংশে এই পার্থক্য সবচেয়ে কম? কোথায় সবচেয়ে বেশী? ২৮। আলোকের পার্থক্য অনুসারে ভূপৃষ্ঠ কয়টি আলোকমণ্ডলে বা তাপমণ্ডলে বিভক্ত? ২৯। নিশীথ সূর্যের দেশ কোথায়? ৩০। সেখানকার এরূপ নামকরণের কারণ কি? ৩১। ছায়াবৃত্ত কাহাকে বলে? ৩২। বিষুব কাহাকে বলে? ৩৩। উত্তর গোলার্ধে কোন্ দিন মহাবিষুব, কোন্ দিন জলবিষুব? ৩৪। কোন্ দিন উত্তর অয়নান্ত দিবস? ৩৫। সেদিন উত্তর গোলার্ধে ও দক্ষিণ গোলার্ধে দিবাভাগের আয়তন সম্পর্কে কি অবস্থা? ৩৬। কোন্ দিন দক্ষিণ অয়নান্ত দিবস? সেদিন দক্ষিণ গোলার্ধে ও উত্তর গোলার্ধে দিবাভাগের আয়তন সম্পর্কে কি অবস্থা? ৩৭। উত্তর গোলার্ধে কখন গ্রীষ্মকাল? তখন দক্ষিণ গোলার্ধে কোন্ কাল? ৩৮। উত্তর গোলার্ধে কখন শীতকাল? তখন দক্ষিণ গোলার্ধে কোন্ কাল? ৩৯। আমাদের দেশে কখন বর্ষাকাল? ৪০। নিরক্ষরেখা কাহাকে বলে? এই রেখার উপরিস্থিত কোন স্থানের অক্ষাংশ কত? ৪১। মূল মধ্যরেখা কাহাকে বলে? এই রেখার উপরিস্থিত কোন স্থানের দেশান্তর কত? ৪২। ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানের সঠিক অবস্থিতি কিভাবে নির্দেশ করা হয়? ৪৩। অক্ষরেখা কিভাবে আঁকা হয়? ৪৪। কর্কটক্রান্তির অক্ষাংশ কত? ৪৫। মকরক্রান্তির অক্ষাংশ কত? ৪৬। সুমেরুবৃত্তের অক্ষাংশ কত? ৪৭। কুমেরুবৃত্তের অক্ষাংশ কত? ৪৮। সুমেরুর অক্ষাংশ কত? ৪৯। কুমেরুর অক্ষাংশ কত? ৫০। উচ্চ অক্ষাংশ বলিলে কি বুঝ? ৫১। নিম্ন অক্ষাংশ বলিলে কি বুঝ? ৫২। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার মধ্যে পার্থক্য কি? ৫৩। কলিকাতার অক্ষাংশ কত? ৫৪। কলিকাতার দেশান্তর কত? ৫৫। ভূপৃষ্ঠে কোন স্থানের মধ্যাহ্ন কিভাবে স্থির করা হয়? ৫৬। দ্রাঘিমারেখার সহিত স্থানীয় সময়ের সম্পর্ক কি? ৫৭। ভারতের প্রমাণ কাল (I.S.T.) কোন্ দেশান্তর অনুসারে স্থির হয়? ৫৮। গ্রীনিচ প্রমাণ কাল (G.M.T.) কোন্ দেশান্তর অনুসারে স্থির হয়? ৫৯। ভূপৃষ্ঠে কোন্ দিকে স্থানীয় সময় বেশী ও কোন্ দিকে কম? ৬০। ভূপ্রদক্ষিণ করিবার কালে স্থানীয় সময়ের হিসাব সম্বন্ধে যে অসুবিধা

হয় তাহা কিভাবে দূর করা হয়? ৬১। কোন্ দেশান্তর রেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে? ৬২। কলিকাতার প্রতিপাদস্থান কোথায়? ৬৩। তথাকার অক্ষাংশ ও দেশান্তর কত? ৬৪। শিলা কাহাকে বলে? ৬৫। ভূগর্ভের কোন্ অংশকে কেন্দ্রমণ্ডল বলে? ৬৬। ভূগর্ভের কোন্ অংশকে শিলামণ্ডল বলে? ৬৭। আগ্নেয় শিলা কাহাকে বলে? ৬৮। লাভা কাহাকে বলে? ৬৯। আগ্নেয় শিলাকে আদিশিলা বলে কেন? ৭০। একটি উদ্বেধী শিলার নাম কর। ৭১। পাললিক শিলা কাহাকে বলে? ৭২। এই শিলা কিভাবে সৃষ্টি হয়? ৭৩। জৈব শিলা কাহাকে বলে? ৭৪। রূপান্তরিত শিলা কাহাকে বলে? ৭৫। ইহাদের প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও। ৭৬। চুনাপাথর হইতে পরিবর্তিত শিলার নাম কি? ৭৭। ভঙ্গিল পর্বত কিভাবে সৃষ্টি হয়? এরূপ একটি পর্বতের নাম লিখ। ৭৮। স্তূপ পর্বত কাহাকে বলে? ৭৯। এরূপ পর্বতের অনুলোম চ্যুতি কাহাকে বলে? ৮০। গ্রস্ত উপত্যকা কাহাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও। ৮১। সঞ্চয়জাত পর্বত কাহাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও। ৮২। নগ্নীভূত পর্বত কাহাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও। ৮৩। আমাদের দেশে কোথায় লাভা মালভূমি আছে? ৮৪। আমাদের দেশে মহাদেশীয় মালভূমি কোথায় আছে? ৮৫। আমাদের দেশে ব্যবচ্ছিন্ন মাল-ভূমি কোথায় আছে? ৮৬। এদেশে মোনাডনক কোথায় দেখিতে পাইবে? ৮৭। মহাদেশীয় সমভূমি কোথায় আছে? ৮৮। ভারতের কোন্ উপকূলের সমভূমি অধিক প্রশস্ত? ৮৯। ভারতের কোথায় হ্রদ-সমভূমি আছে? ৯০। ভারতের কোথায় প্রশস্ত প্লাবনভূমি আছে? ৯১। এরূপ সমভূমির আর কি নাম আছে? ৯২। ভারতের কোথায় বিস্তীর্ণ বদ্বীপ সমভূমি আছে? ৯৩। হিমবাহ সমভূমি কাহাকে বলে? এরূপ সমভূমি কোথায় দেখা যায়? ৯৪। লোয়েস সমভূমি কোথায় আছে? ৯৫। সমপ্রায় ভূমি বা প্রায় সমভূমি কাহাকে বলে? ৯৬। ভূমিকম্পের কারণ কিভাবে জানা যায়? ৯৭। ইহার মূল কারণ কি? ৯৮। ভূমিকম্পের কেন্দ্র হইতে কত প্রকার তরঙ্গ বিস্তৃত হয়? ৯৯। এরূপ কোন্ তরঙ্গ অধিক ধ্বংসকারী? ১০০। পৃথিবীতে ভূমিকম্পের প্রধান অঞ্চল কোথায়? ১০১। বৃষ্টিদ্বারা কিভাবে ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়ীভবন হয়? ১০২। নদীদ্বারা কিভাবে ক্ষয়ীভবন হয়? ১০৩। গিরিখাত কাহাকে বলে? কিভাবে ইহার সৃষ্টি হয়? ১০৪। পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত গিরিখাত কোথায়? ১০৫। ঝুলান উপত্যকা কাহাকে বলে? ১০৬। জলপ্রপাত কিভাবে সৃষ্টি হয়? ১০৭। পৃথিবীর সর্বোচ্চ জলপ্রপাত কোথায়? ১০৮। ভারতের দুইটি জলপ্রপাতের নাম লিখ। ১০৯। ভারতে কোথায় বায়ুদ্বারা ক্ষয়ীভবন দেখা যায়? ১১০। মরুভূমিতে শিলা কিভাবে ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হয়? ১১১। তুষারদ্বারা কিভাবে শিলা চূর্ণবিচূর্ণ হয়? ১১২। লোহাতে কিভাবে মরিচা ধরে? ১১৩। পার্বত্য অঞ্চলে নদীর উপত্যকার আকৃতি কিরূপ? ১১৪। সমভূমিতে নদীর উপত্যকার আকৃতি কিরূপ? ১১৫। পার্বত্য অঞ্চলে নদীদ্বারা কোন্ কোন্ কাজ হয়? ১১৬। সমভূমি অঞ্চলে নদী কি কি কাজ করে? ১১৭। মোহনার নিকট নদী কি কি কাজ করে? ১১৮। অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ কিভাবে সৃষ্টি হয়? ১১৯। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ অংশে এরূপ হ্রদ বেশী? ১২০। বদ্বীপ কিভাবে সৃষ্টি হয়? ১২১। হিমবাহ কাহাকে বলে? ১২২। গ্রাবরেখা কি? প্রান্ত গ্রাবরেখা কাহাকে বলে? ১২৩। বালিয়াড়ি কাহাকে বলে? ১২৪। হামাদা কাহাকে বলে? ১২৫। বারখান কি? সিরক্কো বায়ু কি?

আঞ্চলিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক ভূগোল

১। ভারতের উত্তর সীমার অক্ষাংশ কত? ২। দক্ষিণ সীমার অক্ষাংশ কত? ৩। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ স্থান কর্কটক্রান্তির আশপাশে? ৪। ভারতের পশ্চিম সীমার দেশান্তর কত? ৫। পূর্ব সীমার দেশান্তর কত? ৬। ৮২$\frac{১}{২}^\circ$ পূঃ দ্রাঃ ভারতের কোন্ স্থানের পাশ দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত? ৭। ভারতের আয়তন কত? ৮। ৮২$\frac{১}{২}^\circ$ পূঃ দ্রাঃ অনুসারে ভারতের প্রমাণ সময় স্থির করা হয় কেন? ৯। ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতে কয়টি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশ ছিল? ১০। এদেশ কবে সার্বভৌম গণতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়? ১১। ১৯৫৬ খ্রীঃ ১লা নভেম্বর রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠনের ফলে এদেশে কয়টি গভর্ণর-শাসিত রাজ্য ও কয়টি কেন্দ্র-শাসিত রাজ্য ছিল? ১২। এখন ভারতে কয়টি গভর্ণর-শাসিত রাজ্য

পড়িয়াছে? ১৭৮। ইহার কোন্ জলপ্রপাত বিখ্যাত? ১৭৯। ভারতের আর কোন্ বড় নদী পশ্চিমদিকে প্রবাহিত? ১৮০। ইহার উৎস কোথায় এবং কোন্ সাগরে পড়িয়াছে? ১৮১। ভারতের সর্বোচ্চ জলপ্রপাত কোন্ নদীতে? ১৮২। ভারতের অন্তর্দেশীয় নদীগুলির মধ্যে কোন্‌টি বড়? ১৮৩। গ্রীষ্মকালে ভারতের কোন্ অংশের উষ্ণতা সবচেয়ে বেশী? ১৮৪। তখন দেশের দক্ষিণ উপকূলের উষ্ণতা কিরূপ? ১৮৫। তখন হিমালয়ের শ্রীনগর, সিমলা, দার্জিলিং-এর উষ্ণতা কিরূপ? ১৮৬। শীতকালে রাজস্থান হইতে পঞ্জাব পর্যন্ত উষ্ণতার পরিমাণ কিরূপ? ১৮৭। তখন দেশের দক্ষিণ উপকূলের উষ্ণতা কিরূপ? ১৮৮। গ্রীষ্মকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে বায়ুর চাপ কিরূপ? ১৮৯। তখন কোন্ দিক্ হইতে এদেশের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়? ১৯০। ঐ বায়ুর আরব সাগরীয় শাখা কোথায় অধিক বাধা পায়? ১৯১। তাহাদ্বারা কোথায় অধিক বৃষ্টি হয়? ১৯২। মৌসুমী বায়ুর কোন্ শাখাদ্বারা দেশের অধিকাংশ স্থানে বৃষ্টি হয়? ১৯৩। এই বায়ুদ্বারা দেশের কোন্ অংশে অধিক বৃষ্টি হয়? ১৯৪। কোন্ কোন্ স্থানের বৃষ্টির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী? ১৯৫। এদেশের পক্ষে এই সময়ের বৃষ্টির গুরুত্ব কিরূপ? ১৯৬। শীতকালে এদেশের কোন্ কোন্ অংশে বৃষ্টি হয়? ১৯৭। ঐ সকল স্থানে এই বৃষ্টির গুরুত্ব কিরূপ? ১৯৮। মোটামুটি হিসাবে ভারতের কত অংশ বনভূমি? ১৯৯। দেশের কোন্ কোন্ অংশে আয়তনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ বেশী? ২০০। এদেশের কোথায় কোথায় ক্রান্তীয় প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের বন আছে? ২০১। কোন্ কোন্ গাছ এখানে বেশী? ২০২। এদেশের কোন্ কোন্ অংশে মিশ্রবৃক্ষের অরণ্য অধিক? ২০৩। এসকল স্থানে কোন্ কোন্ গাছ বেশী? ২০৪। এদেশের পার্বত্য অঞ্চলে কোন্ জাতীয় গাছ অধিক? ২০৫। তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ গাছ বেশী? ২০৬। এসকল গাছের কাঠ কোন্ কোন্ কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়? ২০৭। এদেশে সেগুন কাঠ কোন্ কোন্ কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়? ২০৮। শাল, গর্জন প্রভৃতি কাঠ কোন্ কাজে বেশী ব্যবহৃত হয়? ২০৯। এদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে পাহাড়, পর্বতের গায়ে কোন্ মৃত্তিকা বেশী? ২১০। কোন কাজের পক্ষে তাহার গুরুত্ব অধিক? ২১১। উত্তর ভারতের সমভূমির মৃত্তিকা কোন্ জাতীয়? ২১২। উত্তর প্রদেশের ভাট মৃত্তিকা কোন্ ফসল চাষের পক্ষে উপযোগী? ২১৩। ভুর ও ভাবর কোন্ জাতীয় মৃত্তিকা? ২১৪। দোআঁশ মৃত্তিকা কৃষির পক্ষে কিরূপ উপযোগী? ২১৫। এঁটেল মাটি কোন্ কোন্ ফসলের চাষের পক্ষে ভাল? ২১৬। দাক্ষিণাত্য মালভূমির বেশীর ভাগ স্থানের মৃত্তিকা কোন্ জাতীয়? ২১৭। ইহা কোন্ কোন্ ফসলের চাষের পক্ষে উপযোগী? ২১৮। এই অঞ্চলের ল্যাটারাইট মৃত্তিকার উর্বরতা কিরূপ? ২১৯। উপকূল অঞ্চলের লোনা মাটি কোন্ প্রকার গাছের পক্ষে সুবিধাজনক? ২২০। ভারতের কোন্ অংশে কূপ ও নলকূপের সাহায্যে অধিক সেচকার্য হয়? ২২১। ভারতের কোন্ অংশে জলাশয়ের সাহায্যে অধিক সেচকার্য হয়? ২২২। এখানকার দুইটি বিখ্যাত জলাশয়ের নাম লিখ। ২২৩। সেচকার্যে ব্যবহৃত ভারতের কয়েকটি স্থায়ী খালের নাম লিখ। ২২৪। বহুমুখী নদী উপত্যকা প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কি? ২২৫। দামোদর উপত্যকা প্রকল্প অনুসারে কোন্ কোন্ বাঁধ ও ব্যারেজ তৈরী হইয়াছে? ২২৬। এই প্রকল্পদ্বারা দেশের কোন্ অংশের উপকার হইতেছে? ২২৭। ময়ূরাক্ষী প্রকল্প অনুসারে কোথায় বাঁধ ও ব্যারেজ তৈরী হইয়াছে? ২২৮। কোন্ নদীর উপর ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরী হইয়াছে? ২২৯। ইহাদ্বারা কি উপকার হইতেছে? ২৩০। কোশী প্রকল্প অনুসারে কোথায় বাঁধ তৈরী হইয়াছে? ২৩১। গণ্ডক প্রকল্প অনুসারে কোথায় বাঁধ তৈরী হইয়াছে? ২৩২। এই দুই প্রকল্প দ্বারা ভারত ভিন্ন আর কোন্ দেশের উপকার হইতেছে? ২৩৩। সারদা সহায়ক প্রকল্প দ্বারা কোন্ রাজ্যের অধিক উপকার হইতেছে? ২৩৪। ভারতের বৃহত্তম নদী প্রকল্প কি? ২৩৫। কোন্ নদীর উপর এই প্রকল্প অনুসারে বাঁধ তৈরী হইয়াছে? ২৩৬। এই প্রকল্পদ্বারা কোন্ কোন্ রাজ্য উপকৃত হইতেছে? ২৩৭। পৃথিবীর দীর্ঘতম সেচখাল কোথায়? ২৩৮। কোন্ কোন্ নদী প্রকল্প অনুসারে গুজরাটে সেচকার্য হইতেছে? ২৩৯। নাগার্জুন সাগর প্রকল্প কোন্ নদীর সহিত যুক্ত? ২৪০। পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ কি? ২৪১। তাহা কোন্ নদীর উপর তৈরী? ২৪২। ভারতে কি উদ্দেশ্যে ও

কি ভাবে কৃষি বিপ্লব হইতেছে? ২৪৩। এদেশের দুইটি প্রধান রবিশস্যের ও দুইটি প্রধান খারিফ ফসলের নাম লিখ। ২৪৪। ভারতের সর্বপ্রধান কৃষিজ সম্পদ্ কি? ২৪৫। ধান উৎপাদন সম্বন্ধে পৃথিবীতে ভারতের স্থান কত? ২৪৬। কখন আউস ধানের চাষ হয় ও কখন ফসল পাকে? ২৪৭। কখন আমন ধানের চাষ হয়? কখন ফসল পাকে? ২৪৮। কোন্ পদ্ধতিতে ইহার চাষ হয়? ২৪৯। কখন বোরো ধানের চাষ হয়? ২৫০। ইহার চাষ ক্রমশঃ বাড়িবার কারণ কি? ২৫১। ভারতের দ্বিতীয় খাদ্যশস্য কি? ২৫২। ইহা কোন্ সময়ের ফসল? ২৫৩। কোন্ কোন্ রাজ্যে ইহা অধিক জন্মে? ২৫৪। শুষ্ক অঞ্চলে কোন্ কোন্ খাদ্যশস্য জন্মে? ২৫৫। এদেশের সর্বপ্রধান বাণিজ্যিক ফসল কি? ২৫৬। তাহা কোন্ প্রকার মৃত্তিকাতে জন্মে? ২৫৭। তাহার জন্য সেচের প্রয়োজন কিরূপ? ২৫৮। কোন্ কোন্ রাজ্যে কার্পাস অধিক জন্মে? ২৫৯। কিরূপ জমিতে পাট ও মেস্তার চাষ হয়? ২৬০। ইহাদের জন্য কিরূপ জলবায়ু প্রয়োজন? ২৬১। ভারতের কোন্ অংশে ইহাদের চাষ বেশী? ২৬২। ইহাদের চাহিদা কমিয়া গেলে ইহাদের পরিবর্তে কোন্ ফসলের চাষ করা যায়? ২৬৩। কিরূপ মৃত্তিকাতে আখের চাষ হয়? ২৬৪। ইহার চাষের জন্য কিরূপ জলবায়ু দরকার? ২৬৫। এদেশে কোথায় সবচেয়ে বেশী আখ জন্মে। ২৬৬। আখের উৎপাদন সম্পর্কে পৃথিবীতে ভারতের স্থান কিরূপ? ২৬৭। কিরূপ ভূপ্রকৃতি ও মৃত্তিকাতে চা গাছ জন্মে? ২৬৮। ইহার জন্য কিরূপ জলবায়ু প্রয়োজন? ২৬৯। ইহার চাষের কাজে মেয়ে ও শিশুশ্রমিক নিযুক্ত হয় কেন? ২৭০। এদেশের কোন্ কোন্ অংশে চা অধিক উৎপন্ন হয়? ২৭১। এদেশে কোথায় কফি অধিক জন্মে? ২৭২। ভারতে শক্তির প্রধান উৎসগুলি কি? ২৭৩। কোন্ কোন্ সূত্র (source) হইতে তাপবিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়? ২৭৪। তাপবিদ্যুৎশক্তির তুলনায় জলজ বিদ্যুৎশক্তির সুবিধা কিরূপ? ২৭৫। ভারতে কোথায় আণবিকশক্তি উৎপন্ন হয়? ২৭৬। ভারতের সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ্ কি? ২৭৭। তাহা এদেশে কোন্ কোন্ কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়? ২৭৮। কয়লাকে শক্ত কোকে পরিণত করিবার সময় কোন্ কোন্ উপজাতদ্রব্য পাওয়া যায়? ২৭৯। এদেশে কোন্ রাজ্যে অধিক কয়লা পাওয়া যায়? ২৮০। এদেশের সর্বপ্রধান কয়লাখনি কোথায়? ২৮১। বিহারের আর কোন্ কোন্ স্থানে কয়লা পাওয়া যায়? ২৮২। কয়লা উৎপাদন সম্পর্কে কোন্ রাজ্যের স্থান বিহারের পরে? ২৮৩। এখানকার প্রধান খনি কোথায়? ২৮৪। এদেশের আর কোন্ কোন্ রাজ্যে কয়লা পাওয়া যায়? ২৮৫। এদেশে লিগনাইট কোথায় বেশী পাওয়া যায়? ২৮৬। ভারতে খনিজ তৈল কোন্ কোন্ রাজ্যে পাওয়া যায়? ২৮৭। আসামের কোন্ কোন্ কেন্দ্রে তাহা পাওয়া যায়? ২৮৮। গুজরাটের কোন্ কোন্ কেন্দ্রে তাহা অধিক পাওয়া যায়? ২৮৯। ভারতের মূল ভূভাগের অদূরে কোথায় তাহা পাওয়া যায়? ২৯০। এদেশের কোথায় কোথায় তৈল শোধনাগার আছে? ২৯১। তৈল শোধনের সময় কোন্ কোন্ উপজাতদ্রব্য পাওয়া যায়? ২৯২। তাহাদের কোন্‌টি কোন্ কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়? ২৯৩। এদেশের কোন্ রাজ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক লৌহ আকরিক পাওয়া যায়? ২৯৪। এই রাজ্যের প্রধান খনিগুলি কোথায়? ২৯৫। বিহার রাজ্যে কোথায় লৌহ পাওয়া যায়? ২৯৬। মধ্যপ্রদেশে কোথায় লৌহ পাওয়া যায়? ২৯৭। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও তাহাদের আশপাশে কোথায় লৌহ পাওয়া যায়? ২৯৮। এদেশে বক্সাইট কোথায় অধিক পাওয়া যায়? ২৯৯। এদেশে ম্যাঙ্গানিজ কোথায় অধিক পাওয়া যায়? ৩০০। অভ্র এদেশে কোথায় বেশী পাওয়া যায়? ৩০১। এদেশে সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ্‌ভিত্তিক শিল্প কি? ৩০২। তাহার সর্বপ্রধান কেন্দ্র কোথায়? ৩০৩। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পে সরকারী প্রচেষ্টায় এদেশে কোন্ কোন্ ইস্পাতকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে? ৩০৪। ইহাদের অধিকাংশ একই অঞ্চলে স্থাপিত হওয়ার কারণ কি? ৩০৫। সম্প্রতি কোন্ ইস্পাতকেন্দ্র তৈরী হইয়াছে এবং আর কোথায় কোথায় এরূপ কেন্দ্র তৈরী হইতেছে? ৩০৬। এদেশে মোটরগাড়ী তৈরীর বৃহত্তম কেন্দ্র কোথায়? ৩০৭। রেলগাড়ির ইঞ্জিন তৈরীর বৃহত্তম কেন্দ্র কোথায়? ৩০৮। এদেশে জাহাজ তৈরীর বৃহত্তম কেন্দ্র কোথায়? ৩০৯। এদেশে বিমানপোত তৈরীর সর্বপ্রধানকেন্দ্র কোথায়? ৩১০। এদেশে কার্পাসবস্ত্র শিল্পের সর্বপ্রধান অঞ্চল কোন্‌টি? এই অঞ্চলে সর্বপ্রধান কেন্দ্র কি কি? ৩১১। এই শিল্পের দক্ষিণ ভারত অঞ্চলের কোন্ কেন্দ্র সবচেয়ে বড়? ৩১২। এই শিল্পের পশ্চিমবঙ্গের তিনটি কেন্দ্রের নাম লিখ। ৩১৩। এদেশের পাট শিল্পের সর্বপ্রধান অঞ্চল কোথায়?

৩১৪। এখানে এই শিল্পের উন্নতির কারণ কি? ৩১৫। এখানকার তিনটি কেন্দ্রের নাম লিখ।

[নৈর্ব্যক্তিক বা বস্তুধর্মী অভীক্ষা (Objective Test) সহ]

I সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ।

১। সূর্যের উপরিভাগের উত্তাপের পরিমাণ কত? ২। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব কত? ৩। সৌরজগতে কতগুলি গ্রহ আছে? ৪। পৃথিবীর গতি কয়টি? ৫। পৃথিবীর নিজের মেরুরেখার চারিদিকে একবার আবর্তন করিবার জন্য কত সময় প্রয়োজন? ৬। সূর্যের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ বা পরিক্রমণ করিবার জন্য পৃথিবীর কত সময় প্রয়োজন? ৭। বিষুব বলিলে কি বুঝ? ৮। কোন্ তারিখকে উত্তর অয়নান্ত দিবস বলে? ৯। নিরক্ষরেখা কি? ১০। মূল মধ্যরেখা বা প্রধান দ্রাঘিমারেখা কি? ১১। সুমেরু বৃত্ত কি? ১২। মকরক্রান্তির অক্ষাংশ কত? ১৩। সুমেরুর অক্ষাংশ কত? ১৪। কলিকাতার অক্ষাংশ কত? ১৫। I. S. T. বা ভারতের প্রমাণ কাল বলিলে কি বুঝায়? ১৬। G. M. T. বা গ্রীনিচ প্রমাণ কাল বলিলে কি বুঝায়? ১৭। প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমাতে বা দেশান্তরে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য কত? ১৮। পৃথিবী কোন্ দিকে (সূর্যের চারিদিকে) পরিক্রমণ করে? ১৯। ভূপৃষ্ঠে কোন্ দিকে স্থানীয় সময়ের বৃদ্ধি হয়? ২০। কলিকাতার প্রতিপাদস্থান কোথায় অবস্থিত? ২১। একটি উদ্বেধী শিলার নাম কর। ২২। একটি নিঃসারী শিলার নাম কর। ২৩। পাললিক শিলা বলিলে কি বুঝায়? ২৪। চুনাপাথর হইতে পরিবর্তিত শিলার নাম কি? ২৫। স্তূপ পর্বত কাহাকে বলে? ২৬। গ্রস্ত উপত্যকা বলিলে কি বুঝায়? ২৭। আরাবল্লী কোন্ জাতীয় পর্বত? ২৮। ভারতের কোথায় লাভা-উপত্যকা দেখা যায়? ২৯। ভারতের কোথায় মোনাডনক দেখা যায়? ৩০। ভারতের কোন্ অংশে বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমি আছে? ৩১। ভূমিকম্পের উৎপত্তির কেন্দ্র কোথায় তাহা কিভাবে জানা যায়? ৩২। ভূমিকম্পের সর্বপ্রধান অঞ্চল কোন্‌টি? ৩৩। কোন্ কোন্ শক্তিদ্বারা ভূপৃষ্ঠের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন হয়? ৩৪। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গিরিখাত কোথায়? ৩৫। পৃথিবীর সর্বোচ্চ জলপ্রপাত কোথায়? ৩৬। অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ বলিলে কি বুঝায়? ৩৭। পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ কোথায়? ৩৮। হিমবাহ কি? ৩৯। প্রান্ত গ্রাবরেখা বলিলে কি বুঝায়? ৪০। সীফ বালিয়াড়ি কি? ৪১। ভারতের কোন্ অংশের উপর দিয়া কল্পিত কর্কটক্রান্তি রেখা বিস্তৃত ৪২। কখন ভারত সার্বভৌম গণতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়? ৪৩। এখন ভারতে কয়টি গভর্নর-শাসিত রাজ্য আছে? ৪৪। এখন ভারতে কয়টি কেন্দ্র-শাসিত রাজ্য আছে? ৪৫। নেপালের রাজধানী কোথায়? ৪৬। নেপালের কোন্ অংশে পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরি-শৃঙ্গ অবস্থিত? ৪৭। কোথায় বা কোন্ দেশে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাট জন্মে? ৪৮। কোন্ দেশকে সুদূর প্রাচ্যের ধানভাণ্ডার বলে? ৪৯। শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বড় নদী কোনটি? ৫০। জেকোবাবাদ কেন প্রসিদ্ধ? ৫১। করাচি কোথায়? ৫২। আফগানি-স্থানের কোন্ অংশে হিন্দুকুশ পর্বত? ৫৩। কারাকোরম পর্বত কোথায়? ৫৪। গঙ্গার সর্বপ্রধান উপনদী কি? ৫৫। বিন্ধ্য পর্বত কোথায়? ৫৬। কোন্ নদীর উপর ভাকরা বাঁধ তৈরী হইয়াছে? ৫৭। চেরাপুঞ্জি কেন প্রসিদ্ধ? ৫৮। ভারতের কোন্ অংশে মরুভূমির জলবায়ু দেখা যায়? ৫৯। ভারতের কোথায় রেগার মৃত্তিকা আছে? ৬০। ভারতে মৌসুমী উদ্ভিদ্ অঞ্চল কতদূর বিস্তৃত? ৬১। ভারতের কোন্ অংশে গভীর কূপের সাহায্যে সেচব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ? ৬২। নাঙ্গল বাঁধ কোথায়? ৬৩। ভারতের কোন্ রাজ্যে সবচেয়ে বেশী ধান জন্মে? ৬৪। ভারতের কোন্ রাজ্যে সবচেয়ে বেশী কয়লা উৎপন্ন হয়? ৬৫। ভারতে ইস্পাতশিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র কোথায়?

II নৈর্ব্যক্তিক বা বস্তুধর্মী অভীক্ষা

I. নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

(ক) নিম্নে কতকগুলি ভৌগোলিক বিবৃতি দেওয়া আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি 'সত্য' ও কতকগুলি 'অসত্য'। প্রত্যেকটি 'সত্য' বিবৃতির ডানদিকে √ চিহ্ন দাও ও প্রত্যেকটি 'অসত্য' বিবৃতির ডানদিকে × চিহ্ন দাও। কোন বিবৃতি সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ থাকিলে তাহার ডানদিকে ? চিহ্ন দাও।

১। পৃথিবীর আকৃতি প্রায় গোল।
২। মহাকাশ হইতে গৃহীত ফটোচিত্র পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে সর্বোপেক্ষা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নহে।
৩। পৃথিবীর মেরুদেশীয় ব্যাস প্রায় ১২৭৫৭ কিঃ মিঃ।
৪। পৃথিবী আপন মেরুরেখার চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আবর্তন করে।
৫। পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্য সূর্যের আপাত উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গতি।
৬। ভূপৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থিতি সঠিকভাবে নির্দেশ করার জন্য অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সাহায্য অত্যাবশ্যক।
৭। কোন স্থানে মধ্যাহ্নে সূর্যের ঠিক মাথার উপরে অবস্থিতির সাহায্যে তথাকার স্থানীয় সময় নির্ণয় করা হয়।
৮। গ্র্যানাইট একটি বিখ্যাত পাললিক শিলা।
৯। হিমালয় একটি ভঙ্গিল পর্বত।
১০। ছোটনাগপুর ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমির উদাহরণ।
১১। ভূমিকম্পের উৎপত্তিকেন্দ্রের সোজাসুজি উপরে ভূমিকম্পের তীব্রতা সবচেয়ে কম।
১২। নদীর কেবলমাত্র উচ্চগতিতে গিরিখাত বা ক্যানিয়ন সৃষ্টি হয়।
১৩। নদীর কেবলমাত্র নিম্নগতিতে ক্ষয়, পরিবহন ও সঞ্চয় কার্য দেখা যায়।
১৪। কেবলমাত্র হিমবাহ দ্বারা গ্রাবরেখা সঞ্চিত হয়।
১৫। প্রায়ই বালিয়াড়ির আকৃতি ও আয়তনের পরিবর্তন ঘটে।

(খ) নিম্নে কয়েকটি অসম্পূর্ণ বিবৃতি দেওয়া গেল। ইহাদের প্রত্যেকটির ডানদিকে কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাও (underline)।

১। সূর্যের উপরিভাগের উষ্ণতা প্রায় ——। ৫০০° সে, ১০০০° সে, ৬০০০° সে।
২। সৌরজগতের মঙ্গল, বৃহস্পতি, পৃথিবী প্রভৃতিকে ইহাদের —— জন্য গ্রহ বলা হয়। গতি, আকৃতি, আয়তন।
৩। পৃথিবীর চারিদিকে একবার আবর্তন করিবার জন্য চন্দ্রের —— দিন দরকার। ½, ৭, ২৭½।
৪। পৃথিবীর আকৃতি ——। সম্পূর্ণ গোল, প্রায় গোলাকার।
৫। পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস প্রায় —— কিঃ মিঃ। ১২৭১৪, ১২৭৫৭।
৬। পৃথিবীর আবর্তন গতিকে —— ও বলা হয়। পরিক্রমণ, আহ্নিক গতি।
৭। পৃথিবীর —— গতির জন্য প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা প্রভৃতি অবস্থা পর পর উপস্থিত হয়। আবর্তন, পরিক্রমণ।
৮। পৃথিবীর —— গতির জন্য ভূপৃষ্ঠে বায়ুর গতিবিক্ষেপ হয়। আবর্তন, পরিক্রমণ।
৯। সূর্যের আপাত উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গতির সাহায্যে নির্ভুলরূপে প্রমাণিত হয় যে পৃথিবীর —— গতি আছে। আবর্তন, পরিক্রমণ।
১০। —— বন্দর ও নিকটবর্তী স্থানসমূহ নিশীথ সূর্যের দেশ নামে পরিচিত। লণ্ডন, টোকিও, হ্যামারফেস্ট।
১১। ২৩শে সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি ——র উপর লম্বভাবে পতিত হয়। কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি, নিরক্ষরেখা।
১২। ২১শে জুন উত্তর গোলার্ধে ——। শীতকালের মধ্যভাগ, গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগ।
১৩। উত্তর গোলার্ধের পক্ষে ২১শে মার্চ ——। জলবিষুব, মহাবিষুব।
১৪। ভূপৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থিতি সঠিকভাবে নির্দেশ করিবার জন্য ——টি গুরুত্বপূর্ণ স্থির বা নির্দিষ্ট রেখার সাহায্য একান্ত আবশ্যক। এক, দুই, তিন।

১৫। প্রত্যেকটি দ্রাঘিমারেখা —— রেখার উপর লম্বভাবে অবস্থিত। মূল মধ্যরেখা, নিরক্ষরেখা।
১৬। প্রত্যেকটি অক্ষরেখা —— বিস্তৃত। উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে।
১৭। ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানের নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে কৌণিক দূরত্বকে তথাকার —— বলে। অক্ষাংশ, দেশান্তর।
১৮। কলিকাতার দেশান্তর প্রায় ——। ৮৮°২৪′ পূঃ, ২২°৩৪′ উঃ।
১৯। প্রতি ডিগ্রি ——এ ৪ মিনিট হিসাবে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য হয়। দেশান্তর, অক্ষাংশ।
২০। কলিকাতার (৮৮½° পূঃ) স্থানীয় সময় এলাহাবাদের (৮২½° পূঃ) স্থানীয় সময়ের তুলনায় ——মিনিট বেশী বা অগ্রগামী। ৬, ২৪।
২১। ভারতের প্রমাণকাল (I.S.T.) ——° দেশান্তর অনুসারে নির্ণয় করা হয়। ০°, ৮২½° পূঃ, ৮৮½° পূঃ।
২২। আন্তর্জাতিক তারিখরেখা প্রধানতঃ ——° দ্রাঃ অনুসারে স্থির করা হয়। ০°, ৯০° পূঃ, ১৮০°।
২৩। লণ্ডনের প্রতিপাদস্থান ——র দক্ষিণ-পূর্বদিকে। কলিকাতা, নিউ জীল্যাণ্ড, নিউ ইয়র্ক।
২৪। —— শিলার মধ্যে কোন স্তর নাই ; তাহাকে প্রাথমিক শিলাও বলা হয়। পাললিক, আগ্নেয়।
২৫। আল্পস, হিমালয়, রকি প্রভৃতি —— জাতীয় পর্বত। স্তূপ, ভঙ্গিল, নগ্নীভূত বা ক্ষয়জাত।
২৬। পশ্চিমঘাট, আরাবল্লী প্রভৃতি —— জাতীয় পর্বত। স্তূপ, ভঙ্গিল, ক্ষয়জাত বা নগ্নীভূত।
২৭। দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর-পশ্চিম অংশ —— জাতীয় মালভূমির উদাহরণ। পর্বতবেষ্টিত, লাভা, ব্যবচ্ছিন্ন।
২৮। গঙ্গা সমভূমি —— জাতীয় সমভূমি। পাললিক, লোয়েস, হ্রদ।
২৯। —— আগ্নেয়গিরি অঞ্চলের সর্বপ্রধান উদাহরণ। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান।
৩০। নদীর —— গতিতে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়। নিম্ন, মধ্য, উচ্চ।
৩১। নদীর ——গতিতে অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি হয়। উচ্চ, নিম্ন।
৩২। নদীর ক্ষয়ীভবনের এক বিশিষ্ট উদাহরণ ——। গিরিখাত, বদ্বীপ।
৩৩। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৭টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল ও —— টি গভর্ণর-শাসিত রাজ্য আছে। ২০, ২২, ২৪।
৩৪। ভারতের প্রতিবেশী দেশ ভুটান, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, আফগানিস্থান ও ——। ইরান, নেপাল।
৩৫। হিমালয়ের এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলগিরি শৃঙ্গ —— দেশে। ভারত, চীন, নেপাল।
৩৬। নেপালের রাজধানী ——। কপিলবস্তু, কাঠমণ্ডু।
৩৭। ভুটানের রাজধানী ——। থিম্পু, প্যারো।
৩৮। বাংলাদেশের সর্বপ্রধান নদী ——। যমুনা, পদ্মা।
৩৯। বাংলাদেশে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী —— জন্মে। ধান, পাট।
৪০। —— বাংলাদেশের সর্বপ্রধান বন্দর। ঢাকা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম।
৪১। —— ব্রহ্মদেশের সর্বপ্রধান নদী। চিন্দুইন, ইরাবতী।
৪২। ভারতের —— দিকে শ্রীলঙ্কা। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব।
৪৩। পাকিস্তানের —— পৃথিবীর উষ্ণতম স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। জেকোবাবাদ, ইসলামাবাদ, করাচি।
৪৪। আফগানিস্থানের রাজধানী ——। গজনী, কাবুল, হিরাট।
৪৫। —— নদীর উপত্যকা 'ভূস্বর্গ' নামে পরিচিত। গোদাবরী, বিতস্তা, ব্রহ্মপুত্র।
৪৬। হিমালয়ের পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য প্রায় —— কিঃ মিঃ। ৫০০, ২৫০০, ৫০০০।

৪৭। —— পৃথিবীর প্রাচীনতম ও ক্ষয়জাত পর্বতগুলির মধ্যে অন্যতম। হিমালয়, আরাবল্লী।
৪৮। পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বত দক্ষিণদিকে —— পাহাড়ে মিলিত হইয়াছে। বিন্ধ্য, নীলগিরি, আনাইমুদি।
৪৯। ভারতের পূর্ব উপকূলের দক্ষিণ অংশকে —— উপকূল বলে। মালাবার, করমণ্ডল।
৫০। —— গঙ্গার সর্বপ্রধান উপনদী। যমুনা, কোশী।
৫১। বিতস্তা নদীর উপর বিখ্যাত —— বাঁধ। ক্যানাডা, ভাকরা, হিরাকুন্দ।
৫২। দাক্ষিণাত্যের সর্বপ্রধান নদী ——কে দক্ষিণের গঙ্গাও বলে। মহানদী, গোদাবরী, নর্মদা।
৫৩। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর —— শাখা দ্বারা ভারতের পশ্চিম উপকূলে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়। আরব সাগরীয়, বঙ্গোপ সাগরীয়।
৫৪। গ্রীষ্মকালে রাজস্থানে —— চাপ কেন্দ্র সৃষ্টি হয়। উচ্চ, নিম্ন।
৫৫। ভারতের —— অংশে বৎসরে দুইবার অধিক বৃষ্টি হয়। উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব।
৫৬। হিমালয়ের উচ্চ অংশে —— গাছের বন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রশস্ত পত্রযুক্ত পর্ণমোচী, সরলবর্গীয়।
৫৭। দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে —— জাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায়। পাললিক, রেগার, ল্যাটারাইট।
৫৮। দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে ——এর সাহায্যে সেচকার্য হয়। জলাশয়, কূপ, খাল।
৫৯। ধান উৎপাদন সম্পর্কে ভারতের স্থান পৃথিবীতে ——। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়।
৬০। ভারতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী —— জন্মে। গম, চা, পাট।
৬১। ভারতে কয়লা উৎপাদনের সর্বপ্রধান কেন্দ্র ——। ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ।
৬২। ভারতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী —— উৎপন্ন হয়। অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ।
৬৩। ভারতে ইস্পাতশিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র ——। দুর্গাপুর, বোকারো, জামসেদপুর।
৬৪। ভারতে কার্পাসবস্ত্র শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র ——। বোম্বাই, আমেদাবাদ, কইম্বেটোর।
৬৫। পাট শিল্প —— রাজ্যের সর্বপ্রধান শিল্প। আসাম, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ।

(গ) নিম্নে কয়েকটি অসম্পূর্ণ বাক্য দেওয়া গেল। ইহাদের প্রত্যেকটি শূন্য (—) স্থানে এমন একটি উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার কর যাহাতে প্রত্যেকটি বাক্যের ভৌগোলিক সার্থকতা হয়।

১। সূর্যের আয়তন ——র আয়তনের তুলনায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়।
২। চন্দ্র পৃথিবী হইতে —— কিঃ মিঃ দূরে থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে।
৩। সৌরজগতের গ্রহগণের মধ্যে সূর্য হইতে দূরত্ব হিসাবে পৃথিবীর স্থান ——।
৪। পৃথিবীর মেরুদেশীয় ব্যাস নিরক্ষীয় ব্যাসের চেয়ে ——।
৫। পৃথিবীর আবর্তন গতিকে ——ও বলা হয়।
৬। পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে উত্তর গোলার্ধের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ু —— দিকে বিক্ষিপ্ত হয়।
৭। পৃথিবীর পরিক্রমণ গতিকে ——ও বলা হয়।
৮। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের অরোরা অস্ট্রেলিস উত্তর মেরু অঞ্চলের ——র অনুরূপ।
৯। উত্তর গোলার্ধের পক্ষে ২১শে মার্চ —— বিষুব।
১০। গ্রীষ্মকালে দিবামান রাত্রির চেয়ে ——।
১১। সকল অক্ষরেখা ——র সমান্তরাল।
১২। সকল মধ্যরেখা মূল মধ্যরেখার ——।
১৩। মূল মধ্যরেখার দেশান্তর ——°।
১৪। মকরক্রান্তির অক্ষাংশ ——° দঃ অঃ।
১৫। প্রত্যেক মধ্যরেখা একটি —— বৃত্ত।
১৬। —— দ্রাঃ অনুসারে গ্রীনিচ প্রমাণ সময় (G. M. T.) গণনা করা হয়।

১৭। অন্তর্জাতিক তারিখ রেখা প্রায় ——° অনুসারে নির্ণয় করা হয়।
১৮। ব্যাসল্ট একটি —— শিলা।
১৯। বেলেপাথর একটি —— শিলা।
২০। মার্বেল একটি ——শিলা।
২১। মার্বেল —— হইতে রূপান্তরিত হয়।
২২। অতীতকালে যেখানে —— সমুদ্র ছিল তথায় বর্তমানে হিমালয় পর্বত।
২৩। নীলগিরি একটি —— পর্বত।
২৪। জাপানের —— একটি সঞ্চয়জাত পর্বত।
২৫। আরাবল্লী একটি —— পর্বত।
২৬। ফ্রান্সের সেন্ট্রাল মাসিফ একটি —— মালভূমি।
২৭। ভারতের ——এ ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি দেখা যায়।
২৮। ভারতের —— উপত্যকাতে হ্রদ সমভূমি দেখা যায়।
২৯। আগ্নেয়গিরির কম্পন সবচেয়ে বেশী ——র সোজাসুজি উপরে।
৩০। আগ্নেয়গিরির পি-তরঙ্গকে অনুসরণ করে ——।
৩১। গিরিখাতের আকৃতি ——র মত।
৩২। নদীর উচ্চগতিতে ক্ষয়ীভূত উপাদানের —— হয় না।
৩৩। নদীর নিম্নগতিতে —— ক্বচিৎ দেখা যায়।
৩৪। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার —— পৃথিবীতে বৃহত্তম।
৩৫। অর্ধচন্দ্রাকৃতি বালিয়াড়িকে —— বলা হয়।
৩৬। ——° দ্রাঃ রেখা ভারতের প্রায় মধ্যভাগ দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত।
৩৭। ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতে ১১টি গভর্নর-শাসিত রাজ্য ছিল; এখন ঐরূপ রাজ্যের সংখ্যা ——।
৩৮। ভারতের গভর্নর-শাসিত রাজ্যের মধ্যে সিকিম ক্ষুদ্রতম, —— বৃহত্তম।
৩৯। হিমালয়ের তিনটি উচ্চতম শৃঙ্গ —— (দেশে) অবস্থিত।
৪০। বাংলাদেশের সর্বপ্রধান নদী ——।
৪১। বাংলাদেশের সর্বপ্রধান শিল্প ——।
৪২। ——কে 'সুদূর প্রাচ্যের ধান ভাণ্ডার' বলে।
৪৩। ভারত ও ——র মধ্যে পকপ্রণালী।
৪৪। পাকিস্তানের সর্বপ্রধান নদী ——।
৪৫। আফগানিস্থানের বিস্তীর্ণ অংশের জলবায়ু ——।
৪৬। হিমালয়ের —— অংশ প্রধান হিমালয়।
৪৭। ভারতের বৃহৎ সমভূমির পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য প্রায় —— কিঃ মিঃ।
৪৮। দাক্ষিণাত্য মালভূমি পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম ভূখণ্ড ——এর অংশ।
৪৯। দাক্ষিণাত্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ —— (২৬৯৫ মিঃ)।
৫০। ——, বিপাসা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা সিন্ধুর বামতটের উপনদী।
৫১। সরাবতী নদীর —— প্রপাত ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত।
৫২। গ্রীষ্মকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে —— চাপকেন্দ্র সৃষ্টি হয়।
৫৩। মেঘালয়ের মৌসিনরাম ও —— অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য প্রসিদ্ধ।
৫৪। দাক্ষিণাত্যের —— অংশে রেগার মৃত্তিকা দেখা যায়।
৫৫। তিলাইয়া, —— ও কোনার বাঁধ দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।
৫৬। আমন ধান রোপণ পদ্ধতিতে চাষ করা হয়, আর আউস ধান চাষ করা হয় —— পদ্ধতিতে।
৫৭। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আখের চাষ হয় —— (রাজ্যে)।
৫৮। বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী —— এদেশে তৈল উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র।
৫৯। বিহারের —— এদেশে ইস্পাতশিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র।
৬০। অন্ধ্র প্রদেশের —— এদেশে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র।
৬১। —— এদেশে কার্পাস বস্ত্র শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র।

(ঘ) নিম্নে কয়েকটি একাধিক শূন্য স্থান (—) যুক্ত অসম্পূর্ণ বাক্য দেওয়া গেল। ইহাদের প্রত্যেকটি শূন্য স্থানে এক একটি উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া প্রত্যেকটি বাক্যের ভৌগোলিক সার্থকতার ব্যবস্থা কর।

১। সৌরজগতে —টি গ্রহ, ৩২টি —, প্রায় ৪৫,০০০ গ্রহাণু, ছায়াপথ প্রভৃতি আছে।
২। পৃথিবীর মেরুদেশীয় ব্যাসের দৈর্ঘ্য প্রায় — কিঃ মিঃ ও নিরক্ষীয় ব্যাসের দৈর্ঘ্য প্রায় — কিঃ মিঃ।
৩। পৃথিবী আপন — চারিদিকে আবর্তন করে এবং — চারিদিকে পরিক্রমণ করে।
৪। সৌররশ্মি ২১শে — ও ২৩শে — মধ্যাহ্নে নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পতিত হয়।
৫। মে-জুন মাস — গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও — গোলার্ধে শীতকাল।
৬। — দ্রাঘিমারেখা গ্রীনিচ মানমন্দিরের মধ্যভাগ দিয়া বিস্তৃত এবং —র উপর লম্বভাবে অবস্থিত।
৭। কর্কটক্রান্তির অক্ষাংশ —° এবং মকরক্রান্তির অক্ষাংশ —°।
৮। কলিকাতার অক্ষাংশ —° এবং দেশান্তর —°।
৯। উত্তপ্ত ম্যাগমা — রূপে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং পরিণামে — শিলাতে পরিণত হয়।
১০। চুনাপাথর —শিলাতে রূপান্তরিত হয় এবং বেলেপাথর —শিলাতে পরিবর্তিত হয়।
১১। আল্পস-হিমালয় পর্বতশ্রেণী ও — বেষ্টনকারী পর্বতশ্রেণী ভঙ্গিল পর্বতের বিখ্যাত উদাহরণ।
১২। — পর্বতের কতক অংশে শিলার কাৎ বা হেলানভাবে অবস্থিতি, স্বাভাবিক বা বিপরীত — প্রভৃতির চিহ্ন দেখা সম্ভবপর।
১৩। মধ্যএশিয়ার —পৃথিবীর — মালভূমি এবং 'পৃথিবীর ছাদ' নামে পরিচিত।
১৪। উপত্যকার লোয়েস সমভূমি প্রধানতঃ —র কার্যদ্বারা গঠিত হইয়াছে।
১৫। পৃথিবীর অভ্যন্তরে — রেখা অনুসারে শিলা — হওয়ার ফলে সাধারণতঃ ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।
১৬। পৃথিবীর গভীরতম — — নদীর উপত্যকা অঞ্চলে এবং তাহা — — নামে পরিচিত।
১৭। সরাবতী নদীর — প্রপাত ভারতের সর্বোচ্চ জলপ্রপাত।
১৮। জলের রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে শিলার — — এবং — হয়।
১৯। নদীর উচ্চগতিতে প্রধান কাজ — ও —। তথায় সঞ্চয় প্রায় হয় না।
২০। সমভূমি অঞ্চলে নদীর উপত্যকা ক্রমশঃ অধিক — ও কম —।
২১। নদীর বদ্বীপ গঠিত হয় — যেখানে নদীর প্রবাহের — হারাইয়া যায়।
২২। বিরাট তুষাররাশি কখন কখন অতি — প্রবাহিত হয় এবং তাহা — নামে পরিচিত
২৩। হিমবাহ যেখানে সম্পূর্ণ গলিয়া যায় তথায় যে গ্রাবরেখা সঞ্চিত হয় তাহাকে — গ্রাবরেখা বলে।
২৪। ভারতের সর্বদক্ষিণ সীমা প্রায় — অঃ এবং সকলের উত্তর সীমা প্রায় — অঃ।
২৫। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমার রাজ্যটির নাম — —।
২৬। ভারতের গভর্ণর-শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে — ক্ষুদ্রতম এবং কেন্দ্র-শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে — ক্ষুদ্রতম।
২৭। চীন ভিন্ন — ও — দেশ ভারতের উত্তরদিকে অবস্থিত।
২৮। ভারত ও নেপালের সীমান্তে — নদীর উপর হনুমাননগরে ও — নদীর উপর বাল্মীকিনগরে বাঁধ তৈরী হইয়াছে।
২৯। বাংলাদেশের তিনটি প্রধান নদী পদ্মা, — ও —।
৩০। — নদীর তীরে অবস্থিত ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী ও — নদীর তীরে অবস্থিত চট্টগ্রাম সেদেশের সর্বপ্রধান বন্দর।

৩১। ব্রহ্মদেশের উত্তর অংশে কাচিন মালভূমি, মধ্য অংশে —— মালভূমি ও দক্ষিণ অংশে —— মালভূমি।
৩২। ভারতের করমণ্ডল উপকূলের মত শ্রীলংকাতেও দুই ঋতুতে —— —— হয়।
৩৩। পাকিস্তানের উত্তর অংশে —— পর্বত এবং পূর্ব অংশে —— ও খিরথর পর্বত।
৩৪। পাকিস্তানের —— ব্যারেজ, মঙ্গলা বাঁধ ও —— বাঁধ সেচের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
৩৫। —— আফগানিস্থানের বর্তমান রাজধানী ও —— প্রাচীন রাজধানী।
৩৬। জম্মু ও কাশ্মীরের —— পর্বত প্রধান হিমালয়ের অন্তর্গত এবং —— পর্বত তাহার উত্তরে অবস্থিত।
৩৭। রাজস্থানের —— পৃথিবীর প্রাচীনতম পর্বতগুলির অন্যতম। তাহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ——।
৩৮। ভারতের পশ্চিম উপকূলের উত্তর অংশের নাম —— এবং দক্ষিণ অংশের নাম ——।
৩৯। গঙ্গার উৎস —— হিমবাহের পশ্চিমে এবং সেখান হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত নদীর ——।
৪০। ——, বিপাসা, ইরাবতী, —— ও বিতস্তা সিন্ধুর বামতটের উপনদী।
৪১। —— ও —— ভারতের দুইটি পশ্চিমবাহিনী নদী ; এগুলি খাম্বাট উপসাগরে পতিত হইতেছে।
৪২। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর —— শাখা ভারতের —— অংশের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়।
৪৩। ভারতের —— উপকূলে বৎসরে —— বার অধিক বৃষ্টি হয়।
৪৪। গর্জন, শিশু, চাপলাস —— (জাতীয়) গাছ এবং পাইন, ফার প্রভৃতি —— (জাতীয়) গাছ।
৪৫। ——র ভাট মৃত্তিকা —— চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।
৪৬। নলকূপের সাহায্যে সেচব্যবস্থা —— (রাজ্যে) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপাসা (পঙ্গ) প্রকল্পের সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে সেচব্যবস্থা —— (রাজ্যে) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
৪৭। বোরো ধান —— জমিতে জন্মে, যেখানে বীজগুলি বপন করা হয় —— কালের প্রথম অংশে।
৪৮। পাট চাষ সম্পর্কে ভারতের স্থান পৃথিবীতে সাধারণতঃ —— এবং ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ——।
৪৯। খনিজ তৈলের প্রধান উপজাত দ্রব্য পেট্রল, —— তৈল, ——, ন্যাপথলিন, য়্যাসফেল্ট প্রভৃতি।
৫০। —— ও —— ভারতের দুইটি প্রধান জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র।
৫১। ভারতের দক্ষিণ সীমার সামান্য উত্তরে দাক্ষিণাত্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ——। তাহার উত্তরে বিখ্যাত —— ফাঁক (Gap)।
৫২। ভারতের খারিফ ফসলের জন্য সেচের প্রয়োজনীয়তা —— এবং রবি শস্যের জন্য ——।
৫৩। ভারতে কয়লা উৎপাদনের সর্বপ্রধান কেন্দ্র ——। তাহা —— রাজ্যে অবস্থিত।
৫৪। পশ্চিম ভারতে খনিজ তৈল উৎপাদনের সর্বপ্রধান কেন্দ্র ——। তাহা —— বন্দরের নিকট অবস্থিত।
৫৫। —— অঞ্চলে ভারতে সবচেয়ে বেশী কার্পাস বস্ত্র তৈরী হয়। তথাকার সর্বপ্রধান কেন্দ্র ——।

(ঙ) পর পৃষ্ঠায় কতকগুলি এক জাতীয় জিনিসের নাম দেওয়া গেল। তম্মধ্যে যাহা কোন একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহা × চিহ্নদ্বারা কাটিয়া দাও। ভারত সহ কয়েকটি দেশের নামের পাশে পাশে কতক পাহাড়, পর্বত, নদ, নদী, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, কৃষিজ সম্পদ, প্রভৃতির নাম লেখা হইল। তাহাদের মধ্যে যেটি ভিন্ন জাতীয় তাহার নাম × চিহ্নদ্বারা কাটিয়া দাও।

১। বুধ, শুক্র, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি।
২। উষ্ণ মণ্ডল, উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল, দক্ষিণ হিমমণ্ডল, অরোরা অস্ট্রেলিস।
৩। সুমেরুবৃত্ত, কুমেরুবৃত্ত, প্রধান দ্রাঘিমারেখা, নিরক্ষরেখা।
৪। আল্পস, আণ্ডিজ, আরাবল্লী, গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ।
৫। গিরিখাত, ঝুলান উপত্যকা, প্রান্ত গ্রাবরেখা, বদ্বীপ, অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ।
৬। মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান, অরুণাচল, সিকিম, ত্রিপুরা।
৭। তোর্সা, জলঢাকা, সঙ্কোস, মানস, কৃষ্ণা।
৮। ঢাকা, চট্টগ্রাম, পদ্মা, শ্রীহট্ট।
৯। ইরাবতী, পেগুয়েমা, সালুয়েন, চিন্দুইন।
১০। ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিণ্ডি, সিন্ধু, লাহোর, করাচি।
১১। পঞ্জাব হিমালয়, কুমায়ুন হিমালয়, শিবালিক, নেপাল হিমালয়।
১২। পাটকইবুম, গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া পাহাড়, আরাবল্লী।
১৩। পশ্চিমঘাট, পূর্বঘাট, হিমগিরি, নীলগিরি।
১৪। গোমতী, কোশী, সাঁপো, যমুনা, শোণ।
১৫। পঞ্জাব, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাসা, শতদ্রু।
১৬। গর্জন, শিশু, ফার, চাপলাস, বিশপ উড।
১৭। রেগার, চুনাপাথর, কর্দম, ল্যাটারাইট, পডসল।
১৮। তিলাইয়া বাঁধ, ভাকরা বাঁধ, মাইথন বাঁধ, কোনার বাঁধ, পাঞ্চেত বাঁধ।
১৯। নাগাজুর্ন সাগর প্রকল্প, তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প, মহানদী প্রকল্প, ঘাটপ্রভা প্রকল্প।
২০। চা, ধান, গম, রাগি, বাজরা, জোয়ার।
২১। কার্পাস, পাট, গম, আখ, কফি।
২২। লৌহ, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ, ইস্পাত।
২৩। ভদ্রাবতী, বোম্বাই, দুর্গাপুর, জামসেদপুর।
২৪। আহমদাবাদ, গৌহাটি, বোম্বাই, কইম্বেটোর, দিল্লী।
২৫। দার্জিলিং, ভাটপাড়া, বরাহনগর, রিষড়া।

(চ) নীচে প্রত্যেক প্যারাগ্রাফে একজাতীয় কতক জিনিস, জায়গা প্রভৃতির নাম দেওয়া গেল। তাহাদিগকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে নির্দেশ অনুসারে সাজাও অথবা নির্দেশ অনুসারে চিহ্ন দাও।

১। সৌরজগতের গ্রহগণের নাম নীচে লেখা হইল। তাহাদের প্রত্যেকের ডানদিকে ( ) আছে। গ্রহগণের আয়তন স্থির কর। তম্মধ্যে বৃহত্তম গ্রহের নামের ডানদিকে ১, পঞ্চম গ্রহের ডানদিকে ৫ এবং নবম গ্রহের ডানদিকে ৯ লিখ।

বুধ ( ), শুক্র ( ), পৃথিবী ( ), মঙ্গল ( ), বৃহস্পতি ( ), শনি ( ), ইউরেনাস ( ), নেপচুন ( ), প্লুটো ( )।

২। কয়েকটি শিলার নাম নীচে লেখা হইল। তাহাদের প্রত্যেকের ডানদিকে ( ) আছে। কোন্‌টি কোন্ জাতীয় শিলা তাহা স্থির কর। তারপর ঐ শব্দের প্রথম অক্ষর ( )-এর মধ্যে লিখ। যেমন, আগ্নেয় শিলার ক্ষেত্রে আ, পাললিক শিলার ক্ষেত্রে পা এবং রূপান্তরিত শিলার ক্ষেত্রে রূ লিখ।

গ্র্যানাইট ( ), মার্বেল ( ), চুনাপাথর ( ), ব্যাসল্ট ( ), শ্লেট ( )।

৩। কয়েকটি পর্বতের নাম নিম্নে লেখা হইল। তাহাদের প্রত্যেকের ডানদিকে ( ) আছে। কোন্‌টি কোন্ জাতীয় পর্বত তাহা স্থির কর। তারপর ঐ শব্দের প্রথম অক্ষর ( )-এর মধ্যে লিখ। যেমন, ভঙ্গিল পর্বতের ক্ষেত্রে ভ, স্তূপ পর্বতের ক্ষেত্রে স্তূ, ক্ষয়জাত পর্বতের ক্ষেত্রে ক্ষ এবং সঞ্চয়জাত পর্বতের ক্ষেত্রে স লিখ।

বিন্ধ্য ( ), আল্পস ( ), আরাবল্লী ( ), লবণ পর্বত ( )।

৪। নিম্নলিখিত দেশগুলির মধ্যে যেগুলি ভারতের পার্শ্ববর্তী তাহাদের নামের ডানদিকের ( )-এর মধ্যে √ চিহ্ন দাও।

পাকিস্তান ( ), আফগানিস্থান ( ), ইরান ( ), নেপাল ( ), ব্রহ্মদেশ ( ), থাইল্যাণ্ড ( )।

৫। ভারতের কয়েকটি রাজ্যের নাম নীচে লেখা হইল। নির্দেশ অনুসারে তাহাদের নাম সাজাও।

(i) আয়তন (বড় হইতে ছোট) অনুসারে নাম সাজাওঃ
রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, গুজরাট, কেরালা।

(ii) লোকসংখ্যা (বেশী হইতে কম) অনুসারে নাম সাজাওঃ
উত্তর প্রদেশ, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, পঞ্জাব।

৬। হিমালয়ের কয়েকটি উচ্চ শৃঙ্গের নাম নীচে লেখা হইল। প্রত্যেকের ডানদিকে ( ) আছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নামের পাশে ১, দ্বিতীয়টির নামের পাশে ২ এবং তৃতীয়টির নামের পাশে ৩ লিখ।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ( ), মাউন্ট এভারেস্ট ( ), গডউইন অস্টিন ( )।

৭। ভারতের কয়েকটি নদীর নাম নীচে লেখা হইল। প্রত্যেকের ডানদিকে ( ) আছে। তন্মধ্যে বৃহত্তম নদীর নামের পাশে ১, দ্বিতীয়টির পাশে ২ এবং তৃতীয়টির পাশে ৩ লিখ।

মহানদী ( ), নর্মদা ( ), তাপী ( ), গোদাবরী ( ), কৃষ্ণা ( )।

(ছ) ভারতের বিভিন্ন জাতীয় উৎপন্ন দ্রব্যের নাম নীচে লেখা হইল। তাহাদের প্রত্যেকের ডানদিকে ( ) আছে। কোন্‌টি কোন্ জাতীয় জিনিস তাহা স্থির কর। তারপর প্রত্যেকের নামের আদ্যক্ষর ঐ ( )-এর মধ্যে লিখ। যেমন, স্বাভাবিক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে স্বা, কৃষিজ সম্পদের ক্ষেত্রে কৃ, খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে খ এবং শিল্প দ্রব্যের ক্ষেত্রে শি লিখ।

পাট ( ), সেগুন ( ), কয়লা ( ), শাল ( ), লৌহ ( ), কার্পাস বস্ত্র ( ), চট ( ), আখ ( ), ম্যাঙ্গানিজ ( )।

(জ) নীচে প্রত্যেক সারিতে তিনটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ আছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সহিত দ্বিতীয় শব্দ বা শব্দ গুচ্ছের সম্পর্ক স্থির কর। তারপর তৃতীয় শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সহিত যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ঠিক ঐরূপ সম্পর্ক তাহা স্থির কর এবং তৃতীয় শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ডানদিকে তাহা লিখ।

১। মকরক্রান্তি ঃ ২২শে ডিসেম্বর ঃ ঃ কর্কটক্রান্তি ঃ
২। পৃথিবীর মেরুদেশীয় ব্যাস ঃ ১২৭১৪ কিঃ মিঃ ঃ ঃ নিরক্ষীয় ব্যাস ঃ
৩। পৃথিবী ঃ ১ ঃ ঃ বৃহস্পতি ঃ
৪। দ্রাঘিমারেখা ঃ উত্তর-দক্ষিণে ঃ ঃ অক্ষরেখা ঃ
৫। ২৪ ঘণ্টা ঃ পৃথিবীর আবর্তন ঃ ঃ ৩৬৫ দিন ঃ
৬। মার্বেল ঃ চুনাপাথর ঃ ঃ নীস ঃ
৭। আল্পস ঃ ভঙ্গিল পর্বত ঃ ঃ লবণ পর্বত ঃ
৮। গ্রাবরেখা ঃ হিমবাহ ঃ ঃ বালিয়াড়ি ঃ
৯। অধিক বৃষ্টি ঃ প্রতিবাতপার্শ্ব ঃ ঃ সামান্য বৃষ্টি ঃ
১০। মাউন্ট এভারেস্ট ঃ প্রধান হিমালয় ঃ ঃ গড্‌উইন অস্টিন ঃ
১১। পূর্বঘাট ঃ মলয়াদ্রি ঃ ঃ পশ্চিমঘাট ঃ
১২। গঙ্গা ঃ গোমুখ ঃ ঃ ব্রহ্মপুত্র ঃ
১৩। ধুয়ানধারা ঃ নর্মদা ঃ ঃ শিবসমুদ্রম্ ঃ
১৪। উত্তরপ্রদেশ ঃ আখ ঃ ঃ পঞ্জাব ঃ
১৫। আসাম ঃ চা ঃ ঃ পশ্চিমবঙ্গ ঃ
১৬। বিহার ঃ ঝরিয়া ঃ ঃ পশ্চিমবঙ্গ ঃ
১৭। বম্বে হাই ঃ খনিজ তৈল ঃ ঃ গোয়া ঃ
১৮। আহ্মদাবাদ ঃ কার্পাস বস্ত্র ঃ ঃ জামসেদপুর ঃ

(ঝ) নীচে বাম দিকের প্রত্যেক সারিতে একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ আছে এবং তাহার ডানদিকে একটি শূন্য বন্ধনী ( ) আছে। ডানদিকের সারির যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সহিত তাহার ভৌগোলিক সম্পর্ক আছে তাহা স্থির কর এবং তাহার ডানদিকের বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাটি বামদিকের সারির ঐ শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ডানদিকের শূন্য বন্ধনীর মধ্যে লিখ।

(১) সূর্য ( )
চন্দ্র ( )
শনি ( )
বৃহস্পতি ( )
বুধ ( )

সূর্যের নিকটতম গ্রহ (১)
বৃহত্তম গ্রহ (২)
দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ (৩)
পৃথিবীর উপগ্রহ (৪)
সৌর জগতের কেন্দ্র (৫)

(২) আবর্তন ( )
অরোরা বরিয়েলিস ( )
উত্তর অয়নান্ত দিবস ( )
দক্ষিণ অয়নান্ত দিবস ( )
পরিক্রমণ ( )
বিষুব ( )

২২শে ডিসেম্বর (১)
বার্ষিক গতি (২)
দিন-রাত্রি সমান (৩)
২১শে জুন (৪)
সুমেরুর অস্পষ্ট আলো (৫)
আহ্নিক গতি (৬)

(৩) নিরক্ষরেখা ( )
কর্কটক্রান্তি ( )
মূল মধ্যরেখা ( )
সুমেরুবৃত্ত ( )
কুমেরুবৃত্ত ( )
মকরক্রান্তি ( )
অক্ষরেখা ( )
মধ্যরেখা ( )

0° দ্রাঘিমারেখা (১)
২৩½° দঃ অঃ (২)
৬৬½° দঃ অঃ (৩)
৬৬½° উঃ অঃ (৪)
পূর্ব-পশ্চিমে সমান্তরাল রেখা (৫)
২৩½° উঃ অঃ (৬)
0° অক্ষাংশ (৭)
উত্তর-দক্ষিণে অর্ধবৃত্ত রেখা (৮)

(৪) ব্যাসল্ট ( )
কয়লা ( )
মার্বেল ( )
শ্লেট ( )
নীস ( )
গ্র্যানাইট ( )

জৈব শিলা (১)
উদ্বেধী শিলা (২)
রূপান্তরিত কাদাপাথর (৩)
রূপান্তরিত গ্র্যানাইট (৪)
রূপান্তরিত চুনাপাথর (৫)
নিঃসারী শিলা (৬)

(৫) রকি ( )
ফুজিয়ামা ( )
সেন্ট্রাল মাসিফ ( )
আরাবল্লী ( )
গঙ্গা সমভূমি ( )
নীলগিরি ( )
আরব ( )

ক্ষয়জাত পর্বত (১)
স্তূপ পর্বত (২)
মহাদেশীয় মালভূমি (৩)
পাললিক সমভূমি (৪)
আগ্নেয় পর্বত (৫)
ভঙ্গিল পর্বত (৬)
পর্বতবেষ্টিত মালভূমি (৭)

(৬) গিরিখাত ( )
লোহাতে মরিচা ( )
ট্যালাস ( )
শিবসমুদ্রম ( )

রাসায়নিক আবহবিকার (১)
সঞ্চিত শিলাচূর্ণ (২)
কাবেরীর জলপ্রপাত (৩)
I-আকৃতির উপত্যকা (৪)

(৭) গঙ্গা-সমভূমি ( )
হিমবাহ ( )
সাইমুম ( )
বারখান ( )

বায়ুদ্বারা সঞ্চিত (১)
নদীর পরিত্যক্ত অংশের হ্রদ (২)
হিমবাহদ্বারা সঞ্চিত (৩)
বালুকা ঝড় (৪)

গ্রাবরেখা ( )	বরফস্তূপের প্রবাহ (৫)
অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ ( )	প্লাবন ভূমি (৬)
(৮) মধ্য প্রদেশ ( )	ত্রিবান্দ্রম (১)
গুজরাট ( )	ইম্ফল (২)
আসাম ( )	ইটানগর (৩)
নাগাল্যান্ড ( )	কাভারত্তি (৪)
অরুণাচল প্রদেশ ( )	দিসপুর (৫)
লক্ষদ্বীপ ( )	কোহিমা (৬)
মণিপুর ( )	গান্ধীনগর (৭)
কেরালা ( )	ভূপাল (৮)
মিজোরাম ( )	আইজল (৯)
(৯) নেপাল ( )	তোর্সা (১)
বাংলাদেশ ( )	ইরাবতী (২)
শ্রীলঙ্কা ( )	বিতস্তা (৩)
আফগানিস্থান ( )	হেলমন্দ (৪)
ব্রহ্মদেশ ( )	মহাবেলী (৫)
ভুটান ( )	যমুনা (৬)
পাকিস্তান ( )	কালীগণ্ডক (৭)
(১০) কপিলাবস্তু ( )	আফগানিস্থান (১)
শ্রীহট্ট ( )	ভুটান (২)
কান্দি ( )	ব্রহ্মদেশ (৩)
করাচি ( )	শ্রীলঙ্কা (৪)
মান্দালয় ( )	বাংলাদেশ (৫)
থিম্পু ( )	নেপাল (৬)
গজনী ( )	পাকিস্তান (৭)
(১১) হিমগিরি ( )	সর্বনিম্ন হিমালয় (১)
নন্দাদেবী ( )	মধ্য হিমালয় (২)
খাসিয়া ( )	মেঘালয়ের পাহাড় (৩)
গডউইন অস্টিন ( )	উত্তর প্রদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (৪)
শিবালিক ( )	ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (৫)
হিমাচল ( )	হিমালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী (৬)
(১২) বুন্দেলখণ্ড ( )	বিখ্যাত গিরিপথ (১)
কলসুবাই ( )	দাক্ষিণাত্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (২)
পালঘাট ( )	নীলগিরির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (৩)
আনাইমুদি ( )	পশ্চিমঘাটের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (৪)
দোদাবেতা ( )	ছোটনাগপুরের পাহাড় (৫)
রাজমহল ( )	মধ্যভারত মালভূমির অংশ (৬)
(১৩) গোমুখ ( )	সিন্ধুর উপনদী (১)
গোমতী ( )	গঙ্গার শাখানদী (২)
বিতস্তা ( )	ব্রহ্মপুত্রের উপনদী (৩)
তুঙ্গভদ্রা ( )	কৃষ্ণার উপনদী (৪)
প্রাণহিতা ( )	তাপীর উপনদী (৫)

কার্পীল ( )	গঙ্গার উপনদী (৬)
জলঙ্গী ( )	গোদাবরীর উপনদী (৭)
পূর্ণা ( )	গঙ্গার উৎস (৮)
(১৪) গর্জন ( )	পর্ণমোচী গাছ (১)
পাইন ( )	সোঁদরীজাতীয় গাছ (২)
শাল ( )	কাঁটাযুক্ত গাছ (৩)
বাবলা ( )	সরলবর্গীয় গাছ (৪)
হেতাল ( )	চিরহরিৎ গাছ (৫)
(১৫) দুর্গাপুর ব্যারেজ ( )	শতদ্রু (১)
তিলপাড়া ব্যারেজ ( )	গণ্ডক (২)
গান্ধী সাগর বাঁধ ( )	মহানদী (৩)
ভাখরা বাঁধ ( )	তাপী (৪)
বাল্মীকিনগর ব্যারেজ ( )	গঙ্গা (৫)
ফরাক্কা ব্যারেজ ( )	ময়ূরাক্ষী (৬)
হীরাকুঁদ বাঁধ ( )	দামোদর (৭)
কাক্রাপাড়া বাঁধ ( )	চম্বল (৮)
(১৬) ধান ( )	দীর্ঘ ও মধ্যম আঁশযুক্ত (১)
গম ( )	ভাট মৃত্তিকা (২)
কার্পাস ( )	চীনাবাদাম (৩)
আখ ( )	শীতকালীন খাদ্যশস্য (৪)
চা ( )	আমন, আশু, বোরো (৫)
তৈলবীজ ( )	পর্বতের ঢাল (৬)
(১৭) আণবিক শক্তি	লোহারডাগা (১)
খনিজ তৈল ( )	ঝরিয়া (২)
লৌহ ( )	গিরিডি (৩)
অভ্র ( )	বম্বে হাই (৪)
কয়লা ( )	কোটা (৫)
বক্সাইট ( )	গোয়া (৬)
(১৮) ইস্পাত শিল্প ( )	ব্যাঙ্গালোর (১)
জাহাজ নির্মাণ ( )	আহ্মদাবাদ (২)
বিমানপোত নির্মাণ ( )	কাটিহার (৩)
কার্পাস বস্ত্র ( )	বিশাখাপটনম্ (৪)
চট, থলে ( )	হিন্দমোটর (৫)
মোটরগাড়ি নির্মাণ ( )	জামসেদপুর (৬)

III মানচিত্র, নক্সা প্রভৃতি পাঠ

এই পুস্তকে প্রায় ১০০ খানা মানচিত্র, নক্সা প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটি বিভিন্ন বিষয়বস্তু ভালভাবে বুঝিবার পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া গেল।

প্রথম অধ্যায়—সৌরজগতে পৃথিবীগ্রহের অবস্থিতি, আকৃতি, আয়তন প্রভৃতি ভালভাবে বুঝিবার জন্য ১, ২, ৪ ও ৫নং চিত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়। ৩নং চিত্রে পৃথিবীর ও চন্দ্রের অবস্থান দেখান হইয়াছে। তারপর পৃথিবীর মেরুদেশীয় ও নিরক্ষীয় ব্যাসের মাপ লক্ষ্য করার জন্য ভূগোলকের সাহায্য অত্যাবশ্যক। তাহার চিত্রও দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—পৃথিবীর আবর্তন বা আহ্নিক গতি এবং পরিক্রমণ বা বার্ষিক গতি ঠিকভাবে লক্ষ্য করার এবং তাহাদের প্রভাব বুঝিবার জন্য কিভাবে পৃথিবীর আবর্তন গতির সহিত দিবারাত্রির পরিবর্তন হয়, তারপর প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্তন হয় তাহা লক্ষ্য করা অবশ্যক। এই প্রসঙ্গে সূর্যের আপাত গতির (প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর আবর্তন গতি) প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা দরকার। একটি আলো ও ভূগোলকের সাহায্যে বিষয়টি সহজে পরীক্ষা করা যায়।

তারপর বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কিভাবে দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে পরিবর্তন হয় তাহা ভালভাবে বুঝিবার জন্য পৃথিবীর মেরুরেখার কৌণিকভাবে অবস্থান বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। এসকল বিষয় ভালভাবে বুঝিলে ঋতু পরিবর্তন বুঝিবার জন্য অসুবিধা হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়—ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানে অবস্থিতি কেবলমাত্র দুইটি নির্দিষ্ট রেখা ও তাহাদের অনুরূপ রেখার সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব। এজন্য ভূগোলকের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। ছাত্র-ছাত্রীগণ ভূগোলকে নিরক্ষরেখা ও প্রধান দ্রাঘিমারেখার অবস্থান খুব মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিবে। তারপর পৃথিবীর কেন্দ্রে কিভাবে অক্ষাংশ ও দেশান্তর (কোণ) আঁকা হয় তাহা লক্ষ্য করিবে এবং এসকল কোণের সাহায্যে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা কিভাবে আঁকা হয় তাহাও ভালভাবে দেখিবে।

স্থানীয় সময়ের (প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা প্রভৃতি) পরিবর্তন বুঝিবার জন্য দিনের বিভিন্ন সময়ে আকাশে সূর্যের আপাতগতি (প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর আবর্তনের ফল) মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করা আবশ্যক। তারপর বিভিন্ন স্থানের মধ্যে স্থানীয় সময়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রত্যেক স্থানের দেশান্তর লক্ষ্য করিবে এবং কি হারে স্থানীয় সময়ের পরিবর্তন হয় ও কোন্ দিকে তাহা বাড়ে বা কমে তাহাও লক্ষ্য করিবে। সঙ্গীয় মানচিত্রে আন্তর্জাতিক তারিখরেখা স্পষ্ট লক্ষ্য করিবে। আর ভূগোলকের সাহায্যে প্রতিপাদস্থান লক্ষ্য করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়—শিলার গঠন, শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি জানিবার উদ্দেশ্যে প্রথমেই পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন মণ্ডলের অবস্থা, তথা হইতে উত্তপ্ত পদার্থ কিভাবে বাহিরে আসে ও আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হয় তাহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। বিভিন্ন চিত্র এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিবে। তারপর ছাত্র-ছাত্রীগণ পাললিক শিলার গঠন, তাহাদের বৈশিষ্ট্য এবং রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি প্রদত্ত চিত্রের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়—ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রকার ভূপ্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে প্রদত্ত চিত্রগুলি বিশেষ সহায়ক। মানচিত্রে প্রধান ভঙ্গিল পর্বতসমূহের বিস্তৃতি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তারপর ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানসমূহ কিভাবে সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হয় তাহাও প্রদত্ত চিত্রের সাহায্যে সহজে লক্ষ্য করা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়—প্রদত্ত মানচিত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আগ্নেয়গিরির অবস্থান ও ভূমিকম্পের অঞ্চলের বিষয় সহজে লক্ষ্য করা যায়। তারপর ভূকম্পলেখ যন্ত্রের ছবি এবং ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার ছবিও এই বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

সপ্তম অধ্যায়—ক্ষয়ীভবন সম্পর্কে বিভিন্ন অবস্থা এই অধ্যায়ের চিত্রসমূহে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

অষ্টম অধ্যায়—নদী, হিমবাহ ও বায়ুর পরিবহন ও সঞ্চয়কার্য সম্পর্কিত বিভিন্ন চিত্র এখানে দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি লক্ষ্য করিলে বিষয়বস্তু বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইবে। যেমন, অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থা, নানাপ্রকার গ্রাবরেখা, বায়ুদ্বারা ক্ষয়কার্য ও বালুকারাশির সঞ্চয়, বালিয়াড়ি সৃষ্টি প্রভৃতি বুঝিবার পক্ষে চিত্রগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্।

নবম অধ্যায়—ভারতের রঙগীন মানচিত্রে দেশের পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যগুলি তাহাদের রাজধানী ও কিছু কিছু প্রাকৃতিক বিষয় দেখান হইয়াছে।

দশম অধ্যায়—ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশগুলির মানচিত্রে তাহাদের কেবলমাত্র অবস্থান দেখান হইয়াছে। আর প্রত্যেক দেশের পৃথক্ মানচিত্রে তথাকার প্রাকৃতিক অবস্থা (প্রধান পর্বত, নদী প্রভৃতি) এবং রাজধানী ও অন্যান্য প্রধান নগর দেখান হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়—এই অধ্যায়ে প্রায় ৩০ খানা মানচিত্র ও চিত্রে ভারতের বিভিন্ন বিষয় স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে. যেমন, ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী, জলবায়ু (বিভিন্ন ঋতুর অবস্থা), মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ্, সেচব্যবস্থা, কৃষিজ সম্পদ্, খনিজ সম্পদ্, প্রধান শিল্প প্রভৃতি। এসকল মানচিত্র ও চিত্র ভালভাবে লক্ষ্য করিলে ছাত্র-ছাত্রীগণ বিশেষ উপকৃত হইবে।

এসম্পর্কে ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে প্রত্যেক বিষয় বুঝিবার পক্ষে পূর্ব জ্ঞানের সহায়তা প্রয়োজন। সেরূপ পূর্বের মানচিত্র, চিত্র প্রভৃতিও অনেক ক্ষেত্রে পরের বিষয়-বস্তু বুঝিবার পক্ষে প্রয়োজন। যেমন, কোন দেশের (এক্ষেত্রে ভারতের) ভূপ্রকৃতির মানচিত্র ভালভাবে লক্ষ্য করিলে নদ-নদীর অবস্থা বুঝিবার পক্ষে অনেক উপকার হয়।

IV মানচিত্র, চিত্র প্রভৃতি অংকন

যখনই প্রয়োজন ছাত্র-ছাত্রীগণ মানচিত্র ও চিত্র অংকন করিবে। কেবলমাত্র শিক্ষক, শিক্ষিকাগণ যখন নির্দেশ দিবেন তখনই একাজ করিবে, অন্য সময় নয়—এরূপ মনোভাব ঠিক নয়। তাহারা নিজেরা অনেক বেশী আঁকার কাজ করিলে তাহাদের শিক্ষা অধিক দৃঢ় হইবে।

আঁকার পূর্বে তাহাদিগকে মনোযোগের সহিত মানচিত্র ও চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে হইবে, অর্থাৎ ভালভাবে শিখিতে হইবে। যেমন, দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতি বুঝাইবার সময় পৃথিবীর মেরুরেখা কোন্ দিকে হেলান তাহা খুব ভালভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহা সঠিকভাবে আঁকিতে পারিবে।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীগণ রেখামানচিত্র আঁকিতে শিখিয়াছে। এখন তাহারা ভারতের রেখামানচিত্র আঁকিবে ও তাহাতে বিভিন্ন বিষয় দেখাইবে।

১। ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের মানচিত্র আঁক ও দেশগুলির সীমা দেখাও। তারপর নির্দিষ্ট স্থানে দেশের নাম লিখ ও বিন্দুদ্বারা রাজধানীর স্থান নির্দেশ কর।

২। নেপালের মানচিত্র আঁক এবং প্রধান হিমালয় ও শিবালিক পাহাড় দেখাও। তারপর কাঠমণ্ডু, মাউন্ট এভারেস্ট ও কপিলাবস্তুর অবস্থান নির্দেশ কর ও নাম লিখ।

৩। ভুটানের মানচিত্র আঁক এবং থিম্পু ও পুনাখের অবস্থান দেখাও ও নাম লিখ।

৪। বাংলাদেশের মানচিত্র আঁক এবং পদ্মা, যমুনা ও মেঘনার গতিপথ দেখাও। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও ময়মনসিংহের অবস্থান দেখাও ও নাম লিখ।

৫। ব্রহ্মদেশের মানচিত্র আঁক এবং ইরাবতী ও সালুয়েন নদীর গতিপথ দেখাও। আরাকান য়োমা, পেগু য়োমা, রেঙ্গুন ও মৌলমেনের অবস্থিতি দেখাও ও নাম লিখ।

৬। শ্রীলংকার মানচিত্র আঁক এবং কলম্বো ও জাফনার অবস্থিতি দেখাও ও নাম লিখ।

৭। পাকিস্তানের মানচিত্র আঁক এবং সিন্ধুনদ ও ইহার উপনদীগুলির গতিপথ দেখাও। তারপর সুলেমান ও খিরথর পর্বত এবং ইসলামাবাদ, করাচি ও কোয়েটার অবস্থিতি দেখাও ও নাম লিখ।

৮। আফগানিস্থানের মানচিত্র আঁক এবং হিন্দুকুশ, কাবুল ও কান্দাহারের অবস্থিতি দেখাও ও নাম লিখ।

৯। ভারতের অন্ততঃ ১০ খানা রেখামানচিত্র আঁক এবং তাহাতে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি নির্দেশ কর। পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ের জন্য পৃথক্ পৃথক্ মানচিত্র ব্যবহার কর। যে সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিবে তাহা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিও।

(i) হিমালয়, পশ্চিমঘাট, পূর্বঘাট ও বিন্ধ্য পর্বত এবং দাক্ষিণাত্য মালভূমি।
(ii) গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, মহানদী ও গোদাবরী নদীর গতিপথ।
(iii) জলবায়ু—মে হইতে অক্টোবর (উষ্ণতা, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত)।

(iv) ঐ—নবেম্বর হইতে এপ্রিল (ঐ)
(v) স্বাভাবিক উদ্ভিদ্।
(vi) মৃত্তিকা।
(vii) সেচব্যবস্থা—সেচের বিভিন্ন পদ্ধতি ও অঞ্চল।
(viii) প্রধান কৃষিজ সম্পদ্ ও উৎপাদনের অঞ্চল।
(ix) প্রধান খনিজ সম্পদ্ ও উৎপাদনের অঞ্চল।
(x) কার্পাস, পাট এবং ইস্পাত শিল্পের প্রধান কেন্দ্রসমূহ।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ১৯৮৬ খ্রীঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার ভূগোলের বিভিন্ন প্রশ্ন এবং এই বইতে তাহাদের উত্তর

'ক' বিভাগ (নূতন পাঠক্রম)

১। প্রশ্নপত্রের সহিত প্রদত্ত ভারতের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিতগুলি উপযুক্ত প্রতীক ও নামসহ চিহ্নিত কর:— ৪+৩+৩=১০

(ক) নর্মদা নদী ও আরাবল্লী পর্বত—প্রথম ভাগ, ৯৮ পৃঃ—ভারতের মানচিত্র
(খ) মালাবার উপকূল—প্রথম ভাগ, ৯২ পৃঃ—মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মানচিত্র
কর্কটক্রান্তি রেখা ও কুমারিকা অন্তরীপ—ঐ, ৬১ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ
(গ) ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল—ঐ, ১৩০ পৃঃ, ২য় প্যারাগ্রাফ
উত্তর ভারতের একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র—ঐ, ১৩৪ পৃঃ ৩য় প্যারাগ্রাফ
পূর্ব ভারতের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকেন্দ্র—ঐ, ১৪৩ পৃঃ ১-৩ প্যারাগ্রাফ

'খ' বিভাগ (নূতন পাঠক্রম)

২। সমাক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা বলিতে কি বোঝ? ৩
সমাক্ষরেখা—প্রথম ভাগ, ১৭ পৃঃ, ৩য় প্যারাগ্রাফ
দ্রাঘিমারেখা—ঐ, ১৮ পৃঃ, ২য় প্যারাগ্রাফ

১লা জানুয়ারী ১৯৮৬ কলিকাতায় (৮৮°৩০′ পূঃ) যখন সকল ৯টা, তখন নিউ ইয়র্কের (৭৪° পঃ) সময় ও তারিখ কি হইবে? ৬

প্রথম ভাগ, পরিশিষ্ট অংশ। যেহেতু কলিকাতার (৮৮½° পূঃ) স্থানীয় সময় ১৯৮৬ ইং ১লা জানুয়ারী সকাল ৯টা (9 a.m.), তখন নিউ ইয়র্কের (৭৪° পঃ) স্থানীয় সময় কলিকাতার স্থানীয় সময় হইতে ৬৫০ মিঃ বা ১০ ঘঃ ৫০ মিঃ পশ্চাৎগামী বা কম। কারণ, নিউ ইয়র্কের দ্রাঘিমা কলিকাতার দ্রাঘিমার তুলনায় ৮৮½°+৭৪°=১৬২½° পশ্চিমে। অতএব তখন নিউ ইয়র্কের স্থানীয় সময় পূর্বদিনের (অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫) রাত্রি ১০টা ১০ মিঃ (10.10 p.m.)।

কোন্ সমাক্ষরেখাকে 'মহাবৃত্ত' বলে?—প্রথম ভাগ, ২০ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ ১

৩। উৎপত্তি অনুসারে পর্বতের শ্রেণীবিভাগ কর। চিত্র ও উদাহরণ সহযোগে উহাদের যে কোন একটির সৃষ্টির কারণ বর্ণনা কর। 'টেথিস সাগরের' অবস্থান কোথায় ছিল? ৩+৬+১=১০
পর্বত—শ্রেণীবিভাগ, সৃষ্টির কারণ প্রভৃতি—প্রথম ভাগ, ৩৪—৩৬ পৃঃ
টেথিস সাগর—ঐ, ৩৫ পৃঃ, ১ম প্যারাগ্রাফ

৪। 'আবহবিকার' ও 'ক্ষয়ীভবনের' মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। হিমবাহের সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলির বর্ণনা দাও। 'হিমরেখা' কাহাকে বলে? ৩+৬+১=১০
আবহবিকার ও ক্ষয়ীভবন—প্রথম ভাগ, ৪৭ পৃঃ, ৩য় প্যারাগ্রাফ
হিমবাহের সঞ্চয় কার্যের ফল—ঐ, ৫৬—৫৮ পৃঃ

হিমরেখা—মেরু অঞ্চলে ও অত্যুচ্চ পর্বতে যে রেখার নীচে তুষার কখনও গলে না। তাহাকে হিমরেখা (Snowline) বলে। রেখাটি কাল্পনিক। প্রথম ভাগ, ৫৬ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ ও ফুটনোট।

৫। 'আবহাওয়া' ও 'জলবায়ু' বলিতে কি বোঝায়? বায়ুমণ্ডলে তাপের ও চাপের তারতম্যের কারণগুলি আলোচনা কর। বায়ুর চাপ কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয়? ৩+৬+১=১০

আবহাওয়া ও জলবায়ু—দ্বিতীয় ভাগ, ৩ পৃঃ
বায়ুমণ্ডলে তাপের তারতম্যের কারণ—ঐ, ১৫—১৭ পৃঃ
বায়ুমণ্ডলে চাপের তারতম্যের কারণ—ঐ, ২০—২১ পৃঃ
বায়ুর চাপ মাপিবার যন্ত্র—ঐ, ৫ পৃঃ, ২য় প্যারাগ্রাফ

৬। সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তির কারণগুলি কি কি? চিত্র সহযোগে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রধান স্রোতসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 'শৈবাল সাগর' বলিতে কি বোঝ? ৩+৬+১=১০

সমুদ্র স্রোতের উৎপত্তির কারণ—দ্বিতীয় ভাগ, ২৪ পৃঃ
প্রশান্ত মহাসাগরের প্রধান স্রোত—ঐ, ২৭—২৮ পৃঃ
শৈবাল সাগর—ঐ, ২৫ পৃঃ, ৩য় প্যারাগ্রাফ

৭। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (যে কোন **চারটি**):— ২½×৪=১০

(ক) ঋতু পরিবর্তনের কারণ কি?—প্রথম ভাগ, ১৪—১৬ পৃঃ
(খ) 'আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা' কাহাকে বলে?—ঐ, ২৬—২৮ পৃঃ
(গ) ভূমিকম্পের সম্ভাব্য কারণ কি কি?—ঐ, ৪৪—৪৫ পৃঃ
(ঘ) রূপান্তরিত শিলা কিরূপে সৃষ্ট হয়?—ঐ, ৩৩ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ
(ঙ) 'সমপ্রায় ভূমি' কাহাকে বলে?—ঐ, ৪৩ পৃঃ, ৩য় প্যারাগ্রাফ
(চ) বৃষ্টিপাত কিরূপে হয়?—দ্বিতীয় ভাগ, ১৪—১৫ পৃঃ
(ছ) জোয়ার-ভাঁটা কি?—ঐ, ২৮—৩০ পৃঃ

'গ' বিভাগ (নূতন পাঠক্রম)

৮। (ক) ভারতের বৃহত্তম রাজ্য ও ক্ষুদ্রতম কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলটির নাম লিখ। ভারতের নবীনতম রাজ্যটির নাম কি? ২+১+১=৪

ভারতের বৃহত্তম রাজ্য—প্রথম ভাগ, ৬৫ পৃঃ, তালিকার ১ম লাইন
ক্ষুদ্রতম কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল—ঐ, ৬৬ পৃঃ, তালিকার শেষ লাইন
ভারতের নবীনতম রাজ্য—ঐ, পরিশিষ্ট, ফুটনোট

(খ) বাংলাদেশ কবে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করে? এই দেশটির কৃষিজ সম্পদ্ এবং শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা কর। ৬

বাংলাদেশ—স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা—প্রথম ভাগ, ৭৯ পৃঃ, ৫ম প্যারাগ্রাফ
ঐ কৃষিজ সম্পদ্ ও শিল্পোন্নতি—ঐ, ৭৩ পৃঃ, ৩য় ও ৪র্থ প্যারাগ্রাফ

৯। ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জকে জলবায়ু কিভাবে প্রভাবিত করে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। ভারতে বনভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় কেন? ভারত সরকারের অরণ্য গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত? ৬+৩+১=১০

ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও জলবায়ু—প্রথম ভাগ, ১০৯—১১১ পৃঃ
বনভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজন—ঐ, ১০৯-১১১ পৃঃ
ভারত সরকারের অরণ্য গবেষণাগার ১০৯ পৃঃ, ১ম প্যারাগ্রাফ

১০। গম চাষের অনুকূল পরিবেশগুলি আলোচনা কর এবং ভারতের দুইটি প্রধান গম উৎপাদক রাজ্যের নাম লিখ। ভারত সরকারের গম গবেষণা কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত? ৬+৩+১=১০

গম চাষের অনুকূল পরিবেশ—প্রথম ভাগ, ১২৫—২৬ পৃঃ
ভারতের দুইটি প্রধান গম উৎপাদক রাজ্য—ঐ, ১২৬ পৃঃ ২য় প্যারাগ্রাফ
ভারত সরকারের গম গবেষণা কেন্দ্র—১২৬ পৃঃ, ১ম প্যারাগ্রাফ

১১। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য কি কি কাঁচা মালের প্রয়োজন হয়? পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্প গড়িয়া উঠার ভৌগোলিক কারণগুলি কি কি? ভারতের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানাটি কোথায় অবস্থিত? ৩+৬+১=১০
লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল—প্রথম ভাগ, ১৪১ পৃঃ, ৩য় প্যারাগ্রাফ
পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্প গড়িয়া উঠার কারণ—ঐ, ১৪২ পৃঃ, ২য় প্যারাগ্রাফ
ভারতের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা—ঐ, ১৪২ পৃঃ, ১ম প্যারাগ্রাফ

১২। (ক) ভারতে জনবসতির ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয় কেন? ১৯৮১-এর আদম সুমারী অনুসারে ভারতের জনবসতির ঘনত্ব কত? ৬+১=৭
ভারতে জনবসতির ঘনত্ব সম্বন্ধে পার্থক্য—দ্বিতীয় ভাগ, ৩২—৩৬ পৃঃ
১৯৮১ খ্রীঃ ভারতে জনবসতির ঘনত্ব—ঐ, ৩২ পৃঃ, ৪র্থ প্যারাগ্রাফ
(খ) কলিকাতা বন্দরের ক্রমাবনতির কারণ কি কি?—ঐ, ৪০ পৃঃ, ১ম প্যারাগ্রাফ ৩

১৩। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলায় হলদিয়া অবস্থিত? হলদিয়ায় শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠার কারণসমূহ বর্ণনা কর। হলদিয়ার বর্তমান ও প্রস্তাবিত প্রধান শিল্পগুলির নাম কর। ১+৬+৩=১০
হলদিয়ার অবস্থিতি—মেদিনীপুর জেলাতে—দ্বিতীয় ভাগ, ৫০ পৃঃ, ৩য় প্যারাগ্রাফ
হলদিয়ায় শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠার কারণ ও তথাকার প্রধান শিল্প—ঐ, ৫১ পৃঃ, ১ম প্যারাগ্রাফ

'ঘ' বিভাগ (নূতন পাঠক্রম)

১৪। এশিয়ার বিভিন্ন অংশে জলবায়ুর বৈচিত্র্যের কারণ কি কি? এশিয়ার মৌসুমী ও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। এশিয়ার শীতলতম স্থানটির নাম কি? ৩+৬+১=১০
এশিয়ার বিভিন্ন অংশে জলবায়ুর বৈচিত্র্যের কারণ—দ্বিতীয় ভাগ, ৭৩—৭৪ পৃঃ
এশিয়ার মৌসুমী ও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য—ঐ, ৭৪—৭৭ পৃঃ
এশিয়ার শীতলতম স্থান—ভার্খয়ানস্ক, ঐ, ৭৪ পৃঃ

১৫। জাপানকে 'প্রাচ্যের ব্রিটেন' বলা হয় কেন? জাপানের শিল্পোন্নতির কারণসমূহ আলোচনা কর। পৃথিবীর বৃহত্তম নগরের জনসংখ্যা সহ নাম লিখ। ৩+৬+১=১০
জাপান প্রাচ্যের ব্রিটেন কেন?—দ্বিতীয় ভাগ, ৯২ পৃঃ, ১ম প্যারাগ্রাফ
জাপানের শিল্পোন্নতির কারণ ঐ, ৯৬—৯৭ পৃঃ
পৃথিবীর বৃহত্তম নগর—সাংহাই, ঐ, ৮৯ পৃঃ, ৪র্থ প্যারাগ্রাফ

'ঙ' বিভাগ (নূতন পাঠক্রম)

১৬। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগগুলি কি কি? যে কোন একটি বিভাগের ভূপ্রকৃতি ও নদ-নদীর বিবরণ দাও। পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু কোন্ বায়ুপ্রবাহের দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হয়? ৩+৬+১=১০
পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক বিভাগ—দ্বিতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট
যে কোন একটি বিভাগের ভূপ্রকৃতি ও নদ-নদী—ঐ, ঐ
পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু সম্পর্কে বায়ুপ্রবাহের প্রভাব—ঐ, ঐ
বিশদ আলোচনার জন্য এই পুস্তকের গ্রন্থকার লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত সরল ভূগোল (ষষ্ঠ শ্রেণী) দেখ।

১৭। (ক) 'ইউক্রেন' শব্দটির অর্থ কি? এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণগুলি বর্ণনা কর। ১+৬=৭
—দ্বিতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য
(খ) মিশরকে 'নীল নদের দান' বলা হয় কেন? ৩
—দ্বিতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য